হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

সূচীপত্র

ভূমিকা

হেমেন্দ্রকুমার রায় শতায়ু হলেন।

শতায়ু!—"আজি হ'তে শতবর্ষ পরে, কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতা-খানি কৌতূহল ভরে"…আজীবন যাঁকে নিজের একান্ত সাহিত্যগুরু ব'লে মেনে-ছিলেন—শরৎচন্দ্রের কাছে প্রকাশ্যে কবুলও করছেন "আমার গুরু রবীন্দ্রনাথ" …তাঁরই বরেণ্য পঙ্‌ক্তির অনুসরণে কী হেমেন্দ্রকুমার আজও সমানে বলে উঠতে পারেন না—তিনি তো 'দেড়শো খোকার কাণ্ড' বইটিতে আগেভাগেই বলে রেখেছিলেন যে তিনিই "খোকাখুকুদের বন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায়।"

বরং তো উল্টে, তাঁর একালের অসংখ্য ভক্ত খোকাখুকু ও সমবয়সী অনুরক্ত পাঠক-পাঠিকারাই এখন সমস্বরে বলে উঠতে পারে, 'এই তো পেয়ে গেছি—আমাদের বন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায়।'

তবে, সে বলাও যে একটুও অত্যুক্তি হবে না, তার একটি অলঙ্ঘ্য নিদর্শন তো আমি এখনই হাতে নিয়ে বসে আছি, এই মুহূর্তে,—হেমেন্দ্রকুমার রচনাবলীর একাদশ খণ্ডের ছাপা ফর্মা, যাতে একটি মুখবন্ধ বা ভূমিকা সংযোজন করাই এখন আমার বিনম্র করণীয়।

খাঁটি ও নিখাদ গর্বে ও আনন্দে আমরা দেখি তাঁর এই শতবর্ষ-পার অবিচল ঋজু চলনটি—এক থেকে একাদশ খণ্ডেও, সংস্করণের পর সংস্করণেও, যা নয় একটুও নিঃশেষিত, সাহিত্যের বিচিত্র মার্গে তাঁর সৃষ্টিসম্ভার পরিমাণে এতই এবং এত লোকপ্রিয়ও। কেননা সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার যতটা ছোটদের দিকপাল, ততটা বড়দেরও।

তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রায় মধ্যাহ্নে ১৯২৩-এ বাংলার শিশু বা কিশোর সাহিত্যে অতি খ্যাত "যকের ধন"-এর বিস্ফোরণটি ঘটাবার আগে পর্যন্তও হেমেন্দ্র-কুমারকে আমরা চিনেছি প্রতিষ্ঠিত রস-সাহিত্যিকরূপেই, 'ভারতী'-যুগের নব্য সাহিত্যগোষ্ঠীর যিনি ছিলেন অন্যতম মধ্যমণিই। রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম শিল্প সম্পর্কীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে সে কৈশোরেই—১৩১৫ সালে, আজ থেকে ৮১ বছর আগেই।

সেই উনিশ শতকের শেষ যখন হব-হব করছে তখন থেকে শুরু করে, বিশ শতকের দুপুর যখন গড়িয়ে যায়-যায়, তখন তিনি বিদায় নিয়েছিলেন। পঁচাত্তর বছর বয়স একটা শতাব্দীর তিনপাদ জুড়ে থাকে। হেমেন্দ্রকুমার মৃত্যুকালে পঁচাত্তরের কোঠায় পা দিয়েছিলেন (১৮৮৮-১৯৬৩)। কিন্তু, আমরা যারা তাঁর কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেয়েছিলুম, জানি যে দেহ তাঁর অনিবার্য, অমোঘ, নিশ্চিতভাবেই প্রতিনিয়ত কালের অধীনস্থ হচ্ছিল যদিও, মন তাঁর কোনদিনও বুড়ি ছোঁয়া ছোঁয়নি।

কেননা হেমেন্দ্রকুমার ছিলেন আজীবন চির নবীনত্বের প্রতীকোপাসক, যদি তাই-ই বলি স্বীয় দীর্ঘজীবনে আকৈশোর যা তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন, তা হলো শিল্প,—মুখ্যত কথাশিল্প, আবার কলাশিল্পের সর্বতোমুখী সৃজনধর্মিতা—বঙ্গ-ভারতীর সমূহঅঙ্গনে। এমন কি আকস্মিক শেষবারের মতো রোগশয্যা গ্রহণ করার কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্তও দেখেছি তাঁর বিশ্রামহীন লেখনী স্তব্ধ হয়নি। তাঁর সর্বশেষ লেখা তখনও মুদ্রিত হরফে পাঠকদের দরবারে পৌঁছবার অপেক্ষায় থেকে গিয়েছিল।

তাঁর শেষজীবনে নিজের হাতে সারাক্ষণ কলম ধরতে না হলে যেন তিনি স্বস্তি পেতেন। উপায় ছিল না। সারাজীবন মস্তিষ্ক ও লেখনীচালনার ফলে ডান হাতের তর্জনীতে পড়ে গিয়েছিল যাকে বলে লেখনধারীর কড়া—'রাইটার্স ক্র্যাম্প'। তখন ডাক পড়ত 'ডিক্টেশন' নেওয়ার। আমিও থাকতুম হাজির। পরে নিজে দেখে ছোড়দাদু সে শ্রুতিলিখন শুধরে নিতেন।

সেই সঙ্গে চলছিল তাঁর শেষজীবনের মহার্ঘ স্মৃতিচারণমালার আর এক পর্বের ধারাবাহিক—"নাট্য-নৃত্য-চিত্র", দৈনিকের পাতায়। ধ'রে ধ'রে গোটা অক্ষরে নিজের হাতেই লিখে পাঠাচ্ছেন। (এই শেষদিন পর্যন্ত পিতার শুশ্রূষা, দৈনন্দিনের খুঁটিনাটির দায়িত্বে তখন রায়-পরিবারের পক্ষে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র প্রদ্যোৎকুমার, আমাদের মাতুল ; তাঁর গ্রন্থের স্বত্ব-ধারকও আজ যিনি)।

গঙ্গার ধারে খোলা-হাওয়ায় বাগবাজারে তাঁর বিরল-শিল্পসংগ্রহময় বাড়ির তেতলার বারান্দা, যার কোণটিতে লেখার আসনে বসে দিনের অধিকাংশ সময় তিনি নিমজ্জিত থাকছেন লেখায়, পড়ায় বা অনুষঙ্গ-ভাবনা-কল্পনায়, সাহিত্য-সাধক হেমেন্দ্রকুমারের এই তন্ময় ছবিটি আমার মনে চির-মুদ্রিত হয়ে আছে। (সাহিত্য ছাড়া জীবনে তিনি অন্যকোনও পেশা ধরেন নি, প্রথম যৌবনে একটি

ক্ষণস্থায়ী চাকরিতে বাঁধা-পড়া ছাড়া—তাঁর পিতৃকর্মস্থল মিলিটারি একাউণ্টসে—যা তিনি সামান্যতম বিকল্প পেয়েই—'যমুনা' পত্রিকার সহযোগী-সম্পাদনার আহ্বান—ত্যাগ করে আসেন)।

রবীন্দ্রনাথ—তাঁর বিশেষ স্নেহভাজনদের প্রতি অকৃপণ ছিলেন চিরদিনই—কিন্তু বড় কম কথা বলেন নি হেমেন্দ্রকুমার সম্পর্কে। কবিগুরু এক চিঠিতে লিখলেন : "হেমেন্দ্রকুমার আমার অকৃত্রিম সুহৃদ।" বললেন বঙ্গভঙ্গের সময়ের কথা এবং "হেমেন্দ্রকুমারের মাধুর্য্যে"-র। লিখছেন, "...তিনি কবি, গল্প-লিখিয়ে, সাহিত্যিক ও বাঙালি।" নিজের জীবনে ও সৃজনীতে রবীন্দ্র-কথিত এই চতুর্বর্গে এমন উজ্জ্বল শিল্পী-ব্যক্তিত্বই হেমেন্দ্রকুমার। "সাহিত্যক্ষেত্রে", তাঁর নিজের জবানীতেই তুলে দিই, "চরণস্পর্শ করে প্রণাম করেছি মাত্র দুজনকে। তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ"। শহর কলকাতারই পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে এই বনেদী বৈদ্য-পরিবারের পুরোনো আবাস। পরে নিজে বাগবাজারে গঙ্গার ধারে মনের মতো বাড়ি করে চলে এলেন। সেকাল-একালের কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের বিচিত্রতা তিনি দেখেছেন, তার অংশী হয়েছেন, রচনা করেছেন। আর সংস্কৃতির যে মহাপীঠস্থান জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা-সভা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-মণিলাল-সৌরীন্দ্রমোহন-প্রেমাঙ্কুর এঁদের নিয়ে 'ভারতী'-র সতীর্থবাসর থেকে পরের যুগের 'কল্লোল', 'মৌচাকে'-র মুখর আসর—সর্বত্রই সমাদর তাঁর আর নিজেও লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সে সমাদৃত-পরম্পরা।

বড় প্রসাদ-গুণান্বিত তাঁর বড়দের-ছোটদের সববয়সীরই উপভোগ্য সাহিত্যের সব্যসাচী কলম। অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-শিবরাম পেয়েছেন তাঁদের পূর্বসূরী 'হেমেনদা'কে। আর, এ-ও যেন তাঁর মনের এক সরস রহস্য, সদা-প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের মতোই, পিতৃদত্ত নামটিকেই—প্রসাদদাস রায়—ব্যবহার করলেন তাঁর প্রথম তারুণ্যের "বঙ্কিমযুগের কথা" থেকে নানা লেখায় ছদ্মনামের মতো, এবং প্রকৃতই যেটি তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম—হেমেন্দ্রকুমার—সেই শিরোনামেই তিনি বাংলার সাহিত্যজগতে একডাকে বিখ্যাত হয়ে রইলেন।

এই শতকের তিন থেকে ছয়ের দশক পর্যন্ত একালের শিশু-সাহিত্যে, বলা উচিত, কিশোর-সাহিত্যে অসপত্ন রাজ্যপাট করে গেছেন তিনি—"যকের ধন", "আবার যকের ধন", "হিমালয়ের ভয়ঙ্কর", "মেঘদূতের মর্তে আগমন", "জয়ন্তের

কীর্তি", "পঞ্চনদের তীরে"-র মতো অসংখ্য রহস্য-রোমাঞ্চ-কল্পবিজ্ঞান-ঐতিহাসিক ও অ্যাডভেঞ্চার কিশোরোপন্যাসের পথিকৃৎ-স্রষ্টা, বলা হত "সম্রাট"।

আজ এক নয় একাধিক নয়, তিন প্রজন্মেরও অধিক কোন্ বাঙালি কিশোরের প্রিয় নয় তাঁর বিমল-কুমার-রামহরি-বাঘা-সুন্দরবাবু ('হুম্'), জয়ন্ত মানিক-হেমন্ত-রবীন-বিনয়বাবুরা, যাদের দুঃসাহসিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, এমনকি পৃথিবী-ছাড়ানো গ্রহান্তরিক অভিযানে বা বৌদ্ধিক রহস্যোদ্ঘাটনের গোয়েন্দাগিরিতে সে-ও না হয় এক সক্রিয় অংশীদার ও সংগী হয়ে পড়ে!

এখন খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশমান তাঁর এই বর্তমান রচনাবলী হেমেন্দ্রকুমারের সেই সব ধ্রুপদী কথা কাহিনীকেই পুনঃপ্রকাশিত করে চলেছে এবং পরপর তাঁর অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ কিশোর-সাহিত্যকীর্তিই দেখছি এ সুবিপুল গ্রন্থ প্রকাশ-উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ইতিমধ্যেই। 'এশিয়া পাবলিশিং' কর্তৃপক্ষের দেওয়া এই একাদশ খণ্ডের সূচীতেও দেখছি তাঁর পাঁচখানি কিশোরোপন্যাস, যা হেমেন্দ্র-কুমারের লেখন-বৈশিষ্ট্যে পাঠক মনের দিগন্ত ক্রমে বাড়িয়েই যাবে—মিশরের মমি ও প্যাপিরাস পুঁথির ছেঁড়া পাতার রহস্য থেকে দক্ষিণ আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের প্রাচীন মায়া সভ্যতা, টলটেক-আজটেক-ইনকা-যুগ বা প্রশান্তের আগ্নেয় দ্বীপের কথায়।

বাঙালির শিশু-কিশোর সাহিত্যে তাঁর দানের এই অজস্রতা ও অনন্যতা এ যুগে হেমেন্দ্রকুমারের প্রধান পরিচয় হ'য়ে দাঁড়ালেও, দীর্ঘজীবনে প্রবন্ধ-অনুবাদ-গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে সাহিত্যের নানাদিকে তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা অনধিক দু'শ প্রায়, তাঁর সম্পাদিত সাহিত্য-বার্ষিকীগুলি ও ছোটদের 'রংমশাল'-এর মতো পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভ সমেত। শিশু সাহিত্যের জাদুদণ্ডটি যখন তিনি হাতে তুলে নিয়েছিলেন, সে তাঁর বেশ পরিণত বয়সেই। 'ভারতী'র যুগে যখন সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন, তখন তো তাঁর পরিচয় "কবি-গল্প-লিখিয়ে-সাহিত্যিক"-রূপেই। লিখেছেন অজস্র, প্রায় এক হাজার গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস। তাঁর "ঝড়ের যাত্রী", "জলের আলপনা" "বেনোজল" এসব উপন্যাসের প্রকাশকালের কথ এখনও অনেক প্রবীণের স্মরণে আছে। সে যুগে তাঁর "মণি-কাঞ্চন" উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্রে "তরুণী", "পায়ের ধুলো", তাঁর কিশোর-ক্লাসিক "যকের ধন" ও "দেড়শ খোকার কাণ্ড"-এর চলচ্চিত্র-রূপায়ণও যথেষ্ট জনপ্রিয়তাধন্য হয়েছিল। গল্পকার হেমেন্দ্রকুমারের খ্যাতি শুধু এদেশেই নয়,

জার্মান অনুবাদক ডঃ রাইনহার্ড হ্বাগনারের তাঁকে লেখা চিঠি, ১৯৩০-এ বার্লিন থেকে, আমি নিজে দেখেছি, যাতে হেমেন্দ্রকুমারের কয়েকটি গল্পকে "মাস্টার পিসেস" ব'লে বর্ণনা করেছেন এবং তৎসম্পাদিত "জার্মান-স্যান্সক্রিট রিডার"—সংকলনে হেমেন্দ্রকুমার—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি স্থান নিয়েছেন। যৌবনে তাঁর ছিল কবি-খ্যাতি এবং তাঁর প্রথম কবিতার বইটির নামও দিয়েছিলেন, "যৌবনের গান"। পরে বেরিয়ে নাম করেছিল তাঁর "ওমর খৈয়ামের রুবায়ত্" অনুবাদ।

বাংলাদেশের সে যুগের প্রত্যেকটি বিখ্যাত সাহিত্য-পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগ। 'ভারতী' গোষ্ঠী থেকে শুরু, তারপর এলেন 'যমুনা'য়। সেখানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যে সৌহার্দ্য হলো তা শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। হেমেন্দ্রকুমারই প্রথম তাঁর সাহিত্যজীবন নিয়ে বই লেখেন—"সাহিত্যিক শরৎ-চন্দ্র।" সে বইটিও বর্তমান রচনাবলীর ৩য় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত বিখ্যাত "নাচঘর" পত্রিকা বাংলায় প্রথম সাহিত্য-শিল্পকলা-নৃত্যবিষয়ক সাময়িকী। বস্তুত, হেমেন্দ্রকুমার নৃত্য-পরিকল্পক হিসেবেও খ্যাতি-লাভ করেছিলেন। সে হল বাংলা রঙ্গমঞ্চে দিক-কাঁপানো শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাবের কাল, যাঁর সঙ্গে তাঁর আজীবন সহযোগ-সখ্যতা তো সুবিদিত। শিশিরকুমারের 'সীতা' নাটকের নৃত্য-প্রশিক্ষণা ও গানগুলি রচনাও তাঁর। সেই "অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে" গানতো অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কণ্ঠে গীত হয়ে সেকালে ঘরে ঘরে পৌঁচেছিল। তাঁর এই গান ও অন্যান্য সুপ্রচল "মঞ্জুল মঞ্জরী নবসাজে", "চোখের জলে মন-ভিজিয়ে যায় চলে ওই কোন উদাসী", "শিউলি আমার প্রাণের সখি তোমায় আমার লাগছে ভালো" প্রভৃতি গান অর্ধশতাব্দী আগে প্রকাশিত তাঁর "সুরলেখা" বইয়ে; সে বইটিও আমি তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্র খেলার জগতে সুপরিচিত অলক রায়ের সংগ্রহে পেয়েছি। সুরকারও "কবিভ্রাতা" নজরুল ইসলাম, শচীনদেব বর্মন প্রমুখ এবং স্বয়ং তিনি। এক সময়ে মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয়েছিল তাঁর "প্রেমের-প্রেমারা" নাটক, পিতৃবন্ধু রসরাজ অমৃতলাল বসুর পরিচালনায়। নিজের সম্পাদিত "ছন্দা", "দীপালি" প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকায় ও সাংবাদিক, নাট্যশিল্প-সমালোচক হিসাবেও তিনি একসময় নিয়মিতভাবে বহু নাট্য-শিল্প-নিবন্ধ লিখে গেছেন।

শেষজীবনে তিনি যে মহামূল্যবান সম্পদ আমাদের দিয়ে গেছেন, সে তাঁর

অদ্বিতীয় স্মৃতিচারণ সাহিত্য। সেই 'ভারতী'-র যুগ থেকে—দু'খণ্ডে "যাঁদের দেখেছি", "এখন যাঁদের দেখছি"। তাঁর এই বর্তমান রচনাবলীর নানাখণ্ডে রয়েছে "এখন যাঁদের দেখছি"-র বিভিন্ন অধ্যায়। 'এশিয়া পাবলিশিং' কর্তৃপক্ষের কাছে শুনে আনন্দিত ও আশ্বস্ত হই যে, এখন তাঁর "যাঁদের দেখেছি"-র কয়েক পর্বও তাঁরা এই রচনাবলীভুক্ত করার মনস্থ করেছেন, যেগুলি বাংলার শিশু ও কিশোর সাহিত্য-সম্পৃক্ত বিশেষত।

তাঁর স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চিত "যাঁদের দেখেছি"-পর্বের এই চিত্র-চরিত্র-পরম্পরা এবং "সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ" ও "বাংলা রঙ্গালয়ে শিশির-কুমার"—এ-হেন গ্রন্থের সাক্ষ্যে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের প্রবহমান ধারাটির,—রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে এই শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতির ছয়-দশক ব্যাপী প্রায় সমস্ত প্রধান পুরোধা সাহিত্যিকদের যে সাক্ষাৎ স্মৃতিচিত্র তিনি এঁকে গেছেন, তা যেন তাঁর প্রথম জীবনের ছবি-আঁকার হাতকেই লেখায় ফিরিয়ে দিলে। হেমেন্দ্রকুমার প্রথম জীবনে একবার চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন রীতিমত, সরকারি কলা-মহাবিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে। সেই সূত্রে আসেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র-নাথের সংস্পর্শে, শিষ্যত্বে ও গভীর স্নেহের আত্মীয়তায়। সে আরেক কাহিনী।

মনে আছে একবার তাঁর অন্তরঙ্গ শিশিরকুমারের কাছে গিয়েছি, সঙ্গে তাঁর চিঠি। হেমেন্দ্রকুমার তখন অসুস্থ। শুনে শিশিরবাবু 'হেমেন্দ্র' ব'লে চুপ করে রইলেন। তারপর শিশিরকুমারই চলে গেলেন আগে। হেমেন্দ্রকুমার তখন আমাদের বলেছিলেন, 'তোরা আমার আশাও আর বেশিদিন করিস নে।'

সেই 'ভারতী'-র যুগ থেকে একাল পর্যন্ত সাহিত্যের তিনযুগের হেমেন্দ্রকুমার নিজের সাধনধারায় যোগ ঘটিয়ে গিয়েছেন। এই রচনাবলীর খণ্ডে-খণ্ডে তাঁর শিশু-কিশোর সাহিত্যের তুঙ্গতা যেমন বিধৃত, তেমনি পূর্বোল্লেখিত তাঁর স্মৃতি-সাহিত্যমালাও, শুধু অগণিত পাঠক-পাঠিকাদেরই নয়, বঙ্গসাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির নিষ্ঠাবান ছাত্র ও গবেষকদের পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করি। সেদিক থেকে, একালের লেখকদের কাছে তিনি ঊর্ধ্বতন দুই বা তিন পুরুষ বা তদূর্ধ্ব-স্থানীয় নমস্য ব্যক্তিত্ব।

সিদ্ধেশ্বর সেন

১লা বৈশাখ ১৩৯৬

মড়ার মৃত্যু !

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভৈরবের পরিচয়

যে ঘটনার কথা বলব, সেটা কেউ বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। সত্যি কথা বলতে কি, এটা বিশ্বাস করবার মতো কথাও নয়। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরে বসে এমন ঘটনার ধারণাও করা অসম্ভব।

যদিও কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র দিলীপকুমার সেন এই ঘটনার আগাগোড়াই লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, এবং তার সাক্ষীরও অভাব নেই, তবু সমস্ত রহস্যই যে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। যে সব ঘটনা অলৌকিক, পার্থিব জগতে তাদের অস্বাভাবিকতার যুক্তিসঙ্গত কারণ আবিষ্কার করা সহজ নয়। আমরাও সে-চেষ্টা করব না, কেবল সোজা কথায় সমস্ত ব্যাপারটা পাঠকদের কাছে বর্ণনা করব। যাঁদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হবে না তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলবার নেই।

দিলীপ আজ চার-বছর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রজীবন-যাপন করছে। সে নির্জনতা ভালোবাসত বলে টালিগঞ্জের এমন এক জায়গায় বাসা নিয়েছিল যেখানে লোকালয় কম, মাঠ-ময়দান ও গাছপালাই বেশি। টালিগঞ্জ ট্রাম-ডিপোর পিছন দিয়ে যে-সুদীর্ঘ রাস্তাটি সোজা গড়িয়াহাটার দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে, দিলীপের বাসাবাড়িটি ছিল তারই এক ধারে। তার পড়বার ঘরে বসে চারিদিকে তাকালে দেখা যায় কেবল সুনীল আকাশ, সবুজ মাঠ আর দূরে ও কাছে বন-জঙ্গলের জীবন্ত ছবি। কোথাও কোন গোলমাল নেই, মাঝে মাঝে কেবল দ্রুতগামী মোটরের কর্কশ চিৎকার আশপাশের মৌনব্রত

ভাঙবার অল্পস্বল্প চেষ্টা করে।

কিন্তু বাসাবাড়িতে দিলীপ খালি একলাই থাকত না। একতালাটি ছিল দিলীপের এবং দোতালায় বাস করত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী নামে আর একটি যুবক। তার সঙ্গে এখনো দিলীপের ভালো করে পরিচয় হয় নি, কারণ ভৈরব অল্পদিনই এই বাসায় এসে উঠেছে।

একদিন সকালে কতকগুলো মড়ার হাড় ও মোটা মোটা ডাক্তারি কেতাবের মাঝখানে বসে দিলীপ নিজের মনেই পড়াশুনা করছে, এমন সময়ে তার দুই বন্ধু প্রতাপ ও অবনী এসে হাজির। এদেরও দুজনের বাড়ি ছিল টালিগঞ্জেই এবং তারা প্রায়ই দিলীপের সঙ্গে গল্প করতে আসত।

বই থেকে মুখ তুলে দিলীপ সুধোলে, "কিহে, সকাল-বেলায় কি মনে করে?"

প্রতাপ একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, "আমি এসেছি তোমার সঙ্গে গল্প করতে, আর অবনী এসেছে তার হবু-ভগ্নীপতির সঙ্গে দেখা করতে।"

দিলীপ একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, "আমার বাড়িতে অবনীর হবু-ভগ্নীপতি? তার মানে?"

—"তোমার বাসায় যে ভৈরবচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছে, তারি সঙ্গে অবনীর বোনের বিয়ের কথা হচ্ছে যে!"

—"বটে, তা তো আমি জানতুম না! ভৈরববাবু তাহলে একটি ভালো পাত্র, বিয়ের বাজারে তাঁর দাম আছে?"

অবনী হাসতে হাসতে বললে, "ঘটকরা তো তাই বলছে, কিন্তু প্রতাপ তা স্বীকার করে না।"

—"কেন?"

প্রতাপ বললে, "ভৈরবকে আমি কিছু-কিছু চিনি। তার নাম বা স্বভাব কিছুই মিষ্ট নয়।"

দিলীপ বললে, "ভৈরববাবুর কথা আমি কিছুই জানি না। কিন্তু

তাঁর সম্বন্ধে তোমার আপত্তির কারণ কি?"

—"ভৈরব হচ্ছে ভবঘুরে। তার বয়স তিরিশের বেশি নয়, কিন্তু এই বয়সেই সে মিশর, আরব, পারস্য, চীন আর জাপান প্রভৃতি দেশ ঘুরে এসেছে।"

—"দেশভ্রমণ কি দোষের বিষয়?"

—"না। লোকে নানান উদ্দেশ্যে দেশ-ভ্রমণ করে। কিন্তু ভৈরব যে কিসের খোঁজে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ায় তা শিবের বাবাও জানেন না। তার দেশ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সন্দেহজনক। সে যে-দেশেই গিয়েছে সেইখান থেকেই নানান সব সেকেলে জিনিস সংগ্রহ করে এনেছে। তার মতন একেলে ছেলের অত সেকেলে জিনিস সংগ্রহ করবার ঝোঁক কেন, তারও খবর কেউ রাখে না। এ-সব রহস্য আমি পছন্দ করি না।"

দিলীপ সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, "তুমি দেখছি অকারণেই ভৈরববাবুর উপর খাপ্পা হয়েছ! ভৈবরবাবুর সেকেলে জিনিস সংগ্রহ করবার বাতিক থাকতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে আমি তো কিছু অন্যায় দেখছি না!"

প্রতাপ বললে, "তাহলে তার স্বভাবের একটু পরিচয় দি, শোনো। নন্দলালকে তুমি চেনো তো, সেও মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। এই পরশুদিনই নন্দলালের সঙ্গে ভৈরবের রীতিমতো একটা ঠোকাঠুকি হয়ে গেছে!"

—"কি রকম, কি রকম?"

—"তোমার মনে আছে বোধহয়, পরশু সকালে কি-রকম বর্ষা নেমেছিল? সেই সময় টালিগঞ্জের একটা খুব সরু গলির ভিতর দিয়ে ভৈরব কোথায় যাচ্ছিল। পথের ওদিক দিয়ে মাথায় একটা মস্ত-বড় শাক-সবজীর ঝুড়ি নিয়ে এক বুড়ী আসছিল বাজারের পানে। বদমাইস ভৈরবটা কি করলে জানো? সেই বুড়ী-বেচারীকে এমন এক ধাক্কা মেরে এগিয়ে গেল যে, ঝুড়ি-শুদ্ধ বুড়ী পড়ল গিয়ে পাশের এক খানার ভিতরে মুখ গুঁজড়ে! দৈবক্রমে নন্দলালও ঠিক সেই সময়েই সেখানে

এসে পড়ে। ভৈরবের নিষ্ঠুরতা দেখে নন্দলাল একেবারেই ক্ষেপে গেল। সে তখনি ভৈরবকে রীতিমতো উত্তম-মধ্যম দিতে কসুর করলে না। তারপর থেকে ভৈরবের সঙ্গে নন্দলালের কথা বন্ধ হয়েছে। এখন বল দেখি, এর পরেও কি আর ভৈরবের উপরে কারুর শ্রদ্ধা থাকতে পারে? এই লোকের সঙ্গেই অবনী দিতে চায় তার বোনের বিয়ে। আশ্চর্য!"

অবনী অপ্রতিভ স্বরে বললে, "কি করব ভাই, বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কি কথা কওয়া উচিত? ভৈরব নাকি ধনীর ছেলে, তার উপরে গ্রাজুয়েট! বাবার মতে এমন পাত্র নাকি হাতছাড়া করতে নেই! আমি আজ পাকা দেখার দিন স্থির করতে এসেছি।"

প্রতাপ বললে, "তাহলে তুমি তাড়াতাড়ি ভৈরবচন্দ্রের চন্দ্রমুখ দর্শন করে এস। ততক্ষণে আমি দিলীপের স্টোভ জ্বেলে একটু চা-তৈরির চেষ্টা করি।"

দিলীপ আবার একটা মড়ার মাথার খুলি টেনে নিয়ে বললে, "দেখো ভাই অবনী, বিয়ের পরে তোমার বোন সুখী হবেন কিনা জানি না, কিন্তু বিয়ের দিনে যেন আমরা লুচি-মণ্ডা থেকে বঞ্চিত না হই।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কে চ্যাঁচায়?—কেন চ্যাঁচায়?

চা পান করে প্রতাপ চলে গেলে পর দিলীপ আবার ভালো করে পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করছে, এমন সময় হঠাৎ বিষম তোড়ে বৃষ্টি নামল। টালিগঞ্জের সেই নির্জন ও অন্ধকার মাঠের শূন্যতা বৃষ্টি ও ঝড়ের কোলাহলে পূর্ণ হয়ে উঠল। দিলীপ উঠে জানলাগুলো বন্ধ করে ঘরের দরজাটাও বন্ধ করতে যাচ্ছে, এমন সময় অবনী নিচে নেমে এসে ব্যস্ত হয়ে বললে, "দরজা বন্ধ করছ কি হে, এই বৃষ্টিতে আমি যাব কোথায়?"

দিলীপ বললে, "কে তোমায় যেতে বলছে? ঘরের ভেতরে এস। ইজি-চেয়ারে শুয়ে চুপ করে বৃষ্টির গান শোনো, আর আমি নিজের মনে লেখাপড়া করি।"

অবনী ঘরে ঢুকে ইজি-চেয়ারে বসে পড়ে বললে, "এই বাদলায় রাখো তোমার লেখাপড়া! এস, খানিকটা গল্প-গুজব করা যাক।"

দিলীপ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বই মুড়ে বললে, "আজ যখন শনি-অবতার তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তখন আমার লেখাপড়া যে হবে না সেটা আগেই বুঝতে পেরেছিলুম! বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!"

বাইরে পড়তে লাগল বৃষ্টি, আর ভিতরে চলতে লাগল দুই-বন্ধুর গল্প। একঘণ্টা পরেও বাইরের বৃষ্টি ও ভিতরের গল্প থামবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

ঘরের ঘড়িতে টুং-টুং করে যখন এগারোটা বেজে গেল, অবনীর তখন খেয়াল হল যে, তাকে আজ বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু জানলার উপরে তখনও ঝোড়ো-হাওয়ার ধাক্কার সঙ্গে বৃষ্টি-পড়ার অশ্রান্ত শব্দ হচ্ছে।

দিলীপ বললে, "অবু, আজ বাড়ি ফেরার কথা ভুলে যাও। এখান থেকে বেরুলে তোমাকে সাঁতার কাটতে হবে।"

অবনী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "তাই সই। বাবা আমার অপেক্ষায় বসে আছেন, সব কথা শোনবার জন্যে। চললুম।" সে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা খুললে।

—সঙ্গে-সঙ্গে সেই বৃষ্টি ও ঝড়ের শব্দের ভিতরেই বাহির থেকে ভেসে এল একটা ভীত আর্ত চিৎকার! অবনী চমকে ফিরে দাঁড়াল।

দিলীপও লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে বিস্মিত-কণ্ঠে বললে, "কে চিৎকার করলে?"

দুই বন্ধুই দরজার কাছে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আগেই বলেছি, দিলীপের বাসা যে-জায়গায় তার কাছে কোন লোকালয় নেই। এই ঝড়-জলে পথেও কোন লোক থাকবার কথা নয়। এখানে কে চিৎকার করবে?

অবনী ভয়ে ভয়ে বললে, "অন্ধকারে পথে কেউ মোটর-চাপা পড়ল নাকি ?"

দিলীপ ঘাড় নেড়ে বললে, "পাগল! পথ এখন জলের তলায়, সেখানে মোটর চালাবার সখ কারুর হবে না।"

আবার শোনা গেল—কেউ যেন দারুণ আতঙ্কে প্রায়-অবরুদ্ধ স্বরে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আর্তনাদের পর আর্তনাদ করছে! এবারে বেশ বোঝা গেল, শব্দটা আসছে দিলীপের বাসার উপরতালা থেকেই।

অবনী কম্পিত স্বরে বললে, "এ যে ভৈরববাবুর গলা! তিনি তো ঘরে একলা আছেন! কী দেখে তিনি ভয় পেয়েছেন ?"

দিলীপ কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে বললে, "সেটা জানতে হলে আমাদেরও ওপরে যেতে হয়।"

অবনী বললে, "তাহলে আমিই ওপরে যাই, তুমি এইখানে দাঁড়াও। ভৈরববাবু তাঁর ঘরে বাইরের লোক-আসা পছন্দ করেন না!"

—"পছন্দ করেন না! কেন ?"

—"তাঁর ঘরের সাজসজ্জা অদ্ভুত। বাইরের লোক সে-সব দেখলে কেবল অবাকই হবে না, ভয় পেতেও পারে, তাঁকে পাগলও ভাবতে পারে।" বলেই অবনী দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

দিলীপ সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে, বিস্মিত মনে অবনীর কথা-গুলো ভাবতে ভাবতে শুনতে লাগল, ভৈরবের বদ্ধকণ্ঠের অস্ফুট কাৎরানি!

তারপরই শোনা গেল উপর থেকে অবনীর ব্যস্ত কণ্ঠস্বর—"দিলীপ, দিলীপ! শিগ্‌গির, শিগ্‌গির ওপরে এসো! ভৈরববাবু মরো-মরো হয়েছেন!"

দিলীপ তিন-চার লাফে দোতালার সিঁড়িগুলো পার হয়ে ভৈরবের ঘরের সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল। খোলা দরজা দিয়ে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-আলোকে ঘরের ভিতরটা স্পষ্টরূপে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঘর দেখে সত্যিসত্যিই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। এমন দৃশ্য সে জীবনে আর-কখনো দেখে নি!

পণ্ডিতরা প্রাচীন মিশরের মাটি খুঁড়ে অতীতের সমাধিমন্দির প্রভৃতি থেকে যে-সব অদ্ভুত মূর্তি আবিষ্কার করেছেন, দিলীপ অনেক কেতাবে তাদের অসংখ্য ছবি দেখেছে। ঘরের দেওয়ালের সামনে দাঁড় করানো রয়েছে সেই রকম অনেকগুলো ছোট-বড় কাঠের মূর্তি! মূর্তিগুলোর চেহারা মানুষের মতোই, কিন্তু তাদের কারুর মাথা ষাঁড়ের মতো, কারুর মাথা সারস পাখির মতো, কারুর বা বিড়াল কি প্যাঁচার মতো! এরাই ছিল প্রাচীন মিশরের দেব-দেবী! ঘরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে একটা কুমীরের মৃতদেহ—দিলীপ জানত, কুমীরও ছিল প্রাচীন মিশরীদের কাছে দেবতাস্থানীয়।

ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিলের উপরে প্রাচীন মিশরের একটা 'কফিন্' বা 'মমি'র বাক্স, তার ডালা খোলা। এবং তারই ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মিশরী 'মমি' বা মানুষের সুরক্ষিত মৃতদেহ!

কলকাতার যাদুঘরে দিলীপ একটা 'মমি' দেখেছিল। সেটা হচ্ছে কয়েক হাজার বছর আগেকার একটি মিশরীয় নারীর মৃতদেহ! সে মড়াটার দেহ কলকাতার স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় এসে শীঘ্রই জীর্ণ হয়ে পড়েছে, তাই আগে সেটা দাঁড় করানো ছিল বটে, কিন্তু এখন তাকে শুইয়ে রাখতে হয়েছে। যাদুঘরের ঐ 'মমি'টা হচ্ছে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, তার দেহের নানান জায়গা খসে পড়েছে কিন্তু আজ সে চোখের সামনে প্রাচীন মানুষের যে সুরক্ষিত দেহটা দেখলে, এটা পুরুষের দেহ, আর এমন পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্তের মতো দেখতে যে তাকে মৃতদেহ বলে কল্পনা করাও অসম্ভব! যদিও হাজার হাজার বছরের মহিমায় তার গায়ের রং অস্বাভাবিকরূপে কালো হয়ে গিয়েছে, তার সমস্ত শরীর রীতিমতো অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছে, তবু তার শুকনো, বীভৎস মুখের দিকে তাকালে মন এক অপার্থিব ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়!

'মমি'টার ঠিক পায়ের তলাতেই ঘরের মেঝের উপরে লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে ভৈরবচন্দ্রের দেহ এবং তার হাতে রয়েছে কোষ্ঠী-ঠিকুজীর মতো পাকানো একখানা আধ-খোলা লম্বা কাগজ। দিলীপ বুঝলে,

সেখানা হচ্ছে প্রাচীন মিশরের 'পাপিরাস' পাতার পুঁথি!

অবনী কাতর কণ্ঠে বলে উঠল, "ভৈরববাবু বোধহয় আর বাঁচবেন না।"

দিলীপ হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, এত সহজে কাতর হবার পাত্র নয়। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে ভৈরবের পাশে গিয়ে বসে পড়ল এবং তার দেহটা পরীক্ষা করে বললে, "ভয় নেই অবনী, ভৈরববাবু কেবল অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তুমি এগিয়ে এসে এঁর পা-দুটো ধরো, মাথার দিক আমি ধরছি। এখন চল, এঁকে ঐ শোফার উপরে শুইয়ে দিতে হবে। জলের কুঁজোটা নিয়ে এস, ভৈরববাবুর মুখে আর বুকে জলের ঝাপটা দাও।...কিন্তু এঁর এমন দশা হল কেন?"

অবনী বললে, "জানি না। ঘরে এসে ওঁকে আমি ঐ অবস্থাতেই দেখেছি।"

দিলীপ ভৈরবের বুকের উপর হাত রেখে বললে, "এঁর বুক যেন হাপরের মতন উঠছে নাবছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, ভয়ানক কিছু দেখেই ইনি ভীষণ ভয় পেয়েছেন।"

অবনী বললে, "তাহলে হয়তো যত নষ্টের গোড়া ঐ 'মমি'টা!"

—" 'মমি'? কি-রকম?"

—"ঐ কত-হাজার বছরের পুরানো মড়া দেখলে কার না ভয় হয়? জ্যান্তো মানুষের পক্ষে এ-সব ভুতুড়ে ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা ভালো নয়। কিছুকাল আগে আর একবারও এঁকে আমি এই অবস্থায় দেখেছিলুম। সেদিনও ইনি ঐ ভুতুড়ে মূর্তিটার পায়ের তলায় এমনি-ভাবেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।"

—" 'মমি'টাকে নিয়ে ইনি কি করতে চান?"

—"কে জানে! ভৈরববাবুর মাথায় বোধ হয় ছিট আছে। এই-সব জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করাই হচ্ছে ওঁর বাতিক! আমি কত মানা করি—বলি, জীবন্তের সঙ্গে মৃতের সম্পর্ক রাখা ভালোও নয় উচিতও নয়! শুনে উনি হাসেন, বলেন, এ-হচ্ছে আমার শব-সাধনা!"

—"চুপ! রোগীর জ্ঞান ফিরে আসছে।"

ভৈরবের মুখ এতক্ষণ সাদা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল, এইবারে তার উপরে একটু-একটু করে রঙের আভাস ফুটে উঠছে। তার শ্বাসপ্রশ্বাসও ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এল। খানিক পরে সে চোখ খুলে ঘরের এদিক-ওদিকে তাকিয়ে দেখলে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল 'মমি'র দিকে, সঙ্গে-সঙ্গে সে উঠে বসল এবং তারপরেই এক লাফে এগিয়ে গিয়ে পাকানো 'পাপিরাস্' কাগজের সেই পুঁথিখানা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি টেবিলের একটা টানার ভিতরে পুরে ফেললে। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "আমার ঘরে বাইরের লোক কেন? আপনাদের কি দরকার?"

অবনী আহত স্বরে বললে, "দরকার আমাদের কিছুই নেই! আপনি চিৎকার করে কাঁদছিলেন, তাই শুনে আমরা এসেছি সাহায্য করতে।"

ভৈরব অপ্রতিভ স্বরে বললে, "এই যে, দিলীপবাবু! আমার এখন মাথার ঠিক নেই, কি বলতে কি বলে ফেলেছি, আপনারা আমাকে মাপ করবেন। ভাগ্যিস আপনারা এসেছিলেন, নইলে কি যে হতো জানি না! ওঃ, আমি কি নির্বোধ, আমি কি নির্বোধ!" —বলতে বলতে আবার সোফার উপরে গিয়ে বসে পড়ে তুই হাতের ভিতরে মুখ ঢেকে ফেললে।

অবনী ভৈরবের কাছে গিয়ে তার মাথার উপরে হাত রেখে বললে, "ভৈরববাবু, আপনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন! নিশুত রাতে 'মমি' নিয়ে নাড়াচাড়া করা মানুষের উচিত নয়। কিসে কি হয় বলা যায় না।"

ভৈরব মুখ তুলে মৃদুস্বরে বললে, "অবনীবাবু, আমি যা দেখেছি, তা যদি আপনিও দেখতেন, তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যেতেন।"

—"কী দেখেছেন আপনি?"

ভৈরব হঠাৎ গলার স্বর বদলে বললে, "না, এমন কিছু নয়। আমি বলছি কি, তুপুর রাতে 'মমি'র সঙ্গে থাকতে হলে অনেকেরই সাহসে কুলোবে না!...একি, আপনারা চলে যাচ্ছেন নাকি? না, না, এখনি যাবেন না, আর-একটু বসুন!"

অবনী বললে, "ঘরের ভেতরে এ কিসের গন্ধ ? দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে !"

টেবিলের উপরের একটা পাত্র থেকে শুকনো পাতার মতো কি-কতকগুলো তুলে নিয়ে একটা জ্বলন্ত ধুনচীর ভিতরে নিক্ষেপ করে ভৈরব বললে, "এ হচ্ছে মিশরী পুরুতদের পবিত্র ধুনো। ...আচ্ছা অবনীবাবু, আমি কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলুম ?"

—"বেশিক্ষণ নয়, মিনিট পাঁচ-ছয়।"

ভৈরব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "অচেতনতা হচ্ছে এক অদ্ভুত জিনিস ! অচেতনতার মধ্যে সময়ের মাপ নেই। অজ্ঞান হয়ে থাকলে কেউ বুঝতে পারে না তার অসাড়তার ভিতর দিয়ে কয়েক মুহূর্ত কি কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে ! টেবিলের উপরে ঐ যে মৃত মানুষটিকে দেখছেন, প্রাচীন মিশরে ও বেঁচে ছিল চার হাজার বছর আগে ! কিন্তু ওকে যদি এখনি জাগাতে পারা যায়, ও হয়তো বলবে, মিনিট-খানেক আগেই ও বেঁচে ছিল ! দিলীপবাবু, এই 'মমি'টা খুব চমৎকার, নয় ?"

পচা-মড়া কাটাই হচ্ছে দিলীপের ব্যবসা। নরদেহের নাড়িনক্ষত্র তার জানা আছে। 'মমি'টার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে তাকে ভালো করে আবার দেখতে লাগল। তার দেহের মাংস শুকিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু কোথাও কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভাব নেই। হাড়ের উপরে চামড়া এখনো 'টাইট' হয়ে চেপে আছে, দুই কানের উপরে রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল-গুলো এখনো ঝুলে রয়েছে। কোটরের ভিতরে বাদামের মতন দুটো তীক্ষ্ণ চোখ এখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ভৈরব উঠে দাঁড়িয়ে 'মমি'র কপালের কোঁচকানো চামড়ার উপরে হাত রেখে বললে, "এই প্রাচীন ভদ্রলোকের নাম আমি জানি না। এঁকে আমি কিনেছিলুম একটা নিলাম থেকে।"

দিলীপ বললে, "জ্যান্তো অবস্থায় লোকটি বোধহয় খুব জোয়ান ছিল।

—"খালি জোয়ান নয়, অতিকায়। মাথায় এই লোকটি ছয় ফুট সাত ইঞ্চি উঁচু ! এর হাড়গুলো কি-রকম চওড়া দেখুন। এ যদি এখন

জ্যান্তো হয়ে ওঠে, তাহলে গায়ের জোরে আমরা কেউ এর সঙ্গে যুঝতে পারব না।"

ভৈরব বেশ সহজভাবেই কথা কইবার চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু দিলীপ স্পষ্ট বুঝতে পারলে, তার মনের ভিতরটা এখনো, ভয়ে থম-থম করছে! তার হাত কাঁপছে, তার ঠোঁট কাঁপছে এবং তার চোখের দৃষ্টি থেকে-থেকে কেবলি সেই 'মমি'টার মুখের দিকে ফিরে যাচ্ছে। তবু তার ভয়ের ভিতর থেকেও যেন একটা আনন্দের আভাসও ফুটে উঠছে! বিষম বিপদের মধ্যেও সে আবিষ্কার করেছে যেন কোন সফলতার কারণ! দিলীপকে দরজার দিকে অগ্রসর হতে দেখে ভৈরব বললে, "আপনি কি এখনি যাবেন? আর একটু থাকবেন না?"

দিলীপ বললে, "আর থাকা অসম্ভব। আমার পড়া এখনো শেষ হয় নি।"

—"অবনীবাবু, আপনি?"

—"আমিও আর থাকতে পারব না, রাত অনেক হল।"

জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভৈরব বললে, "আচ্ছা, চলুন অবনীবাবু, আপনাকে খানিক এগিয়ে দিয়ে আসি।"

দিলীপ বুঝলে, ভৈরব এখন এ-ঘরে একলা থাকতে রাজি নয়। কিন্তু কেন? নিজের ঘরে তার ভয় কিসের?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কে কথা কয়, খাবার খায়, চলা-ফেরা করে?

তারপর থেকেই দিলীপের সঙ্গে ভৈরব রীতিমত মাখামাখি শুরু করে দিলে। যদিও দিলীপ খুব মিশুক লোক ছিল না এবং ভৈরবের কর্কশ স্বভাব তার বিশেষ ভালো লাগত না, তবু সাধারণ ভদ্রতার অনুরোধে ভৈরবের সঙ্গে তাকে অল্পবিস্তর মেলামেশা করতেই হল। ভৈরব প্রায়ই তার কাছ থেকে নানা শ্রেণীর বই পড়বার জন্যে নিয়ে যেত এবং সেও মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে ভালো ভালো বই চেয়ে আনত।

এইভাবে দিনকয়েক পরে পরিচয় কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ হলে দিলীপ বুঝলে যে, নানা বিষয়েই ভৈরব হচ্ছে অসাধারণ পণ্ডিত। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে দিলীপ তার কাছে প্রায় শিশু। প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে তার চেয়ে বিশেষজ্ঞ লোক বোধহয় সারা ভারতবর্ষে নেই।

দিলীপ একদিন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা ভৈরব-বাবু, প্রাচীন মিশরীরা মড়াকে 'মমি' করে কবর দিত কেন?"

ভৈরব বললে, "প্রাচীন মিশরের বিশ্বাস ছিল, আত্মা অমর। পৃথিবীর মৃত্যুর পরে আর অনন্ত জীবন আরম্ভ হবার আগে দেহ ছেড়ে আত্মা কিছুকাল আলাদা হয়ে থাকে বটে, কিন্তু তারপর আবার পার্থিব

দেহের ভিতরেই ফিরে আসে। আত্মা আর দেহের এই পুনর্মিলনের আগেই নশ্বর দেহ পাছে নষ্ট হয়ে যায়, সেই ভয়ে মিশরীরা নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে দেহকে চিরস্থায়ী করে রাখবার চেষ্টা করত। তারা দেহকে কফিনে পুরে কেবল গোর দিয়েই নিশ্চিন্ত হতো না, আত্মা যে-দিন আবার দেহের ভিতরে ফিরে আসবে, তখন তার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে কবরের ভিতরে খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড়, খাট-বিছানা, তৈজসপত্র প্রভৃতি যা-কিছু দরকার সবই রেখে দিত। রাজা-রাজড়া আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মৃত্যু হলে তাঁদের দাস-দাসীদেরও দেহের সঙ্গে কবরে যেতে হতো, অর্থাৎ তাদের হত্যা করে দেহগুলো কবরে পাঠানো হতো—যাতে করে দেহের ভিতরে ফিরে এসে রাজার আত্মা লোকাভাবে কষ্ট না পায়!"

—"ভৈরববাবু, আপনি কি এই বিশ্বাস সত্যি বলে মনে করেন?"

—"আমি কি সত্যি বলে ভাবি, সে কথা শুনে কি হবে? তবে প্রাচীন মিশরের পুরুতরা যে মমিকে বাঁচিয়ে তোলবার মন্ত্র জানত, এটা হয়তো মিথ্যা নয়!"

—"সে মন্ত্র এখন আর কেউ জানে না?"

—"প্রাচীন মিশরে যে অদ্ভুত মানুষরা বাস করত, তাদের কেউ আর বেঁচে নেই, 'মমি' রূপে নষ্ট হয় নি কেবল তাদের দেহগুলো। তবে পুরানো পাপিরস-পাতার গুটানো পুঁথিতে মড়া-জাগানো মন্ত্র-তন্ত্র এখনো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে-রকম পুঁথি এখন অত্যন্ত দুর্লভ।"

—"আপনি প্রাচীন মিশরের ভাষা জানেন?"

—"জানি।"

—"তাদের মড়া-জাগানো মন্ত্র আপনি কখনো পড়েছেন?"

—"আমি? না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি"—বলেই ভৈরব অন্য প্রসঙ্গ তুললে।

কিন্তু সে প্রসঙ্গটাও হচ্ছে মমির প্রসঙ্গ। সে বললে, "প্রাচীন মিশরের মানুষরা তাদের সভ্যতা আর অনেক গুপ্তকথা নিয়ে পৃথিবী

থেকে চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে বটে, মমিদের জ্যান্তো মানুষ করে তোলবার বিদ্যাও আজ কেউ জানে না বটে, কিন্তু মিশরের পুরানো গোরস্থানের মধ্যে আজও যে দেহহীন আত্মারা জীবন্ত হয়ে আছে, মিশর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অনেক বিলাতী পণ্ডিত এই বৈজ্ঞানিক যুগেও সে সন্দেহ প্রকাশ না করে পারেন না! বিলাতী সংবাদপত্রেও প্রায়ই পড়া যায়, কৌতূহলী সাহেব-ভ্রমণকারীরা মিশর থেকে মমি কিনে বিলাতে নিয়ে গিয়ে নানান অলৌকিক কাণ্ড দেখেছেন, আশ্চর্য সব বিপদে পড়েছেন! কবর থেকে বার করে আনলে মমি যে অভিশাপ বহন করে আসে, এ-কথা তো এখন চলতি বিলাতী প্রবাদের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে! যে সব বিখ্যাত সাহেব-পণ্ডিত মাটি খুঁড়ে প্রাচীন মিশরের কবর ঘেঁটে তছনছ করেন, তাঁদের অনেকেই যে পরে নানা দৈবদুর্ঘটনায় অপঘাতে মারা পড়েন, একথাও সবাই জানে! এইসব দেখে-শুনে স্বীকার করতে হয় যে, আজ আমরা যাদের মমি দেখি, তাদের আত্মা এখনো মরে নি, নিজেদের পার্থিব দেহকে এখনো তারা ভালোবাসে এবং সুযোগ পেলেই আবার সেই দেহে ফিরে আসতে চায়! আমরা হিন্দু, আমরাও প্রাচীন জাতি, আর আমরাও আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করি। দেহের প্রতি মমতা থাকলে পাছে আত্মা পৃথিবী ছাড়তে না চায়, হয়তো সেই ভয়েই হিন্দুদের শাস্ত্র বিধান দিয়েছে, আগুনে পুড়িয়ে মৃতদেহকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলতে!"

সময়ে-সময়ে দিলীপের মনে হতো, ভৈরবের মধ্যে উন্মাদরোগের পূর্বলক্ষণ দেখা দিয়েছে। একদিন কথা কইতে কইতে হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, "মঙ্গল আর অমঙ্গলকে নিজের অধিকারে আনতে পারা—ওঃ সে কী সৌভাগ্য! স্বর্গের দেবতা আর নরকের দানবকে যদি আমার হাতের মুঠোয় পাই, তাহলে আমি পৃথিবী শাসন করতে পারি!"

আর একদিন সে বললে, "অবনীর বোনকে আমি বিয়ে করব বটে, কিন্তু অবনী কোন কর্মেরই নয়! অবশ্য মানুষ হিসাবে অবনী ভালো

লোক, কিন্তু যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, সে তার যথার্থ বন্ধু হতে পারবে না। সে আমার বন্ধু হবার যোগ্য নয়!"

আজ কদিন থেকে তাকে আবার একটা নতুন রোগে ধরেছে। দিলীপ নিচে থেকে প্রায়ই শুনতে পায়, উপরের ঘরে একলা বসে ভৈরব নিজের সঙ্গে নিজেই কথা কয়! গভীর রাতে দিলীপ পড়াশুনো করছে, উপরের ঘরে বাইরের জনপ্রাণী নেই, অথচ চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে বেশ শোনা যায়, ভৈরব খুব মৃদু স্বরে—প্রায় ফিস-ফিস করে—আপন মনে কথাবার্তা কইছে!

তার এই অদ্ভুত অভ্যাসে বিরক্ত হয়ে দিলীপ একদিন বললে, "ভৈরববাবু, নিজের সঙ্গে নিজেই গল্প করতে কি আপনার খুব ভালো লাগে?"

ভৈরব চমকে উঠে বললে, "আমি কি নিজের সঙ্গে গল্প করি? না, না, আপনি ভুল শুনেছেন!"

কিন্তু দিলীপ ভুল শোনে নি, শীঘ্রই সে প্রমাণ পাওয়া গেল। কেষ্ট হচ্ছে দিলীপের পুরানো চাকর। সে একদিন বললে, "বাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

—"কি কথা?"

—"ওপরের ঘরের ঐ বাবুটির মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে?"

—"কেন?"

—"আমার তো তাই মনে হয়। ঘরে কেউ থাকে না, অথচ তিনি কথা বলেন কার সঙ্গে?"

—"সে কথায় তোমার দরকার কি কেষ্ট?"

—"দরকার নেই বটে, কিন্তু এটা কি আশ্চয্যি নয়? এর চেয়েও আশ্চয্যি কি জানেন? বাবুটি যখন নিজের ঘরের দরজায় চাবি বন্ধ করে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যান, তাঁর ঘরের ভেতরে মেঝের ওপরে ভারি ভারি পা ফেলে তখনো কে বেড়িয়ে বেড়ায়! বাবু, এ-সব ভালো কথা নয়, আমার ভারি ভয় হয়!

—"কী বাজে বকছ!"

—"বাজে নয় বাবু, আমি নিজের কানে শুনেছি! কেবল ঘরের ভেতরে নয় বাবু, এক-একদিন বাইরেও পায়ের শব্দ শুনতে পাই। একদিন হল কি, আমি উঠোনের কোনে আমার ঘরের সামনে বসে তামাক সাজচি। তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে, উঠোনের ওদিকটা অন্ধকার। বাসায় কেউ ছিল না বলে সদর দরজায় খিল দিয়ে রেখেছি। হঠাৎ শুনলুম, সিঁড়ি দিয়ে কে নেমে আসছে! বাসায় কেউ নেই, তবু সিঁড়ি দিয়ে কে নামে! আমি সুধুলুম—'কে যায়?' সাড়া পেলুম না, কিন্তু উঠোনের যেখানটা অন্ধকার, সেখানে শুনলুম কার পায়ের শব্দ! তার-পরই দুম্ করে সদরের খিল খুলে গেল আর দরজা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল! এ কী কাণ্ড, বাবু!"

—"কেষ্ট, ভৈরববাবু নিশ্চয়ই তোমার অজান্তে বাসায় ছিলেন, বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনিই!"

—"তাহলে তিনি সাড়া দিলেন না কেন?"

—"সেটা তাঁর খুশি।"

—"তাহলে আর-একটা কথা বলি শুনুন! ভৈরববাবুর খাবার আসে রোজ হোটেল থেকে, জানেন তো? এতদিন দু-বেলা একজনের জন্যেই খাবার আসত, কিন্তু হোটেলের চাকরের মুখে শুনলুম, আজকাল রোজ রাত্রে খাবার আসে দুজনের জন্যে। ভৈরববাবু একলা, কিন্তু তাঁর ঘরে রাত্রে দুজনের খাবার যায় কেন? সে খাবার কে খায়?"

—"ভৈরববাবুই। হয়তো তাঁর ক্ষিধে বেশি, একজনের খাবারে কুলোয় না।"

—"কিন্তু তাঁর ক্ষিধে কি রাত্রেই বাড়ে? সকালে তো দুজনের খাবার আসে না? আর আগে তো তাঁর এমন রাক্ষুসে ক্ষিধে ছিল না? হঠাৎ তাঁর রাতের ক্ষিধেই বা বাড়ল কেন? যখন থেকে এই আশ্চয্যি পায়ের শব্দ পাচ্ছি, তাঁর ক্ষিধে বেড়েছে তখন থেকেই!"

—"কেষ্ট, তুমি একটি রাবিশ!"

—"বিশ্বাস করছেন না, কি আর বলব!"—এই বলে কেষ্ট চলে গেল।

দিলীপ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—ভৈরব যখন ঘরে থাকে না, তখন কে সেখানে চলা-ফেরা করতে পারে? ভৈরব কি তার ঘরের ভিতরে অন্য কোন লোককে লুকিয়ে রেখেছে? সে কে? আর লুকিয়েই বা থাকবে কেন? আজ কেষ্ট যে এই ছুজনের খাবারের কথা বললে, সেটাই বা কী ব্যাপার? যদি ধরি, ভৈরবের ঘরে কেউ লুকিয়ে আছে আর ছুজনের খাবার আসে সেই জন্যেই, তাহলে রোজ সকালেও ছুজনের খাবার আসে না কেন? সকালে সে কি উপোস করে থাকে?.........
এ-সবই যে ধাঁধার মতন গোলমেলে কাণ্ড। কেষ্টকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলুম বটে, কিন্তু আমাকেও যে ভাবিয়ে তুললে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আবার পদশব্দ

সে রাত্রে ভৈরব নেমে এসে দিলীপের সঙ্গে গল্প করছিল।

কথা কইতে কইতে দিলীপ স্পষ্ট শুনতে পেলে, দোতালার ঘরের মেঝে কার পদশব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে—কে যেন ভারি ভারি পা ফেলে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে! তারপরেই দুম করে উপরের দরজার আওয়াজ!

দিলীপ সচমকে বলে উঠল, "ভৈরববাবু, কে আপনার ঘরের দরজা খুললে, কি বন্ধ করলে!"

ভৈরব এক লাফে উঠে পড়ে একান্ত অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখের ভাব দেখলে মনে হয়, সে যেন ভয়ও পেয়েছে এবং দিলীপের কথা বিশ্বাসও করতে পারছে না!

সে থেমে থেমে বললে, "ঘরের দরজা নিশ্চয়ই আমি তালা দিয়ে

এসেছি। হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই! দরজা খোলা অসম্ভব!"

—"শুনুন ভৈরববাবু শুনুন! সিঁড়ির ওপরে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন! কে নিচে নেমে আসছে!"

ভৈরব বেগে বাইরে ছুটে গিয়ে দিলীপের দরজার পাল্লা দুখানা চেপে বন্ধ করে দিলে এবং দ্রুতপদে সশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে তার পায়ের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল এবং তারপরে শোনা গেল ফিস-ফিস করে কথার আওয়াজ! খানিক পরে আবার দোতালা ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল, তারপর ভৈরব নিচেয় এসে ফের যখন দিলীপের ঘরে ঢুকলে, তখন তার কপাল বয়ে নেমে আসছে ঘামের দর-দর ধারা!

অবসন্নের মতো চেয়ারের উপরে বসে পড়ে ভৈরব হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "নাঃ, সব ঠিক আছে! ঐ হতচ্ছাড়া কুকুরটার কাণ্ড আর কি! সেই-ই দরজাটা খুলে ফেলেছিল, আমি তালা বন্ধ করতে ভুলে গিয়ে-ছিলুম কিনা!"

ভৈরবের বিকৃত মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দিলীপ বললে, "আপনার যে আবার একটা কুকুর আছে, এ-খবর তো আমার জানা ছিল না!"

—"হ্যাঁ, সবে পুশেছি! আবার তাড়িয়ে দেব, জ্বালিয়ে মারলে!"

—"আমিও কুকুর ভালোবাসি। একবার তাকে আনুন না, দেখব।"

—"বেশ তো, তবে আজ নয়। আজ আমার একটা জরুরি কাজ আছে, এখনি বাইরে যেতে হবে।"

ভৈরব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। কিন্তু দিলীপ নিচে বসেই শুনতে পেলে জরুরি কাজে বাইরে না গিয়ে সে নিজের ঘরে ঢুকেই ভিতর থেকে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে!

দিলীপ মনে মনে খাপ্পা হয়ে উঠল! ভৈরব তাহলে পয়লা-নম্বরের মিথ্যাবাদী! এমন কাঁচা মিথ্যাকথা কইলে যে, একটা শিশুকেও ফাঁকি দিতে পারবে না! ঘরে কুকুর আছে না ছাই আছে! সিঁড়ির উপরে

এইমাত্র যে পায়ের শব্দ শোনা গেল, কোন কুকুরের পায়ের আওয়াজই সেরকম হতে পারে না! দস্তুরমত মানুষের পায়ের আওয়াজ! কেষ্ট তো ঠিক কথাই বলেছে! কিন্তু কে তার ঘরে লুকিয়ে আছে? কেন লুকিয়ে আছে? সে কি খুনে? চোর? পুলিশের ভয়ে এখানে এসে গাঢাকা দিয়েছে? তাই কি ভৈরব মিথ্যা বললে? কিন্তু যে-লোক পলাতক আসামীকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখে, তার সঙ্গে তো আর কোন সম্পর্ক রাখাই উচিত নয়! শেষটা কি সেও পুলিশ-মামলায় জড়িয়ে পড়বে?

মনে-মনে ভৈরবকে 'বয়কট' করবার প্রতিজ্ঞা করে দিলীপ 'অ্যানাটমি'র একখানা মস্ত বই টেনে নিয়ে পড়তে বসল। কিন্তু খানিক পরেই আবার পড়ায় বাধা পড়ল।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখে, ঘরের মধ্যে প্রতাপের আবির্ভাব হয়েছে।

তার পাশে বসে পড়ে প্রতাপ বললে, "দিলীপ, তুমি একটি আস্ত গ্রন্থকীট! দিন-রাত খালি পড়া আর পড়া আর পড়া! এদিকে পরশু আমাদের 'ইলিয়ট-সিল্ডে'র খেলা সে কথা কি তোমার মনে নেই?"

—"টিমে কি আমি আছি?"

—"নিশ্চয়! 'সিলেকসান' হয়ে গেছে আজই। তুমি খেলবে রাইট লাইনে। কাল মাঠে গিয়ে 'প্রাকটিস্' করে এস।"

—"যাব। কিন্তু আজ বিদায় হও দেখি, আমাকে পড়তে দাও। আর কোন খবর নেই তো?"

—"একটা খবর আছে। তোমাকে সেদিন নন্দলাল আর ভৈরবের ঝগড়ার কথা বলেছিলুম, মনে আছে তো? কাল নন্দলাল বিষম বিপদে পড়েছিল।"

—"কি বিপদ?"

—"নন্দলাল কাল মাঠের রাস্তা দিয়ে সন্ধ্যার সময়ে বাড়ি ফিরছিল, এমন সময়ে হঠাৎ কে তাকে আক্রমণ করে!"

—"কে আক্রমণ করে?"

—"সেইটে বলাই তো মুশকিল! নন্দলালের মতে, সে মানুষ নয়! অবশ্য তার গলায় নখের আঘাতে যে গভীর ক্ষত হয়েছে, মানুষের নখে সেরকম ক্ষত হওয়া সম্ভবও নয়!"

—"তবে? তবে কি নন্দলালের ঘাড়ে ভূত চেপেছিল?"

—"ধুৎ! কে বলছে তা? ভূত-টুৎ কিছু নয়! আমার বিশ্বাস, চিড়িয়াখানা বা কোন খেলাওয়ালার দল থেকে ওরাং-উটান কি শিম্পাঞ্জীর মতো কোন বড় জাতের বানর বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। এ কীর্তি তারই! ···নন্দলাল রোজ ঐ পথ দিয়ে ঠিক ঐ সময়েই বাড়ি ফেরে। সেখানে পথের উপরেই একটা ঝাঁকড়া বটগাছ অন্ধকার সৃষ্টি করে ঝুঁকে পড়েছে। নন্দলাল যখন তার তলা দিয়ে আসছিল, ঠিক তখনি সেই অজানা জীবটা হঠাৎ তার ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে—

নন্দলালের বিশ্বাস সে সেই গাছের ডাল থেকেই তার কাঁধের উপরে অবতীর্ণ হয়েছিল। পিঠের উপরে পড়েই জীবটা দুই হাত দিয়ে তার গলা প্রাণপণে চেপে ধরে! নন্দলালের মনে হচ্ছিল কে যেন ইস্পাতের

ফিতে দিয়ে তার গলা চেপে ধরেছে! সে কিছুই দেখতে পেলে না; কেবল সেই ভীষণ হাত-দুখানা তার গলার চারিধারে চাপের উপর চাপ দিতে থাকে! প্রাণের ভয়ে সে আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ করে ওঠে এবং তার চিৎকার শুনে কোথা থেকে দুজন লোক ছুটে আসে! তাদের দেখেই সেই জীবটা চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্রগতিতে একটা পাঁচিলের উপর লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে যায়! নন্দলাল শুধু অনুভব করেছে এক-জোড়া লৌহ-হস্তের মৃত্যু-বাঁধন আর একটা মস্ত বড় অপচ্ছায়া,—এ-ছাড়া আর কিছুই সে জানে না।"

দিলীপ বললে, "হয়তো সে কোন খুনে-ঠগীর হাতে পড়েছিল।"

—"হতে পারে। কিন্তু নন্দলাল বলে, তা নয়। তার মতে, যে তাকে আক্রমণ করে গলা টিপে ধরেছিল, তার হাত দুখানা বরফের মতো কনকনে ঠাণ্ডা!—কোন জীবের স্পর্শ ই সে-রকম শীতল হয় না! নিশ্চয়ই এটা তার মনের ভ্রম, কিন্তু বেচারী ভয়ে একেবারে মুশড়ে পড়েছে। ...হ্যাঁ, ভালো কথা! তোমার বন্ধু ভৈরবচন্দ্র নন্দলালকে যে-রকম ভালোবাসে, বোধ হয় এ-খবরটা শুনলে আনন্দে নৃত্য করতে থাকবে! আমি তাকে খুব চিনি, সে কোন শত্রুকেই ক্ষমা করে না। অতএব সাবধান, কোনদিন তাকে ঘাঁটিও না!"

দিলীপ বললে, "সে আমার মিত্রও নয়, শত্রুও নয়। তার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয়ই হয়েছে, তাকে আমার ঘাঁটাবার দরকার কি?"

—"তোমার কথা তুমিই বুঝবে, আমি শুধু বলে খালাশ। কেবল এইটুকু মনে রেখো, তার কাছ থেকে যত তফাতে থাকতে পারো ততই ভালো!" এই বলে প্রতাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দিলীপ আবার পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তার মন তখন এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে, ডাক্তারি কেতাবের কোন কথাই সে যেন দেখতে পেলে না। থেকে থেকে তার মন কেবলই ছুটে যায় দোতালার ঐ বিচিত্র ঘরের অদ্ভুত লোকটির কাছে—যার চারিদিকেই রয়েছে অজানা রহস্যের এক মায়াময় অপার্থিবতা! তারই ফাঁকে ফাঁকে

তার বিস্মিত চিত্ত নন্দলালের উপরে এই আশ্চর্য আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঐ ভৈরবের স্বভাব, আর নন্দলালের উপরে এই আক্রমণ—এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন যোগাযোগ আছে! কিন্তু কী যে সে যোগাযোগ, ভাষায় স্পষ্ট করে তা প্রকাশ করা যায় না।

দিলীপ তার ডাক্তারি বইখানা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিরক্ত স্বরে বলে উঠল, "চুলোয় যাক ভৈরব আর তার বিদকুটে 'মমি'! তার জন্যে আজ আমার পড়া হল না, আর কেবল এইজন্যেই তার সঙ্গে ভবিষ্যতে আর কখনো মেলামেশা করব না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভৈরবের গুপ্তকথা কি?

দশদিন কেটে গেল।

দিলীপ তার মড়ার কঙ্কাল আর ডাক্তারি কেতাব নিয়ে নিজের বিদ্রোহিতার বিরুদ্ধেই জোর করে এমন ব্যস্ত হয়ে রইল যে, ঘরের বন্ধ-দরজায় মাঝে মাঝে ভৈরবের করাঘাত শুনেও সাড়া দেবার নামটি করলে না। সে এসেই হয়তো সেকেলে মিশর আর তার গুপ্তরহস্য নিয়ে এমন সব আজগুবি গালগল্প জুড়ে দেবে যে, শুকনো ডাক্তারি কেতাবের সমস্ত কথাই ভুলে যেতে হবে!

একদিন সে বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে তার খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেলে, তার বন্ধু অবনী অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে দালানের উপরে নেমে এল এবং তার পিছনে পিছনে ছুটে এল রুদ্র-মূর্তিতে ভৈরবচন্দ্র—ভীষণ ক্রোধে তার মুখ হয়ে উঠেছে হিংস্র জন্তুর মতো কদাকার!

ভৈরব সাপের মতন ফোঁস করে বলে উঠল, "নির্বোধ! এর প্রতিফল

পাবি।"

অবনী চেঁচিয়ে বললে, "যা হয়, হবে! কিন্তু তোমার সঙ্গে আজ থেকেই সব সম্পর্ক তুলে দিলুম! আমি আর তোমার কোন কথাই শুনব না!"

—"বেশ, শুনো না! কিন্তু তুমি যা প্রতিজ্ঞা করেছ সেটা মনে রেখ!"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ! প্রতিজ্ঞা আমি রাখবই! কারুকে কোন কথাই বলব না! কিন্তু এরপরে আমার বোনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া অসম্ভব! তার চেয়ে আমার বোনকে গঙ্গাজলে ডুবিয়ে মারব! আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না"—এই বলেই অবনী হন-হন করে দালান পেরিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেল!

দিলীপ ঘরের ভিতর থেকে সব দেখলে, সব শুনলে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে ওদের গোলমালে যোগ দিতে তার ইচ্ছা হল না। ভৈরবের সঙ্গে কোন কারণে অবনীর ঝগড়া হয়েছে এবং সে তার বোনের সঙ্গে ভৈরবের বিয়ের সম্পর্ক ভেঙে দিলে, দিলীপ, এটুকু বেশ বুঝতে পারলে। তারপর সে জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়ল এবং বাইরে গিয়েও এই কথাই তার বারংবার মনে হতে লাগল, ভৈরবের সঙ্গে অবনীর এমন ঝগড়া হল কেন?

পরদিনের কথা। সেদিন ছিল 'ইলিয়ট সিল্ডের ফাইনাল'। গড়ের মাঠে মোহনবাগান গ্রাউণ্ডে নানান কলেজের ছাত্ররা এসে গগনভেদী কোলাহলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে! দিলীপদের কলেজের সঙ্গেই আজ মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিযোগিতা, খেলার আগেই দুই পক্ষের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে রীতিমত একটা বাক্যযুদ্ধ হয়ে গেল! চলচ্চিত্রে সেই দৃশ্যটি গ্রহণ করলে দর্শকরা চমৎকার একটি কৌতুক-নাট্যের রস উপভোগ করতে পারে!

খেলার শেষে দিলীপ যখন 'ইউনিফরম্' ছেড়ে বাড়িমুখো হয়েছে,

কোথা থেকে হঠাৎ অবনী এসে তার সঙ্গ নিলে।

অবনী বললে, "ভাই দিলীপ, সেদিনকার ব্যাপার কতকটা তুমিও দেখেছ আর শুনেছ। কিন্তু সেদিন আমার এত রাগ হয়েছিল যে, তোমার সঙ্গে কথা না কয়েই চলে এসেছিলুম। সেজন্যে কিছু মনে কোরো না।"

—"আমার তো কিছু মনে করবার কোন কারণ নেই।"

"বেশ কথা! কিন্তু আমার একটি কথা তুমি রাখো। ভৈরব যে-বাসায় থাকে, সেখানে কোন ভদ্রলোকের থাকা উচিত নয়। ও-বাসা ছেড়ে দাও।"

—"কেন বল দেখি?"

অবনী প্রথমটা কোন জবাব দিলে না, দিলীপের সঙ্গে নীরবে খানিকক্ষণ এগিয়ে এল। তারপর বললে, "কেন যে তোমাকে ও-বাসা ছাড়তে বলছি, আমার পক্ষে তার কারণ বলা অসম্ভব। কেন না ভৈরবের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কারুর কাছে কোন কথাই আমি বলব না। কিন্তু এইটুকু আমার বলা উচিত যে, ভৈরবের কাছে ভদ্র বা অভদ্র কোন মানুষেরই থাকা নিরাপদ নয়। যে-কোন মুহূর্তে তুমি বিপদে পড়তে পারো—সাংঘাতিক বিপদ!"

—"বিপদ? তুমি কী বলছ অবনী?"

—"স্পষ্ট করে তোমাকে আমি কিছুই বলতে পারব না। কিন্তু ও বাসা ছেড়ে দাও।"

—"কেন?"

—"ভৈরব হচ্ছে অমানুষিক মানুষ, এ ছাড়া তার আর কোন বর্ণনা করা যায় না। সেই যে সেদিন সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকেই আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হয়। কাল আমি তাই তাকে চেপে ধরেছিলুম। দিলীপ, তখন দায়ে পড়ে সে আমাকে যেসব কথা বললে, শুনে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল! তার উপর ভৈরব বলে কিনা আমাকে তার দলভুক্ত হয়ে সাহায্য করতে! ভাগ্যে যথা-

সময়ে ভৈরবের আসল চরিত্র টের পেয়েছি, তার সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে হয়ে গেলে কি সর্বনাশই না হত। ভগবান রক্ষা করেছেন!"

—"অবনী, হয় তুমি খুব বেশি বলছ, নয় বলছ খুব কম!"

—"আমি কিছুই বলব না বলে ভৈরবের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি।"

—"তুমি যদি জানতে পারো, কেউ তার প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে চায়, তাহলে অঙ্গীকার করেছ বলে কি সেকথা প্রকাশ করবে না? ভৈরবকে আমি ভয় করব কেন?"

—"কারণ সে হিংস্র পশুর মতো ভয়ঙ্কর। হয়তো সে এখনো তোমার কোন অনিষ্ট করে নি, কিন্তু সাপ কখনো কামড়ায় নি বলে কে সাপের গর্তের পাশে বাস করতে চায়?"

—"অবনী, তুমি ভাবছ ভৈরবের গুপ্তকথা আমি জানি না। এটা তোমার ভুল! তুমি তো এই কথাই আমার কাছে প্রকাশ করতে চাওনা যে, ভৈরবের ঘরে আর এক ব্যক্তি বাস করছে?"

অবনী চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মহা বিস্ময়ে দিলীপের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, "তুমি তাহলে সব জানো?"

গর্বের হাসি হেসে দিলীপ বললে, "হুঁ, তা আর জানি না! ভৈরব কোন ফেরারি আসামীকে তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছে, এই তো?"

অবনীর বিস্মিত ভাবটা মিলিয়ে গেল। সে ঘাড় নেড়ে বললে, "আমি কিছু বলতে পারব না। ভৈরব আমার মুখ বন্ধ করে রেখেছে।"

দিলীপ বললে, "আমি আর কিছু শুনতেও চাই না। তবে এটা জেনে রাখো, তুমি ভৈরবকে খারাপ লোক বললে বলেই বাসা ছেড়ে আমি পালাব না। কেন পালাব? ও বাসা আমার খুব পছন্দসই।"

—অবনীকে পিছনে রেখে দিলীপ ট্রাম-লাইনের দিকে অগ্রসর হল। তার সেই যুক্তিহীন ভয় দেখে দিলীপ মনে মনে কৌতুক অনুভব করলে। মানুষ হিসাবে ভৈরব অমানুষিক হবে কেন? বড়-জোর তার স্বভাবটাই মিষ্ট নয়! হয়তো তার কোন কোন অস্বাভাবিক বাতিক আছে—এমন বাতিক কত লোকেরই তো থাকতে পারে! মানুষের প্রকৃতি হরেক-

রকম বলেই তো এই পৃথিবী এমন বিচিত্র! হয়তো ভৈরব তার ঘরের মধ্যে কোন খুনী আসামীকে আশ্রয় দিয়েছে! কিন্তু সেজন্যে বাইরের লোক অকারণে মাথা ঘামিয়ে ভয় পাবে কেন?

টালিগঞ্জের অমন খাসা বাসা কি ছাড়া যায়? কলকাতায় থেকেও সে কলকাতার বাইরে আছে! জনতার আর ট্রাম-বাস-ট্যাক্সির হট্টগোল নেই, হাজার পাখির 'কোরাস' শুনে তার ঘুম ভাঙে, চারিদিকে তাকিয়েই দেখা যায়, মাঠের পর মাঠ ভরে সবুজ রঙের স্রোত বইছে এবং তার উপরে ঝরে পড়ছে নীলাকাশের আলোর ঝরনা! ও বাসা ছাড়া হবে না!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শূন্য ও পূর্ণ কফিন

দিলীপের এক বন্ধু ছিল, মণিলাল। সে বয়সে কিছু ছোট হলেও তার সঙ্গে দিলীপের খুব বনিবনাও ছিল।

মণিলাল ধনীর ছেলে এবং দিলীপের মতো সেও নির্জনতার ভক্ত! কলেজের পড়া সাঙ্গ করেও সংসারে ঢোকে নি। নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ও ফুলের বাগান নিয়েই দিন কাটিয়ে দিত মনের খুশিতে। দিলীপদের বাসা ছাড়িয়ে আরো মাইল দেড়েক এগিয়ে গেলেই তার বাগান-ঘেরা সুন্দর বাড়িখানি দেখতে পাওয়া যায়। জায়গাটি অনেকটা পল্লীগ্রামের মতো।

হপ্তায় বার-দুয়েক দিলীপ তার এই বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করতে যেত। অবনীর সঙ্গে তার শেষ দেখা হবার পরদিন সন্ধ্যা আটটার সময়ে দিলীপ ঘর থেকে বেরুলো তার বন্ধু মণিলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বেরুবার সময়ে টেবিলের দিকে চোখ পড়াতে দেখলে, তার উপরে পড়ে

রয়েছে ভৈরবের কাছ থেকে চেয়ে আনা একখানি দামী বৈজ্ঞানিক বই।

দিলীপের মনে হল ভৈরবের সঙ্গে সে আর মেলামেশা করতে চায় না বটে, কিন্তু তার বইখানি ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

বইখানি তুলে নিয়ে সে দোতালার সিঁড়ি ধরে উপরে উঠল। ভৈরবের দরজার সামনে গিয়ে তার নাম ধরে দুবার ডাকলে। সাড়া পেলে না। দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। উঁকি মেরে দেখলে, ঘরের ভিতরে ভৈরব নেই। ভাবলে, ভালোই হল, ভৈরবের সঙ্গে আর কথা কইতে হল না, বইখানা ঘরের ভিতরে রেখে চুপিচুপি চলে যাই।

সে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ল্যাম্পটা কমানো রয়েছে বটে, কিন্তু আবছা আলোয় ঘরের সব দেখা যাচ্ছে। সমস্ত ঘরখানার মধ্যে যেন এক অজানা অলৌকিক রহস্য স্তম্ভিত হয়ে আছে, আলোকের অল্পতায় তার ভিতরে এসে দাঁড়ালেই বুকের ভিতরে জেগে ওঠে কেমন একটা অস্বস্তি! দিলীপ এধারে ওধারে চোখ ফিরিয়ে দেখলে, ছাদে সেই ঝুলন্ত কুমীর, দেওয়াল ঘেঁসে সেই পশুমুণ্ডধারী মিশরী দেবদেবীর জটলা এবং মাঝখানে সেই মমির কফিন। ···কিন্তু, কফিনের মধ্যে বীভৎস মমিটা নেই! ঘরের চারিদিকে তাকিয়েও দিলীপ সেটাকে দেখতে পেলে না। হয়তো তাকে ঘর থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। ভালোই হয়েছে।

দিলীপ নিজের মনেই বললে, "ভৈরবের উপরে আমি বোধহয় অবিচার করেছি। এখানে যদি কোন গুপ্তরহস্য থাকত, তাহলে সে নিশ্চয়ই ঘরের দরজা এমন করে খুলে রেখে যেত না!"

দিলীপ বই রেখে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আবার সিঁড়ি বয়ে নামতে লাগল। সিঁড়িতে আলো ছিল না। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। সে এক-দিকের দেওয়াল ধরে নামছে, হঠাৎ সিঁড়ির উপরে শোনা গেল একটা অস্পষ্ট শব্দ, একটা আগুনের ফিনকির আভাস, একটা ঠাণ্ডা-কনকনে হাওয়ার ঝটকা—কে যেন তার পাশ কাটিয়ে বেগে উপরে উঠে গেল!

—"কে, ভৈরববাবু নাকি?"

কোন সাড়া নেই—কিন্তু উপরে ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল।

দিলীপের মন কৌতূহলে ভরে গেল, সেও তাড়াতাড়ি আবার উপরে উঠল। ভৈরবের ঘরের দরজা তেমনি বন্ধ রয়েছে, ঠেলতেই খুলে গেল।

ঘরের ভিতরে উঁকি মারতেই সর্বপ্রথমে তার চোখ পড়ল কফিনটার উপরে। তার মধ্যে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই মৃতদেহটা!

দিলীপ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না! আরো তুই পা এগিয়ে গিয়ে ভালো করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখলে, কফিনের মমি কফিনেই বিরাজ করছে!

কিন্তু তিন মিনিট আগেই কফিনের ভিতরে যে কিছুই ছিল না, দিলীপ শপথ করে তা বলতে পারে! চোখের ভ্রম? এও কি সম্ভব? সে আড়ষ্ট চক্ষে সেই বিভীষণ সুদীর্ঘ মৃত মূর্তির পানে তাকিয়ে রইল এবং তার মনে হল, মমির কোটরগত চোখত্নটো যেন জ্যান্তো চোখের মতো একবার চকচক করে উঠল!

দিলীপের হতভম্ব ভাবটা তখনো কাটেনি, হঠাৎ নীচে থেকে প্রতাপের ব্যস্ত চিৎকার শোনা গেল—"দিলীপ! দিলীপ! কোথায় তুমি? শীগগির এস!"

দিলীপ দ্রুতপদে নেমে গিয়ে দেখলে, তার ঘরের সামনে কাতর মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রতাপ!

—"কি হে, ব্যাপার কি?"

—"অবনী হঠাৎ জলে ডুবে গেছে! ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না, আপাতত তুমি হলেই চলবে! তাকে জল থেকে তোলা হয়েছে, দেহে এখনো প্রাণ আছে। দেরি কোরো না, শীগগির চল!"

তুজনে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং শীঘ্র অবনীর বাড়িতে পৌঁছবে বলে দৌড়তে-আরম্ভ করলে।

অবনীদের বৈঠকখানায় ঢুকে দেখা গেল, চৌকির উপরে তার জলসিক্ত অচেতন দেহকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে।

দিলীপ প্রভৃতির চেষ্টায় প্রায় কুড়ি মিনিট পরে অবনীর দেহে একবার শিহরণ দেখা গেল, তারপর তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, তারপর

সে চোখ খুললে।

প্রতাপ বললে, "এইবারে জেগে ওঠ ভাই, জেগে ওঠ! তুমি আমাদের যথেষ্ট ভয় দেখিয়েছ!"

দিলীপ বললে, "আমার ডাক্তারি ব্যাগ থেকে খানিকটা ব্রাণ্ডি বার করে ওকে খাইয়ে দাও।"

অবনীর এক সহপাঠী সেখানে ছিল। সে বললে, "কী ভয়ই আমি পেয়েছিলুম! মাঠে বসে চাঁদের আলোয় আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে অবনী হঠাৎ উঠে একটা পুকুর-ধারে গেল। মাঝখানে কতকগুলো গাছ থাকাতে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলুম না। আচমকা শুনলুম, তার আর্তনাদ আর ঝপাং করে জলে পড়ার শব্দ! তারপর ছুটে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপিয়ে কী কষ্টে যে তাকে ডাঙায় তুলেছি, তা খালি আমিই জানি। আমি তো ভেবেছিলুম, অবনী আর বেঁচে নেই!"

ইতিমধ্যে অবনী কতকটা সামলে নিয়েছে। সে দুইহাতে ভর দিয়ে উঠে বসল এবং তার মুখে-চোখে ফুটে উঠল দারুণ ভয়ের চিহ্ন!

দিলীপ বললে, "কি করে তুমি জলে পড়ে গেলে?"

—"আমি পড়ে যাই নি।"

—"তবে?"

—"কে আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।"

—"সে কি হে?"

—"হ্যাঁ। পুকুর-ধারে দাঁড়িয়েছিলুম, হঠাৎ কে আমাকে দুখানা বরফের মতো ঠাণ্ডা হাতে হালকা পালকের মতো শূন্যে তুলে ধরে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে!"

—"কে সে?"

—"আমি কিছুই দেখিনি, কিছুই শুনিনি। কিন্তু সে যে কে, আমি তা জানি।"

খুব মৃদুস্বরে দিলীপ বললে, "আমিও জানি।"

অবনী সবিস্ময়ে বললে, "তাহলে তুমি জেনেছ? মনে আছে, আমি

তোমাকে কি অনুরোধ করেছিলুম ?”

—“মনে আছে। এইবারে বোধহয় আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করব।”

প্রতাপ বিরক্ত কণ্ঠে বললে, “তোমরা কি গুজ্‌গুজ্‌ ফুস্‌ফুস্‌ শুরু করলে হে ? অবনী এখন বিশ্রাম করুক, এখন আর কোন কথা নয়। এস হে, আমরা বিদায় হই।”

বাসার দিকে ফিরতে ফিরতে দিলীপের কত কথাই মনে হতে লাগল। —মমি-শূন্য কফিন, সিঁড়ির উপরে শব্দ ও কনকনে হাওয়া, তারপরেই কফিনের মধ্যে হারা মমির রহস্যপূর্ণ অসম্ভব পুনরাবির্ভাব এবং তারপর অবনীর উপরে এই অকারণ আক্রমণ! এর আগেই নন্দলালও ঠিক এই ভাবেই আক্রান্ত হয়েছিল এবং এদের দুজনেরই উপরে ভৈরব তুষ্ট নয়! এই সঙ্গে ভৈরবের ঘরের অসাধারণ ব্যাপার-গুলোও স্মরণ হতে লাগল। এই সমস্ত ঘটনা একত্রে নাড়াচাড়া করতে করতে দিলীপের মনের ভিতরে একটা সম্পূর্ণ নাটক গড়ে উঠল। এসবকে মিথ্যা বলা অসম্ভব, কিন্তু পৃথিবীর চক্ষে এদের সত্যতা প্রমাণিত করাও কতটা কঠিন! পৃথিবী বলবে—দিলীপ, তুমি ভুল দেখেছ, কফিন এক মুহূর্তও মমিশূন্য হয় নি, আরো অনেকের মতো অবনীও হঠাৎ জলে ডুবে গেছে, ভেবে ভেবে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, তুমি কোন ভালো ডাক্তারের ঔষধ খাও!······দিলীপ নিজেও নিশ্চয় এরকম গল্প শুনলে এই কথাই বলত! কিন্তু তবু সে এখন স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারে যে, ভৈরবের মন হচ্ছে হত্যাকারীর মন এবং সে এমন এক অশ্রুতপূর্ব ভয়াবহ অস্ত্রের দ্বারা নরহত্যা করতে চায়, পৃথিবীর অপরাধের ইতিহাসে আর কেউ কখনো যা ব্যবহার করতে পারে নি!

দিলীপ স্থির করলে, হপ্তাখানেকের মধ্যেই কোন নতুন বাসায় উঠে যাবে। এ বাসায় থাকলে তার পড়াশোনা আর হবে না, দোতালার ঘরের রহস্য নিয়েই মন ব্যস্ত হয়ে থাকবে।

সে বাসার কাছে এসে পড়ল। দোতালার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে এবং বাইরের দিকে তাকিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভৈরব।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে দিলীপ দেখলে, ভৈরব সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে।

ভৈরব বললে, "দিলীপবাবু, নমস্কার। আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই। এখন কি আপনার সময় হবে?"

দিলীপ ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "না!"

—"সময় হবে না? লেখাপড়া নিয়ে আপনি এতই ব্যস্ত? আমি অবনীর কথাই বলতুম। শুনছি তার নাকি কি বিপদ হয়েছে?" ভৈরবের মুখ গম্ভীর, কিন্তু তার চোখে যেন আনন্দের আভাস!—দিলীপের ইচ্ছা হল, মারে তার মুখে এক ঘুসো!

সে বললে, "ভৈরববাবু, শুনে আপনি বড় দুঃখিত হবেন যে, অবনী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে! আপনার শয়তানি কৌশল এবার কাজে লাগে নি! বেহায়ার মতো কিছু উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না, আমি সব জেনে ফেলেছি!"

খাপ্পা দিলীপের রুক্ষ কথা শুনে ভৈরব প্রথমটা থতমত খেয়ে দুই পা পিছিয়ে গেল। তারপর বললে, "আপনি পাগল হয়ে গেছেন দিলীপবাবু। কী আপনি বলতে চান? অবনীর দুর্ঘটনার জন্যে আমি দায়ী?"

বজ্রনাদে দিলীপ বললে, "হ্যাঁ! দায়ী আপনি, আর আপনার ঐ শুকনো মড়া! ভৈরববাবু, সেকাল হলে আপনাকে হয়তো জীবন্তে পুড়িয়ে মারা হতো, কিন্তু ভুলে যাবেন না, একালেও ফাঁসিকাঠ আছে! এই টালিগঞ্জে যদি আর কোন লোক এইভাবে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারায় তাহলে আমিই আপনাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করব! মিশরী মড়ার খেলা বাংলাদেশে চলবে না,—বুঝেছেন?"

—"আপনাকে শীঘ্রই পাগলা-গারদে পাঠাতে হবে দেখছি।"

—"আচ্ছা! দেখা যাবে, আমিই পাগলা-গারদে যাই, না আপনিই ফাঁসিকাঠে দোল খান!" —বলেই দিলীপ নিজের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চলন্ত মৃতদেহ

পরদিন সন্ধ্যায় দিলীপ স্থির করলে, আজ মণিলালের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

পথে বেরিয়ে পিছন ফিরে দেখলে, উপরের আলোকিত ঘরের জানলায় ভৈরব আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্তির মতো। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোধহয় তাকেই দেখছিল!

তার পাপ-সংসর্গ থেকে তফাতে এসে দিলীপ একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে।

দূরে তালকুঞ্জের মাথার উপর থেকে চাঁদ যেন সকৌতুকে পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করছে এবং হালকা বাতাসে ভেসে আসছে শান্ত সন্ধ্যার একটি স্নিগ্ধ গন্ধ। জ্যোৎস্নায় স্বপ্নময় নীলসাগরে যেন কোন পরীপুরীর উদ্দেশে চলেছে ছোট ছোট মেঘের তরণী। দুইপাশে মাঠের জনশূন্য উন্মুক্ততা নিয়ে এগিয়ে চলল দিলীপ, মনের আনন্দে।

তখন জনমানবের সাড়া নেই। প্রায় আধঘণ্টা পরে দেখা গেল, খানিক তফাতে মণিলালের বাড়ির জানলাগুলো আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

হঠাৎ দিলীপের কি মনে হল, একবার ফিরে পিছনপানে তাকিয়ে দেখলে। চাঁদের কিরণে ধবধবে পথটি একটি চওড়া শুভ্র-রেখার মতো অনেক দূরে অস্পষ্টতার মধ্যে গেছে হারিয়ে। কিন্তু তারই উপর দিয়ে

অভিশপ্ত অপচ্ছায়ার মতো কি-একটা দ্রুতবেগে এগিয়ে আর এগিয়ে আসছে!

দিলীপের বুক ছাঁৎ করে উঠল। কী ও? মানুষ? কী লম্বা ওর কালো দেহ, শুভ্র পথের জ্যোৎস্নাকেও ও যে কলঙ্কিত করে তুলেছে! ওর চোখদুটো যেন দপদপ করছে, প্রত্যেক পদক্ষেপের তালে তালে হাড়গুলো বেজে উঠছে খড়-মড় করে, যেন ওর সারা দেহের সঙ্গেই মাংসের সম্পর্ক নেই! কী অস্বাভাবিক ওর গলা—যেন একটা বাঁখারির উপরে বসানো আছে মুণ্ডুটা! ভয়াবহ সাক্ষাৎ-মৃত্যুর মূর্তি ঝড়ের মতো ছুটে আসছে শিকারের দিকে!

দিলীপ আর দাঁড়ালে না, মণিলালের বাড়ির দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগল—কণ্ঠে তার আর্ত চিৎকার! পিছনে মৃত্যু-পিশাচ, সামনে আলোকজ্জ্বল জীবনময় অট্টালিকা, ওদিকে নরক, এদিকে স্বর্গ, কিন্তু মাঝখানে এখনো রয়েছে বিপদজনক ব্যবধান! এই পথটুকু আজ কী লম্বাই মনে হচ্ছে, আজ যেন আর পথের শেষ আসবে না!

কিন্তু পথের শেষ এল—জীবন্ত-মৃত্যু তখন তার কাছ থেকে মাত্র দশ হাত দূরে, জ্বলন্ত চক্ষে দুখানা অস্থিসার দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে সে দিলীপকে ধরবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

একটানে বাগানের ফটক খুলে দিলীপ আবার ছুটল, বাড়ির দরজা সেখান থেকেও খানিকটা দূরে!

সভয়ে শুনলে, বিভীষিকা তখনও তার পিছু ছাড়েনি—সেও সশব্দে ফটকটা খুলে ফেললে এবং পিছনে, অতি-নিকটে তার কঠিন পায়ের শব্দ।

দেহের শেষ শক্তিটুকু প্রয়োগ করে দিলীপ তার দ্রুতগতিকে দ্বিগুণ দ্রুত করে তুললে এবং কোনরকমে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে দরজাটা বন্ধ করে খিল তুলে দিলে।

কোথা থেকে ছুটে এসে মণিলাল বললে, "কি আশ্চর্য! দিলীপ—দিলীপ, ব্যাপার কি?"

দরজার উপরে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে দিলীপ অতি ক্ষীণস্বরে বললে, "আগে এক গেলাস জল!"

মণিলাল দৌড়ে গিয়ে যখন এক গেলাস জল নিয়ে ফিরে এল, দিলীপ তখন একান্ত অবসন্নের মতো একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে হাঁপ সামলাবার চেষ্টা করছে।

—"এই নাও জল! বন্ধু, তোমার এ কী মূর্তি, মুখ যে একেবারে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে!"

দিলীপ সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে তার তপ্ত পাথরের মতন শুকনো গলাটা ভিজিয়ে নিলে। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বললে, "মণিলাল, সব কথা পরে বলছি। আপাতত শুনে রাখো, আজ রাত্রে তোমার বাড়িই হবে আমার শয়ন-মন্দির। কাল সকালে আবার সূর্যোদয় না হলে আমি আর এ- বাড়ির বাইরে যেতে পারব না।"

দিলীপের মুখের দিকে তাকিয়ে মণিলাল বললে, "তুমি যা বলবে, তাই হবে। আমি তোমার জন্যে ব্যবস্থা করতে বলছি। ওকি, উঠে আবার কোথায় যাচ্ছ?"

—"দোতালার বারান্দায়। সেখান থেকে চারিদিকের সব দেখা যায়। তুমিও আমার সঙ্গে এস। আমি যা দেখেছি তুমিও তা নিজের চোখে দেখলে ভালো হয়।"

দোতালার বারান্দায় বেরিয়ে চোখে পড়ল চারিদিকেই চন্দ্রালোকের রাজ্য—যার প্রজা হচ্ছে গাছপালা লতা-পাতা ফুল-ফল!

দিলীপ প্রথমে বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে বাগানের যতখানি দেখা যায় তার উপরে চোখ বুলিয়ে নিলে। সেখানে দখিনা বাতাসে কেবল ছোট-বড় ফুলগাছেরা দুলে দুলে চন্দ্রলেখার স্বপ্ন দেখছে।

তারপর সে মাঠের পর মাঠের দিকে এবং সুদীর্ঘ সাদা ফিতার মতো মেঠো পথের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে। সেখানেও জনহীন পূর্ণ শান্তির মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে সুমধুর জ্যোৎস্না! কাছে বা দূরে জীবন্ত কোন প্রাণীর ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না।

মণিলাল বললে, "দিলীপ! তুমি কি সিদ্ধি খেয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছ? এখানে এসে কাকে তুমি খুঁজতে চাও?"

—"সে কথা তোমাকে বলছি।···কিন্তু, কোথায় সে গেল, কোথায় লুকোলো?······হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ দেখ মণিলাল, ঐ দেখ! পথটা যেখানে মোড় ফিরেছে, ঐখানে তাকিয়ে দেখ"—বলেই সে উত্তেজিতভাবে মণিলালের বাহু সজোরে চেপে ধরলে!

মণিলাল বললে, "হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি! আমাকে দেখাবার জন্যে এত জোরে আমার হাত চেপে ধরবার দরকার নেই! হ্যাঁ, ওখান দিয়ে কেউ যাচ্ছে বটে! কোন মানুষ, দেখলে মনে হয়—সে রোগা, কিন্তু ঢ্যাঙা—খুব ঢ্যাঙা! বেশ তো, পথ দিয়ে মানুষ যাচ্ছে—আর মানুষরা চিরকালই পথ দিয়ে চলে, কিন্তু সেজন্যে তোমার এত-বেশি ভয় পাবার কারণ কি?"

—কারণ কিছুই নেই, তবে ঐ মূর্তিটাই আমাকে ধরবার জন্যে পিছনে তাড়া করেছিল! আচ্ছা, তোমার বৈঠকখানায় চল, সব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করছি!"

দুজনে আবার নেমে বৈঠকখানায় এসে বসল। প্রচুর আলোকে আনন্দময় সেই সাজানো ঘরের একখানা কৌচের উপরে বসে দিলীপ একেবারে গোড়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা একে একে মণিলালের কাছে বর্ণনা করে গেল—ছোটখাট খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত বাদ দিলে না।

কাহিনী সাঙ্গ করে সে বললে, "মণিলাল, এই হচ্ছে আমার অভিশপ্ত অভিজ্ঞতার ইতিহাস। এ কাহিনী অসম্ভব বটে, কিন্তু এর প্রত্যেক বর্ণই সত্য!"

মণিলাল বেশ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, তার মুখের উপরে একটা হতভম্ব ভাব!

তারপর সে ধীরে ধীরে বললে, "আমার জীবনে এমন গল্প কখনো শুনি নি! তুমি সমস্ত বিষয় বর্ণনা করলে বটে, কিন্তু তুমি নিজে কি

সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছ বল দেখি ?"

—"তোমার নিজের মত কি ?"

—"তার আগে তোমার মত শুনতে চাই। এ-বিষয় নিয়ে তুমি ভাববার সময় পেয়েছ, আমি পাই নি।"

—"আসল ব্যাপার আমার যা মনে হয়, তা হচ্ছে এই। ঐ শয়তান ভৈরব মিশরে গিয়ে এমন কোন গুপ্তমন্ত্র শিখে এসেছে, যার গুণে মমিকে —অর্থাৎ হাজার হাজার বছর আগেকার মড়াকে—অথবা একটা বিশেষ মড়াকে অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে জ্যান্তো করে তুলতে পারা যায়। যেদিন সে প্রথম অজ্ঞান হয়ে যায়, সেদিন সম্ভবত মড়াটাকে সর্বপ্রথম জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল। কিন্তু একটা পুরানো শুকনো মড়া জীবন্ত হয়ে উঠছে, এই অনভ্যস্ত অসম্ভব দৃশ্য দেখেই যে সে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। তারপরে জীবন্ত মড়ার নড়াচড়া দেখতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যদিও মমির সেই জীবন নিশ্চয়ই দীর্ঘস্থায়ী নয়। কারণ আমি তাকে দিনের পর দিন সম্পূর্ণ জড়পদার্থের মতো কফিনের ভিতরে থাকতে দেখেছি। কিন্তু এক অপার্থিব অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হয়ে ভৈরব বুঝলে যে, মড়ার সাহায্যেও সে মনের মতো কার্য সফল করতে পারে। কারণ এটা হচ্ছে মানুষের মড়া, অতএব জ্যান্তো হলে তার মানুষী বুদ্ধি আর শক্তিও ফিরিয়ে পায়। নন্দলালের উপরে ভৈরবের রাগ ছিল, তার উপরেই সে প্রথম পরীক্ষা করলে। তারপর এই নতুন ক্ষমতা পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে সে অবনীকেও নিজের দলে টানবার চেষ্টা করলে। কিন্তু অবনী হচ্ছে ভিন্ন ধাতুতে গড়া। এসব অন্যায় ভুতুড়ে ব্যাপারে সে যোগ দিতে চাইলে না। ভৈরবের সঙ্গে তার ঝগড়া বাধল। এমন লোকের হাতে সে নিজের বোনকে সমর্পণ করতে নারাজ হল, আর তার ফলে সেও পড়ল ভৈরবের হুকুমে এই জ্যান্তো মড়ার হাতে। কিন্তু আগে নন্দলাল, তারপরে অবনী যে প্রাণে প্রাণে কোনরকমে রেহাই পেলে, সেটা হচ্ছে দৈবের মহিমা! নইলে ভৈরবের উপরে আজ দু-দুটো নরহত্যার চাপ

পড়ত। তারপর সে যখন টের পেলে যে, আমিও তার গুপ্তকথা জেনে ফেলেছি, তখন আমাকেও তার পথ থেকে সরিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলে! আমি যে এখানে আসব সে তা জানত। দিলে তার মমিকে লেলিয়ে! কিন্তু ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন, নইলে কাল সকালেই তোমার বাগানের ভিতরে দেখতে পেতে আমার মৃতদেহ! আমি ভীতু লোক নই, কিন্তু এ-রকম মৃত্যু-ভয় অতি-বড় সাহসীও সহ্য করতে পারে না!"

মণিলাল অবিশ্বাসের হাসি হাসতে হাসতে বললে, "বন্ধু, অতিরিক্ত লেখাপড়া করে করে তোমার মাথার গোলমাল হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর কলকাতায় চার হাজার বছরের পুরানো মিশরের জ্যান্তো মমি! সবচেয়ে কড়া গাঁজার ধোঁয়াও এর কাছে হার মানে! এই মমিকে খালি তুমিই দেখেছ, আর কেউ একে জ্যান্তো অবস্থায় দেখে নি!"

—"নিশ্চয়ই আরো কেউ কেউ দেখেছে। কারণ এ অঞ্চলের অনেকেই বলছে যে, বানর-জাতীয় কোন জীব যেখানে সেখানে মানুষের উপরে অত্যাচার করছে। তা ছাড়া তারা আর কি বলবে? আসল ব্যাপারটা যে কল্পনা করাও অসম্ভব!"

—"কল্পনার দরকার কি? আসল ব্যাপার তো বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

—"কী বোঝা যাচ্ছে?"

—"প্রথমত ধর, তুমি বলছ শূন্য কফিনকেও হঠাৎ পূর্ণ হতে দেখেছ! তুমি ভুলে যাচ্ছ, ভৈরবের ঘরের আলো কমানো ছিল। সেই ম্লান আলোতে প্রথমটা তোমার ভালো করে তাকাবার দরকার হয় নি, তাই তুমি চোখের ভ্রমে মমিটাকে দেখতে পাও নি!"

—"না, না, মণিলাল! এ হতে পারে না।"

—"হতে পারে না কি, তাই-ই হয়েছে। তারপর আমার বিশ্বাস, এ-অঞ্চলে হঠাৎ কোন গুণ্ডা এসে লীলা-খেলা শুরু করেছে। নন্দলালের উপরে সেই-ই আক্রমণ করেছে, তোমাকে একলা পেয়ে সেই-ই তেড়ে এসেছে, আর অবনী জলের ভিতরে নিজেই পড়ে গেছে দৈবগতিকে। এ-সবের জন্যে ভৈরবকে দায়ী কোরো না, কারণ তোমার এ উদ্ভট মত

ধোপে টিকবে না। তাকে জোর করে আদালতে হাজির করলেও আইন তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করবে না।"

দিলীপ গম্ভীর স্বরে বললে, "আমি তা জানি। তাই আইনের আশ্রয় না নিয়ে আমি নিজের শক্তির উপরেই নির্ভর করতে চাই।"

—"তার মানে?"

—"আমি কলকাতাকে এক অদ্ভুত বিপদ থেকে রক্ষা করতে চাই। কেবল তাই নয়, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমি নিজে আত্মরক্ষা করতে চাই। আমার কর্তব্য আমি স্থির করেছি। এখন ঘণ্টাখানেক আমাকে একলা থাকতে দাও। আমাকে একটা কলম আর একখানা কাগজের 'প্যাড' দিতে পারবে?"

—"নিশ্চয়ই। ঐ কোণের টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেই তুমি যা চাও তাই পাবে।"

দিলীপ টেবিলের ধারে গিয়ে বসল। তারপর কাগজ-কলম নিয়ে কি লিখতে লাগল। একঘণ্টার পর দুই ঘণ্টার আগে তার লেখা শেষ হল না। ততক্ষণ ধরে মণিলাল একখানা সোফায় বসে বই পড়তে ও মাঝে মাঝে দিলীপের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল।

তারপর দিলীপ এক তাড়া কাগজ নিয়ে উঠে এসে মণিলালের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "এখন তুমি সাক্ষী হও। এই কাগজের তলায় একটা সই করে দাও।"

—"সাক্ষী হব? কিসের সাক্ষী?"

—"এটা যে আজকের তারিখে আমি সই করেছি, তারই সাক্ষী হবে তুমি। বন্ধু, এরই ওপরে আমার জীবন নির্ভর করছে!"

—"দিলীপ, তুমি পাগলের মতো কথা কইছ। চল, খেয়ে-দেয়ে শোবে চল।"

—"আমি যা করেছি, অনেক ভেবে-চিন্তেই করেছি। যে মুহূর্তে তুমি সই করবে, আমি তোমার সব কথাই শুনব। নাও, সই কর।"

—"কিন্তু, কিজন্যে সই করব সেটা বল।"

—"আজ আমি তোমাকে যে-ঘটনাগুলো বলেছি, এইসব কাগজে তা লিখে রাখলুম। তুমি কেবল সাক্ষী হও, মণিলাল!"

মণিলাল তখনি সই করে দিয়ে বললে, "নাও, কেমন? হল তো? কিন্তু তোমার মৎলব কি, আমি জানতে চাই।"

—"পুলিসের হাতে যদি ধরা পড়ি, তাহলে এই কাগজগুলো দাখিল কোরো।"

—"পুলিসের হাতে তুমি ধরা পড়বে? কেন?"

—"হয়তো আমি নরহত্যা করব!"

—"দিলীপ, দিলীপ! গোঁয়ারের মতো কোন কাজ কোরো না!"

—"মোটেই নয়। আমি আমার কর্তব্যই করব। এখন এই কাগজগুলো তুমি রেখে দাও। আমি এইবার খেয়ে-দেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে চাই। কাল সকালে আমার অনেক কাজ।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অপূর্ব শবদাহ

দিলীপকে যারা চেনে তারা জানে যে, শত্রু হিসাবে সে বড় সহজ মানুষ নয়। যেমন মন দিয়ে সে লেখাপড়া করত, তেমনি ভাবে দেহ-মন একাগ্র করেই লোকের সঙ্গে বন্ধুতা বা শত্রুতা করতে পারত। এই ছিল তার স্বভাব। অর্ধসমাপ্ত করে কোন-কিছুই সে ফেলে রাখতে পারত না।

সে যে কি করবে সে-কথা কিছুতেই মণিলালের কাছে ভাঙলে না। কিন্তু পরদিন প্রভাতে পূর্ব-আকাশে রঙের খেলা শুরু হবার আগেই দিলীপ বিছানা ছেড়ে জামা-কাপড় পরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

এই তো সেই চিরপরিচিত বিহঙ্গ-কলরোলে ও তরু-মর্মরে সঙ্গীতময়

পথ আর মাঠ, কিন্তু অবর্ণনীয় বিভীষিকার চলন্ত ছায়াকে বুকে করে রাতে ওরাই কি ভয়ানক হয়ে উঠেছিল!

রাতের অন্ধকার ও অস্পষ্টতা এসে পথ-ঘাটে যে-কোন বিভীষিকার জন্যে জমি তৈরি করে রাখে। তাই হঠাৎ কোথাও একটা গাছের ডাল নড়লে বা প্যাঁচা ডেকে উঠলে বা বাদুড় ডানা ঝটপট করলে মানুষের বুকও ছমছম করতে থাকে! কিন্তু দিনের বেলায় সুস্পষ্ট সূর্যালোক কাপুরুষকেও সাহসী করে তোলে। সেই সৃষ্টিছাড়া মূর্তিটা আজ যদি এখন এই মেঠো পথে এসে দাঁড়ায়, দিলীপ নিশ্চয়ই তাহলে কালকের মতো ভয়ে উদভ্রান্ত হয়ে ওঠে না!

এমনি সব ভাবতে ভাবতে দিলীপ কাঁচা রোদের সোনা-মাখা পথের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

প্রথমে প্রতাপের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। প্রতাপ তখন সবে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে প্রভাতী চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে।

দিলীপকে এত ভোরে দেখে বিস্মিত হয়ে বললে, "তুমি যে এখন? চা আনতে বলি?"

—"না, ধন্যবাদ! প্রতাপ, তুমি এখনি আমার সঙ্গে আসতে পারবে?"

—"কেন পারব না?"

—"আমি যা বলব, করবে?"

—"নিশ্চয়!"

—"তোমাদের বন্দুক আছে না?"

—"আছে। কিন্তু বন্দুক কি হবে?"

—"সেটা সঙ্গে করে নিয়ে এস। আর এক গাছা খুব মোটা লাঠি!"

—"বাঘ মারা যায় এমন লাঠি তোমায় দিতে পারি। কিন্তু এত অস্ত্রশস্ত্র কেন? যুদ্ধযাত্রা করবে নাকি?"

—"দেওয়ালের উপরে ঐ যে বড় রাম-দাখানা টাঙানো রয়েছে, ওখানাও চাই।"

—"এ যে কুরুক্ষেত্রের আয়োজন! আর কিছু চাই? কামান-টামান?"

—"আপাতত দরকার হবে না। তোমাকেও দরকার হতো না, কিন্তু পাছে একজনের বেশি লোক আমাকে আক্রমণ করে, সেই ভয়েই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা কেউ শিশু নই, কেউ আক্রমণ করলে নিশ্চয়ই লড়াই করতে পারব, কি বল?"

—"পারা তো উচিত! কিন্তু এখন বীরদর্পে কোন্ দিকে যাত্রা করতে হবে, বল? ফোর্ট-উইলিয়মের দিকে?"

—"না। আমার বাসার দিকে!"

—"তোমার বাসার দিকে!"

—"অর্থাৎ ভৈরবের বাসার দিকে!"

—"কিন্তু সে জন্যে এমন সমর-সজ্জার প্রয়োজন কি? ভৈরবকে যদি বধ করতে চাও, একটা ঘুসি বা চড় বা লাথিই যথেষ্ট!"

—"না প্রতাপ, না! ভৈরব একলা নেই!"

—"তাহলে সেও কি সৈন্য সংগ্রহ করেছে?"

—"এসব প্রশ্নের জবাব পরে দেব। এখন যা বলি, শোনো। বন্দুক আর রাম-দা নিয়ে আমি ভৈরবের ঘরে ঢুকব। ঐ মোটা লাঠি কাঁধে করে তুমি দরজার বাইরে অপেক্ষা করবে। যদি আমার দরকার হয়, তোমাকে আমি ডাকব। তখন তুমি লাঠি চালিয়ে শত্রু মারতে একটুও ইতস্তত কোরো না। এখন চল!"

—"যো হুকুম, জেনারেল! তাহলে এই আমি 'কুইক-মার্চ' শুরু করলুম!"

ভৈরব টেবিলের সামনে বসে একমনে কি লিখছিল। দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে দেখলে, দিলীপ ঘরে ঢুকে আবার দরজা ভেজিয়ে দিলে—তার পিঠে বাঁধা বন্দুক, হাতে রাম-দা!

প্রথমটা সে হতভম্বের মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর বিষম রাগে তার কপালের শিরগুলো ফুলে উঠল।

দিলীপ কফিনটার দিকে তাকিয়ে দেখলে, নিসাড় মৃত্যুর আড়ষ্টতা নিয়ে প্রাচীন মিশরবাসী সেই সুদীর্ঘ মানবের মৃতদেহটা কফিনের ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কোটরগত চক্ষে আজ জাগ্রত দৃষ্টির এতটুকু আভাস নেই, তার মাংসহীন বিবর্ণ চামড়া-ঢাকা অস্থিসার দেহের উপরে শত-শত শতাব্দীর কুৎসিত জীর্ণতা মাখানো, লম্বা হাত দুখানা অনাবশ্যক উপসর্গের মতো একান্ত অসহায়ভাবে দেহের দুইদিকে ঝুলছে—যদিও তার কাঁকড়ার দাড়ার মতো বাঁকানো নিষ্ঠুর হাতের আঙুলগুলো দেখলে মন যেন দমে যায়। কিন্তু চার হাজার বছরের ঐ পুরাণো শুঁটকো মড়া যে আবার ঐ কফিন ছেড়ে পৃথিবীর সবুজ মাটির উপরে পদচালনা করতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা শুনলে পাগলও বোধহয় অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠবে!

দিলীপ রীতিমত গদিয়ানি চালে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে যেন নিজের মনেই বললে, "দেখছি ধুনুচীতে আজ ধুনোও পুড়ছে না, প্যাপিরাস-পুঁথির মন্ত্রও কেউ পড়ছে না, জন্তুমুখো দেবতাদের পুজোর আয়োজন নেই, মমিরও ঘুম এখনো ভাঙে নি!"

ঠোঁট ফাঁক করে হিংস্র দাঁতগুলো দেখিয়ে ভৈরব বললে, "দিলীপ-বাবুর বোধহয় ভ্রম হয়েছে! এটা তাঁর নিজের ঘর নয়!"

দিলীপ বললে, দিলীপবাবুর ভ্রম হয় নি! তিনি যে একটা হত্যা-কারীর আস্তানায় এসেছেন, এ জ্ঞান তাঁর আছে।"

ভৈরব বললে, "আমি যদি এখন ফোন করে পুলিস ডাকি, তাহলে ঘরে ঢুকে কী দেখবে তারা? শান্তিপ্রিয় গোবেচারা ভৈরবের হাতে রয়েছে মাত্র একটি ফাউন্টেন পেন আর মহাবীর দিলীপবাবুর পৃষ্ঠদেশে বাঁধা দোনলা বন্দুক আর হাতে চকচক করছে মস্ত খাঁড়া!"

দিলীপ গাত্রোত্থান করে বললে, "পিঠের বন্দুক এই আমি হাতে নিলুম, আর এই রাম-দা উপহার দিলুম তোমাকে! এইবার তুমিও সশস্ত্র হলে তো?"

টেবিলের উপরে স্থাপিত রাম-দার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে

ভৈরব বললে, "তারপর? রাম-দার সঙ্গে কি বন্দুকের যুদ্ধ হবে?"

দিলীপ বুঝতে পারলে, ভৈরব মনের ভাব চাপবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু ভয়ে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠছে! সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে রাম-দা নিয়ে তুমিও উঠে দাঁড়াও! তারপর ঐ মমিটাকে কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেল!"

শুকনো হাসি হেসে ভৈরব বললে, "ও, খালি এই? মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা?"

—"হ্যাঁ, খালি এই! শুনলুম, রাজার আইন তোমাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু আমার নিজের একটা আইন আছে। তার কাছে তোমার মুক্তি নেই। তোমার ঘরের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ। বেলা আটটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। এই আমি বন্দুক তৈরি রাখলুম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুমি যদি ঐ মমিটাকে কেটে টুকরো-টুকরো করে না ফেল, বন্দুকের গুলিতে আমি তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।"

—"তুমি আমাকে খুন করবে!"

—"হ্যাঁ!"

—"কি কারণে?"

—"তোমার শয়তানির জন্যে।...ভৈরব, এক মিনিট গেল!"

—"কিন্তু কী শয়তানি আমি করেছি?"

—"বলা বাহুল্য। তুমিও জানো, আমিও জানি।"

—"এ হচ্ছে ধাপ্পা দিয়ে ভয় দেখানো।"

—"দু মিনিট কাটল!"

—"ধাপ্পায় আমি ভয় পাব না। তুমি হচ্ছ পাগল—বিপদজনক পাগল। তোমার কথায় আমার নিজের সম্পত্তি নষ্ট করব কেন? ওটি মূল্যবান মমি।"

—"তোমাকে ওটা কেটে খান-খান করে আর পুড়িয়ে ফেলতে হবেই।"

—"আমি ওসব কিছুই করব না।

—"চার মিনিট কাটল।

দিলীপ বন্দুক তুলে তার নলটা ফেরালে ভৈরবের দিকে। তার মুখে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার ভাব।

—"ভগবানের নামে শপথ করছি, আটটা বাজলেই আমি তোমাকে পাগলা কুকুরের মতো গুলি করে মারব! এর জন্যে আমি ফাঁসি যেতেও রাজি! এখনো উঠলে না? ঘড়িতে আটটা বাজছে! তবে মর"—দিলীপ ঘোড়ার উপর আঙুল রাখলে।

ভৈরব উঠে পড়ে ভয়ার্ত মুখে বললে, "রক্ষা কর! আমি তোমার কথামতই কাজ করব!"—বলেই সে তাড়াতাড়ি রাম-দা তুলে মমির সরুঙ্গে গলার উপরে এক কোপ বসিয়ে দিলে, কাটা মুণ্ডটা খটাস করে

মাটির উপরে পড়ে গেল! তারপর মড়ার উপরে কোপের পর কোপ পড়তে লাগল, ভৈরব এক-একবার কোপ বসায়, আর এক-একবার মহাভয়ে ফিরে দেখে, দিলীপ কি করছে! মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই

সব শেষ—ঘরের মেঝের উপরে শুকনো মড়ার খণ্ড-বিখণ্ড হাত, পা, বাহু, নাক, মুখ, চোখ, ধড় ও কুচি-কুচি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল।

দিলীপ বজ্রগম্ভীর স্বরে বললে, "ওর ওপরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগাও!"

ভৈরব নীরবে তার হুকুম তামিল করলে। শুকনো মড়ার টুকরো-গুলো কাগজের মতো সহজেই দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল—বিশ্রী দুর্গন্ধে ও আগুনের তাপে টেঁকা দায়!

কিন্তু দিলীপ তখনো বন্দুক তুলে স্থির মুখে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভৈরব ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, "কেমন, হয়েছে তো?"

—"না। বার কর তোমার সেই মন্ত্র-লেখা পাপিরাস পাতার পুঁথি। সেটাও আগুনে ফেলে দাও।"

কাতর স্বরে ভৈরব বললে, "না, না, তাথেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না! দিলীপবাবু, আপনি কি রত্ন নষ্ট করতে চাইছেন জানেন না! সে পুঁথি জ্ঞানের আধার। তেমন পুঁথি পৃথিবীতে আর নেই!"

—"ভৈরব, পোড়াও সেই পুঁথি!"

—"দিলীপবাবু, আমার কথা শুনুন। পুঁথিখানা পোড়াতে বলবেন না! ও-পুঁথি আমাদের দুজনের সম্পত্তি হয়ে থাক। ওর সব কথা আপনাকে আমি নিজে শিখিয়ে দেব। তাহলে আমরা দুজনে হব বিশ্বজয়ী!"

টেবিলের কোন টানায় পুঁথিখানা আছে, দিলীপ তা জানত। সে এগিয়ে গিয়ে সেখানা টেনে বার করলে।

ভৈরব হাউমাউ করে উঠে তার হাত থেকে সেখানা কেড়ে নিতে এল। কিন্তু দিলীপ এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে পুঁথিখানা আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করলে।

পুঁথিখানা যখন পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল, দিলীপ ফিরে হাসিমুখে বললে, "ভৈরবচন্দ্র, এখন তুমি হলে নির্বিষ সাপের মতো। আর আমার এখানে কোনো কাজ নেই—বিদায়!"*

---

* বিদেশী কাহিনীর অনুসরণে।

অন্ধকারের বন্ধু

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিচয়

হেমন্ত চৌধুরীকে আমি ছেলেবেলা থেকেই অসাধারণ মানুষ বলে মনে করে আসছি।

পাঠশালা থেকে ইস্কুলে, ইস্কুল থেকে কলেজে আমরা দুজনে বরাবরই একসঙ্গে শিখেছি লেখাপড়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ধাপ পর্যন্ত ওঠবার পরেও জীবনের যাত্রাপথে আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয় নি—সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে। তার কারণ, আমরা দুজনেই ছিলুম স্বাধীন।

আরো নানান দিকেই আমাদের দুজনের মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখা যায়। আমরা দুজনেই ধনীর সন্তান এবং দুজনেই শৈশবে বাপ-মাকে হারিয়েছি। দেহচর্চার দিকে আমাদের দুজনেরই একান্ত ঝোঁক—কুস্তি, যুযুৎসু, 'বক্সিং' (সঙ্গে সঙ্গে লাঠি তলোয়ার খেলা) কিছুই শিখতে বাকি রাখি নি—যদিও প্রতিযোগিতায় বরাবরই হেমন্ত হয়েছে প্রথম এবং আমি হয়েছি দ্বিতীয়। আমরা দুজনেই দেশে দেশে বেড়াতে ভালবাসি এবং যৌবনেই ইউরোপ-আমেরিকা পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। আমরা দুজনেই বিবাহ করি নি এবং ঘটকরা বাড়ির চৌকাঠ মাড়ালেই ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে যাই।

কিন্তু আমাদের দুজনের দিন ও সময় কাটাবার উপায় একরকম নয়। কারণ, হেমন্ত করে সখের গোয়েন্দাগিরি, আর আমি করি সখের সাহিত্য-সাধনা।

আমার সাহিত্য-সাধনার কথা নিয়ে এখানে কিছু বলবার দরকার নেই। আমি আজ কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি অন্য কারণে।

—"রবীন, পুলিসের ওপরে অকারণে তুমি এতটা নির্দয় হোয়ো না। আর পুলিসের দৃষ্টি শিল্পীদের ওপরে পড়বেই-বা না কেন, শুনি? শিল্পী মানেই কি সাধু? ফ্রান্সের বিখ্যাত কবি ভিলন কি চোর আর খুনী ছিলেন না? ইতালীর সিজিসমোন্দো মালাতেসার নাম শুনেছ?"

—"না। কে তিনি?"

—"কবি, পণ্ডিত, ললিত-কলার উপাসক। মধ্য-যুগে তার জন্ম। কিন্তু তার মতো দুর্নীতিপরায়ণ ক্রিমিনাল তুমি কলকাতার কোন কফিখানা বা বস্তী খুঁজলেও পাবে না। ও-সব কথা যাক। আমি এখন কি দেখছি জানো? তাজমহলের স্রষ্টা সাজাহান বাদশার পাঞ্জা।"

—"দেখি।" বইখানি হাতে নিয়ে দেখলুম, একখানি ছবিতে ছাপা সম্রাট সাজাহানের ডানহাতের ছাপ।

হেমন্ত বললে, "সেকালে মোগল-সাম্রাজ্যের সমস্ত মূল্যবান কাগজপত্রের ওপরে সম্রাটের পাঞ্জার ছাপ থাকত। কারণ, মোগলরা জানত, শীলমোহর বা হাতের সই জাল হতে পারে, কিন্তু পাঁচ-আঙুল-সুদ্ধ করতল বা পাঞ্জার ছাপ জাল হওয়া অসম্ভব। পৃথিবীর কোন দুজন মানুষের পাঞ্জার ছাপ এক-রকম হতে পারে না। বাংলা পুলিসের স্যর উইলিয়ম হার্সেল সাহেব পৃথিবীতে সর্বপ্রথমে আসামীদের আঙুলের ছাপ নেবার পদ্ধতি গ্রহণ করেন এই সেদিন—১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। আজ এই পদ্ধতির আদর পৃথিবীর দেশে-দেশে। কিন্তু ভারতে এই পদ্ধতির জন্ম বহুকাল আগে। কেবল মোগলদের পাঞ্জার ছাপ নয়, হিন্দুরাও প্রাচীনকাল থেকে দলিলের ওপরে নাম-সইয়ের বদলে আঙুলের টিপ-সই করে আসছে। সুতরাং আধুনিক পুলিসের আবিষ্কারের ভেতর কোনই বাহাদুরি নেই।...

—"কিন্তু রবীন, সাজাহান বাদশার পাঞ্জার ছাপ দেখে তোমার কিছু মনে হচ্ছে না?"

—"হচ্ছে বৈকি! মনে হচ্ছে এ হাতের ছাপ দেখলে সাজাহানকে স্মরণ হয় না!"

—"ঠিক বলেছ। দিল্লী-আগ্রার নানা প্রাসাদে, মসজিদে স্মৃতি-সৌধের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালে যে শিল্পী সাজাহানের সৌন্দর্য-প্রীতি দেখলে অভিভূত হয়ে যেতে হয়, এই কি তার নিজের হাতের ছাপ ? আধুনিক বিশেষজ্ঞরা বলেন, মানুষের আঙুলের গড়ন দেখলে তার প্রকৃতি আর পেশা বোঝা যায়। কিন্তু সাজাহানের আঙুলের গড়ন দেখ! শিল্পীর আঙুলের গড়ন এ-রকম হওয়া উচিত নয়—যে-কোন সাধারণ লোকের হাতের ছাপ এ-রকম হতে পারে। বসে বসে এই কথাই ভাবছিলুম।"

পুলিস জার্নালখানা রেখে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আমি বললুম, "ভাই, উত্তরদিকের জানলা দুটো বন্ধ করে দি। এই দুর্জয় শীতের ওপরে কাল আবার বৃষ্টি হয়ে ঠাণ্ডা আরও বেড়ে উঠেছে। চট করে এক পেয়ালা চায়ের হুকুম দাও।"

কৌচের উপরে পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে হেমন্ত বললে, "তা যেন দিচ্ছি! কিন্তু দুর্জয় শীতকে যদি এতই ভয়, তবে আজ তুমি গঙ্গাপার হয়ে বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলে কেন ?"

চমৎকৃত হয়ে বললুম, "একথা তুমি কেমন করে জানলে ? কেউ বলেছে বুঝি ?"

—"তুমি তো সিধে ওপার থেকে এপারে নেমেই ধুলোপায়ে আমার বাড়িতে আসছ! এর মধ্যে খবর আর কে দেবে ? কেমন যা বলছি, সত্যি কি না ?"

—"হ্যাঁ ভাই, সত্যি। কিন্তু আমি কোন বাগানে বেড়াতে যাই নি! তুমি তো জানো, বেলুড়ে আমার ভগ্নীপতি থাকেন। তাঁর অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলুম। তবে তাঁর বাড়ির সামনে একটা বেশ বড় বাগান আছে বটে! কিন্তু এ-সব কথা তোমার তো জানবার নয়, তুমি তো কখনো সেখানে যাও নি।"

—"না, তা যাই নি। কিন্তু তুমি তো এ-কথা জানো বন্ধু, সর্বদা আমার চোখ খোলা রাখি বলে কোথাও না গিয়েও আমি অনেক কথাই

বলতে পারি।”

আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলুম, কোন সূত্র ধরে হেমন্ত আমার সম্বন্ধে এত কথা জানতে পারলে? নিজের জামার বোতাম ঘরে যে ‘কার্নেশান’ ফুলটি গুঁজে রেখেছিলুম, হঠাৎ সেইদিকে আমার নজর পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝলুম, হেমন্তের আবিষ্কারের মূল আছে এই ফুলটিতেই।

হেমন্ত অর্ধ মুদ্রিত চোখে আমার ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করছিল! হাসতে হাসতে যেন অন্তর্যামীর মতোই বললে, “না, বন্ধু না। তুমি যা ভাবছ, তা নয়! জামার বোতাম-ঘরের ঐ ফুলটি তুমি কলকাতার, কোন বন্ধুর বাড়ি বা ফুলের দোকান থেকেও সংগ্রহ করতে পারতে। ঐ দেখেই আমি এত কথা আন্দাজ করি নি। তোমার জুতোর দিকে তাকালেই দেখবে, ওর নিচের দিকটায় লেগে রয়েছে ভিজে এঁটেল-মাটি। ও-রকম মাটি কলকাতার কর্দমাক্ত পথেও পাওয়া যায় না! দেখলেই বোঝা যায়, ও হচ্ছে গঙ্গামাটি! জুতো পরে তুমি নিশ্চয়ই স্নান করবার জন্যে গঙ্গা-গর্ভে নামো নি। সুতরাং আন্দাজে বুঝলুম, তুমি নৌকো-যোগে গঙ্গা পার হয়েছ আর ভাটার সময় বলে নৌকা ছেড়ে নামতে বাধ্য হয়েছ ঘাট থেকে খানিক দূরে, গঙ্গামাটির ওপরেই। তোমার বোতাম-ঘরের ফুলটি খুব তাজা রয়েছে, সুতরাং বুঝতে পারলুম, ওটি তুমি কলকাতা থেকে সঙ্গে করে ওপারে নিয়ে যাও নি, তাহলে এতক্ষণে ফুলটি অল্পবিস্তর নেতিয়ে পড়ত। অতএব ফুলটিও তুলেছ অল্পক্ষণ আগে, গঙ্গার ওপারে গিয়েই—খুব সম্ভব কলকাতায় ফেরবার সময়। আর বিলাতি মরশুমী-ফুল ‘কার্নেশান’ তো ওপারের পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে ফোটে না, সুতরাং ধরে নিলুম, ওটি চয়ন করেছ তুমি কোন বাগান থেকেই। তোমার জুতোর গঙ্গামাটি এখনো শুকোবার সময় পায় নি। ঐ ভিজে মাটি দেখেই বুঝেছি, তুমি নৌকা থেকে নেমেই সিধে আমার বাড়িতে এসে উঠেছ! দেখছ বন্ধু, একটু চেষ্টা করলেই মানুষ দেখে কত কথা আবিষ্কার করা যায়?”

আমি বললুম, “তুমি আশ্চর্য লোক, হেমন্ত! আমার সঙ্গে অনর্গল

গল্প করতে করতে এত খুঁটিনাটি লক্ষ্য আর সঙ্গে-সঙ্গে চিন্তা করেছ।"

হেমন্ত বললে, "সবই অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। আর মানুষের মন আর মুখ এক নয়। সে মুখে যখন এক কথা বলে, তার মন তখন অন্য কথা ভাবতে পারে।"

আমি বললুম, "কিন্তু চা কই—আমার চা?...এই মধু! জলদি এক কাপ চা নিয়ে আয়!"

মধু হচ্ছে হেমন্তের চাকরের নাম।

হেমন্ত বললে, "দালানে পায়ের শব্দ শুনছি। যখন খবর না দিয়েই আসছে, নিশ্চয় তখন চেনা লোক।"

বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকলেন সতীশবাবু এবং তাঁর পিছনে পিছনে আর একটি ভদ্রলোক—পরনে তাঁর কোট-পেণ্টালুন।

—"এই যে সতীশবাবু! আসুন, আসুন" বলেই হেমন্ত জিজ্ঞাসু-চোখে পিছনের ভদ্রলোকটির দিকে তাকালে।

সতীশবাবু বললেন, "ওঁকে চেনেন না বুঝি? উনি হচ্ছেন এ-অঞ্চলের বিখ্যাত ডাক্তার মিঃ এ. দত্ত!"

—"মিঃ এ. দত্ত? অর্থাৎ শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত? নমস্কার, নমস্কার! সতীশবাবু, উনি তো শুধু ডাক্তার নন, উনি যে রসায়নশাস্ত্র নিয়েও গবেষণা করেন, ইংরেজী কাগজে প্রবন্ধ লেখেন! মিঃ দত্ত, এই কালকেই একখানি পত্রিকায় মানুষের দেহের ওপরে Butyl chloride-এর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আপনার একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পড়েছিলুম।"

সতীশবাবু বললেন, "আপনি এত খবর রাখেন!"

মিঃ দত্ত লজ্জিতভাবে বললেন, "হেমন্তবাবুর মতো পণ্ডিত লোকের মুখে আমার সুখ্যাতি শুনে আমি গর্ব অনুভব করছি!"

হেমন্ত অট্টহাস্য করে বলে, "আমি আবার পণ্ডিত নাকি? মোটেই নয়—মোটেই নয়! জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে আমি খালি নুড়ি কুড়োবার চেষ্টা করি! তা, আমার পোড়াকপালে নুড়িও সহজে জোটে না! ওকি, আপনারা এখনও দাঁড়িয়ে রইলেন যে? বসুন, বসুন—ওরে মধু, আরো

গোয়েন্দাগিরিতে আজকাল হেমন্ত এমন সুনাম কিনেছে যে, আমার মুখ থেকে নানা লোকে তার কাহিনী শোনবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এজন্যে হেমন্তেরও কাছে অনেকে ধর্ণা দিতে ছাড়েন না। কিন্তু একদিক দিয়ে সে হচ্ছে বেজায়, লাজুক—নিজের বাহাদুরির কথা নিজের মুখে জাহির করতে রাজী হয় না কিছুতেই। তখন সবাই আমাকে নিয়ে টানাটানি করেন এবং আমাকেও নিরুপায় হয়ে তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে হয়। কিন্তু বারে বারে নানা জনের কাছে মুখে মুখে হেমন্তের কত গল্প আর বলব? তাই এবার স্থির করেছি, লোকের আগ্রহ নিবারণের জন্য হেমন্তের কীর্তি-কাহিনী ছাপার হরফে প্রকাশ করব একে একে।

আমি শুরু করব একেবারে গোড়া থেকেই; অর্থাৎ হেমন্ত সর্ব-প্রথমে যে মামলার কিনারা করে দেশ-বিদেশে যশস্বী হয়ে ওঠে, আগে তার কথাই লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাই। কিন্তু তারও আগে হেমন্তের আরো কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার মনে করি।

ম্যাজিকের আমগাছ দর্শকদের চোখের সামনে গজিয়ে ওঠে হঠাৎ। কিন্তু হেমন্ত অকস্মাৎ পুরোদস্তুর গোয়েন্দা হয়ে পড়ে নি, এজন্যে তাকে সাধনা করতে হয়েছে দস্তুরমত।

ছেলেবেলা থেকেই কাল্পনিক গোয়েন্দা-কাহিনী পড়বার জন্য তার অতিশয় ঝোঁক ছিল এবং আজ পর্যন্ত সে পাঠ করে নি, পৃথিবীতে এমন বিখ্যাত গোয়েন্দার গল্প বোধহয় নেই। কিন্তু এই সব কাল্পনিক এবং প্রায়ই অতি-উদ্ভট কাহিনী পড়ে কোনদিনই সে বিশেষজ্ঞ হবার চেষ্টা করে নি!

সে ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়েছিল প্রধানত এক উদ্দেশ্য নিয়ে। পাশ্চাত্য দেশের সত্যিকার গোয়েন্দারা কোন কোন পদ্ধতি অনুসারে কাজ করে, সে গিয়েছিল হাতে-কলমে তাই শেখবার জন্যেই। এদেশের পুলিস-বিভাগের কয়েকজন উচ্চতম কর্মচারীর কাছে থেকে সে খান-কয় সুপারিস-পত্র যোগাড় করেছিল, তারই সাহায্যে গোয়েন্দা-বিভাগের

ভিতর থেকে পাশ্চাত্য-পুলিসদের কাজ দেখবার সুযোগ তার হয়েছিল।

ইউরোপের দেশে দেশে গোয়েন্দা-পুলিসদের কার্যপদ্ধতি আছে নানারকম। তারই মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান ও অস্ট্রিয়ান পুলিসের পদ্ধতি। হেমন্ত এই চার-রকম পদ্ধতি নিয়েই বিশেষভাবে আলোচনা করবার অবসর পেয়েছে।

সেকালকার পুলিসরা কাজ করত অনেকটা অন্ধের মতো। বিজ্ঞান ছিল তখন শিশু এবং বিজ্ঞান যেটুকু জানত, পুলিস সেটুকু সাহায্যও গ্রহণ করা দরকার মনে করত না। বার্টিলনের মাপ নেবার বা আঙুলের ছাপ নেবার পদ্ধতি তখন আবিষ্কৃত হয় নি। ক্যামেরা, মাইক্রোসকোপ ও রসায়ন-শাস্ত্রের কাছ থেকেও পুলিসের কিছু লভ্য ছিল না। রক্তের মতো কোন দাগ দেখলেই পুলিস তাকে গ্রহণ করত রক্ত বলেই ; তা রক্ত কি না এবং রক্ত হলেও তা মানুষের বা পশুর রক্ত কি না, কিংবা তা বিশেষ কোন মানুষের রক্ত কি না, এসব জানবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু একালের উন্নত বিজ্ঞান এসে পুলিসের অন্ধতা অনেকটা দূর করে দিয়েছে।

এই বিজ্ঞানের দিক দিয়ে হেমন্ত ছিল যথেষ্ট অগ্রসর। সে বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে এম. এস-সি পাশ করেছিল এবং এখনো নিয়মিতভাবেই বিজ্ঞানচর্চা করে। গোয়েন্দাগিরিতে বিজ্ঞানকে সে এমন কৌশলে কাজে লাগাতে পারে যে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আজ আমি যে কাহিনীটি বলতে বসেছি, পাঠকরা তার মধ্যেও হেমন্তের বৈজ্ঞানিক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির খানিকটা পরিচয় লাভ করবেন।

বাংলাদেশের অপরাধীদের সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহের জন্যে সে এখানকার পুলিসের বহু হোমরাচোমরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছে। যদিও কোন দেশেরই পুলিস বাইরের সখের গোয়েন্দাদের বিশেষ খুশির চোখে দেখে না, বরং তাদের মনে করে অকেজো উড়ো আপদের মতো। কিন্তু কলকাতা পুলিসের কোন কোন কর্মচারীর ব্যবহার দেখলে বেশ বোঝা যায়, হেমন্তের মতামতের উপরে

তাঁদের শ্রদ্ধার অভাব নেই।

এর কয়েকটি কারণও আছে। প্রথমত, হেমন্ত না ভেবে-চিন্তে যুক্তিহীন কোন কথাই বলে না। দ্বিতীয়ত, তার বক্তব্য সে অতি বিনীতভাবে প্রকাশ করে। পুলিসের লোকের সঙ্গে তার কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, গুরুর সামনে ছাত্র যেন নিজের মতামত নিবেদন করছে। কাজেই, তার কাছে সাহায্য চাইতে এলেও পুলিসের অহমিকা বা হামবড়াই ভাব আহত হয় না।

হেমন্ত খালি পুলিসের সঙ্গেই মেলামেশা করে না। এদেশের চোর, গাঁটকাটা, গুণ্ডা, খুনী ও দাগী পুরাতন পাপীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যে তার আগ্রহ এত বেশি যে, মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়, কোনদিন সে হয়তো সাংঘাতিক বিপদে পড়বে। মুসলমানের ছদ্মবেশ পরে প্রায়ই সে মেছোবাজারের ও শহরের অন্যান্য কুখ্যাত পাড়ার বস্তী এবং কফিখানায় ঢুকে অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। ফলে এমন অনেক বদমাইসের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে, যাদের রাস্তার আনাচে-কানাচে দেখলে ভদ্রলোকদের বুক ভয়ে না কেঁপে পারে না!

আমি যদি বলি, "হেমন্ত, ওদের সঙ্গে মিশতে তোমার ঘৃণা হয় না?"

হেমন্ত হেসে বলে, "না ভাই রবীন, মোটেই নয়। ডাক্তাররা ঘৃণা-ভরা মন নিয়ে যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের কাছে যান না। আমিও হচ্ছি আর-এক শ্রেণীর ডাক্তারের মতো আর অপরাধীদের মনে করি রোগীর মতো। সাধারণ রোগীদের দেহ হয় ব্যাধিগ্রস্ত, আর এ-ব্যাধি-আক্রমণ করে অপরাধীর দেহকে নয়, মনকে। চুরি, জুয়াচুরি, খুন, ডাকাতি মানসিক ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। ও-সব ব্যাধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হলে অপরাধীদের সঙ্গে ভাব না করলে চলে না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাজাহানের পাঞ্জা

হেমন্তের বাড়ির একতলায় পাশাপাশি দুইখানি হল-ঘর ছিল। তার একখানি হচ্ছে পরীক্ষাগার। সেখানে আছে একটি সুদীর্ঘ টেবিলের উপরে নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং দেওয়ালের তাকে তাকে সাজানো হরেকরকম তরল ও চূর্ণ রাসায়নিক পদার্থে-ভরা কাঁচের জার, শিশি ও বোতল।

আর-একখানি ঘর হচ্ছে একসঙ্গে তার বৈঠকখানা ও লাইব্রেরী। তার চারিদিকের দেওয়াল ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে বড়-ছোট, রোগামোটা কেতাব-ভরা আলমারি এবং মাঝখানে ধবধবে চাদর-বিছানো নরম বিছানা-ভরা চৌকি, চেয়ার, সোফা, কৌচ ছোট ছোট টেবিল প্রভৃতি।

সেদিন বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি কৌচে বসে হেমন্ত কোলে-পাতা একখানা বইয়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

চেয়ারে বসে পড়ে বললুম, "কি হে ভায়া, অত মন দিয়ে কি বই পড়া হচ্ছে?"

হেমন্ত মুখ তুলে বললে, "বই পড়ছি না ভাই, ছবি দেখছি! এখানা হচ্ছে 'ক্যালকাটা পুলিস জার্নাল'।"

—"পুলিস জার্নালের ছবি? তাহলে নিশ্চয়ই তোমার কোন স্যাঙাতের—অর্থাৎ চোর কি খুনীর চেহারা?"

—"না রবীন, তোমার রসিকতা মাঠেই মারা গেল। এ-ছবি দেখে আমি এক পৃথিবীবিখ্যাত অমর শিল্পীর কথা ভাবছি।"

—"কি সর্বনাশ! পুলিসের শনির দৃষ্টি আজকাল কি শিল্পীদেরও ওপরে গিয়ে পড়েছে?"

বৃষ্টি থামে রাতে নটার সময়। বাড়ির নিয়মমত রাত সাড়ে-দশটার সময় দারোয়ান এসে কালী বিশ্বাস লেনের দিকের দরজা বন্ধ করে দিয়ে যায়।

আজ সকালে দেখা যায়, মেঝের উপরে মতিবাবুর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে এবং ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরুবার সব দরজাই বন্ধ।

খবর পেয়ে আমি গিয়ে যা দেখলুম তা হচ্ছে এই ঃ

বিনোদলাল বালকের মতো অধীর হয়ে কাঁদছেন আর মিঃ দত্ত তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন।

মতিবাবুর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে ঠিক খাটের তলায়। তাঁর মুখের উপরে দারুণ যাতনা ও ভয়ের চিহ্ন—সেই সঙ্গে রয়েছে বিষম বিস্ময়েরও আভাস।

তাঁর গলার উপরে একটা নীল দাগ। বিছানার উপরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন। মতিবাবুর দেহের পাশে ছড়ানো রয়েছে একটা ভাঙ্গা কাঁচের গেলাসের ছোট-বড়ো টুকরো—কোন-কোন কাঁচ রক্তাক্ত।

আর-একটা আশ্চর্য জিনিসও পেয়েছি। খুব পুরু পশমের একটা দস্তানা!

ঘরের মেঝেতে কাদা-মাখা জুতোর দাগ আছে—তু-রকম জুতোর। কিন্তু কোন দাগ এত স্পষ্ট বা সম্পূর্ণ নয় যে, নিখুঁত মাপ বা ছাঁচ নেওয়া যেতে পারে। তবে তুজন লোক যে বৃষ্টির পরে এই ঘরের ভিতরে এসেছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ঘরের দরজার ঠিক বাইরেই যে একজন লোক দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল, তার একজোড়া জুতোর স্পষ্ট ছাপ দেখেই সেটা অনুমান করা যায়। তার খাঁজ-কাটা সোলের ছাপ দেখলে আরো বোঝা যায়, সে এসেছিল রবারের জুতো পরে। ঘরের মেঝেতেও এমনি রবারের জুতোর আংশিক ছাপ আছে। সুতরাং বুঝতে দেরি লাগে না যে, প্রথম একজন ঘরে ঢোকবার পরে সেও ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল। দরজার বাইরেকার এই রবারের জুতোর

ছাপ আমি নিয়েছি।

মতিবাবুর মৃতদেহ দেখলে মনে হয়, কেউ বা কারা গলা টিপে তাঁকে মেরে ফেলেছে।

তাঁর লোহার সিন্দুক খোলা, মতিবাবুর নিজের চাবি দিয়েই সেটা খোলা হয়েছে। ভিতর থেকে কেবল আশি হাজার টাকার নোটই অদৃশ্য হয় নি। মতিবাবুর টাকা খাটানোর ঝোঁকও ছিল। হ্যাণ্ডনোটেও তিনি টাকা ধার দিতেন। সিন্দুকের ভিতরে কতকগুলো হ্যাণ্ডনোটও ছিল, সেগুলোও আর নেই। আর পাওয়া যাচ্ছে না মতিবাবুর পকেট-বইখানা। তাঁর রোজ ডায়ারি লেখার অভ্যাস ছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হত্যাকারী কে?

খুনী যে বাহির থেকে আসে নি তার প্রমাণ হচ্ছে, প্রথমত, বাড়ির সব বাইরের দরজাই ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। দ্বিতীয়ত, বারান্দায় ম্যাস্টিফ-কুকুরটা কোন সাড়াশব্দ দেয় নি—তার মানে, খুনী তার অচেনা নয়।

বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কথা ছেড়ে দি। পুরুষ-আত্মীয় আছে মোট চারজন। বিনোদলাল, একজন প্রায় সত্তর বছরের বুড়ো, একজন বাতে-পঙ্গু লোক, আর একটি পনেরো বছরের ছোকরা। বাকি সবাই চাকর-দ্বারবান প্রভৃতি। যদি ধরা যায়, টাকার লোভে তারা মনিবকে খুন করেছে, তাহলেও একটা প্রশ্ন জাগে। খুনীদের পায়ে জুতো ছিল, চাকর-দ্বারবানরা বাড়ির ভিতরে জুতো পরে না, পরলেও চুপি চুপি কাজ সারবার জন্যে তারা খালি-পায়েই আসত। তারা ডায়ারি চুরি করত না, আর দস্তানাও পরত না।

বাড়ির ভিতর মতিবাবুর মৃত্যুতে লাভবান হবেন কেবল বিনোদ-লালই। খুনের দিনই তাঁর সঙ্গে মতিবাবুর ঝগড়া হয়েছিল এবং তাঁর মামা তাঁকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন বলে শাসিয়েছিলেন। তাঁর অনেক টাকা ধার, নগদ টাকার বিশেষ দরকার। তাঁকে অনায়াসে সন্দেহ করা যায়। হয়তো তাঁর আহ্বানেই মতিবাবু নিজে ভিতর থেকে

দরজা খুলে দিয়েছিলেন। কুকুর তাঁকে চেনে, তাই চ্যাঁচায় নি।

কিন্তু ঘটনাস্থলে খুনীর একজন সঙ্গীও হাজির ছিল। সে লোকটি কে? সমস্ত বাড়ি খুঁজে দেখেছি, রবারের জুতোর সঙ্গে কারুর মাপ মেলে না। রবারের জুতোও বাড়ির কারুর নেই।

হেমন্তবাবু, এই পর্যন্ত আমার কথা। এখন আপনি যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান, করুন। মিঃ দত্তকে সঙ্গে করে এনেছি, তিনি অনেক বিষয়ে আপনার সন্দেহভঞ্জন করতে পারেন, কারণ তিনি হচ্ছেন মতিবাবুর পুরানো বন্ধু।"

হেমন্ত চোখ খুলে বললে, "লাস কি শব-ব্যবচ্ছেদাগারে চালান করে দিয়েছেন?"

—"না। ইচ্ছে করলে এখনো ঘটনাস্থলেই লাস দেখতে পারেন।"

হেমন্ত গাত্রোত্থান করে বললে, "হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো। রবীন তুমি এস।

আমি হচ্ছি সাহিত্যিক মানুষ। লাস-ফাস দেখলে আমার প্রাণ হাঁসফাঁস করে, নাড়ি ছাড়ি ছাড়ি! তবু হেমন্তের কথা এড়াতে পারলুম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘটনাস্থলে

আমরা কালী বিশ্বাস লেন দিয়ে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করলুম।

হেমন্ত আগে সমস্ত বাড়িখানা ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে দেখলে। তারপর মতিবাবুর শয়ন-গৃহের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রবারের জুতোর ছাপটা লক্ষ্য করলে। মাস্টিফ-কুকুরটা আমাদের দেখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এবং মাঝে মাঝে গর্জন করতে লাগল।

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলুম মতিবাবুর মৃতদেহটা।

হেমন্ত লাসের পাশে বসে পড়ে বললে "মিঃ দত্ত, আপনি তো ডাক্তার। আপনার কি বিশ্বাস? মতিবাবুকে কেউ কি গলা টিপে মেরে ফেলেছে?"

—"তাছাড়া আর কি বলি বলুন?"

—"তাহলে ওঁর গলার ওপরে ঐ নীল দাগটা কিসের? ওটা তো আঙুলের দাগ নয়। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন ওটা কোন স্বচ্ছ ব্যাণ্ডেজ! আঙুলের দাগ ও-রকম হয় না।"

—"আমার বোধহয়, আঙুলের দাগ মিলিয়ে গিয়েছে। ওটা কালশিরার দাগ।"

—"সম্ভব। শব-ব্যবচ্ছেদ হবার পরেই টের পাওয়া যাবে। আচ্ছা সতীশবাবু, বাংলাদেশেও শীতকালে কোন বাঙালী হাতে দস্তানা পরে নাকি?"

সতীশবাবু বললেন, "আমি তো জানি, পরে না। অন্তত এ-বাড়ির কেউ কোনদিন দস্তানা ব্যবহার করে নি বলেই জেনেছি।"

মেঝে থেকে দস্তানাটা তুলে নিয়ে হেমন্ত বললে, "অতিরিক্ত পুরু সাদা পশমের দস্তানা। এর ওপরেও রক্তের দাগ রয়েছে। হুঁ, গেলাস ভাঙা কাঁচে দস্তানার খানিকটা কেটে গিয়েছে দেখছি। কাঁচের গেলাসটাও ভাঙা, গেলাসের টুকরোর ওপরে রক্তের দাগ, আশ্চর্য!"

সতীশবাবু বললেন, "কেন, আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন কি কারণে?"

হেমন্ত আগে লাসটাকে একটু তুলে তার তলাটা পরীক্ষা করলে। তারপর বিছানার দিকে তাকিয়ে বললে, "এ কাঁচের গেলাসটা কি মতিবাবুর?"

—"হ্যাঁ, ঘরে ঐ কোণে গেলাসটা কুঁজোর মুখে বসানো থাকত। দেখুন না, কুঁজোর মুখ এখন আদুড়।"

—বিছানার ওপরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন দেখে বোঝা যাচ্ছে, খুনীদের সঙ্গে মতিবাবু কিছুক্ষণ যুঝেছিলেন। ঘরের আর কোথাও ধস্তাধস্তির

কাপ-দুয়েক চা আন রে!"

সতীশবাবু ও মিঃ দত্ত আসন গ্রহণ করলেন।

এখানে সতীশবাবুর একটুখানি পরিচয় দরকার। সতীশবাবু হচ্ছেন কলকাতা পুলিসের একজন নামকরা ইনস্পেক্টার এবং হেমন্তের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিণত হয়েছে রীতিমত বন্ধুত্বে। তিনি প্রায়ই এখানে আসেন এবং অপরাধতত্ত্ব নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করে যান। অনেক সাধারণ পুলিসের লোকের মতো নিজেকে তিনি একজন সবজান্তা ও মস্ত-বড় মনুষ্য-রত্ন বলে বিবেচনা করেন না। কোন জটিল মামলা হাতে পেলে, হেমন্তের সঙ্গে পরামর্শ করতে কুণ্ঠিত হন না একটুও।

চায়ের বারকোস হাতে করে মধু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল।

সতীশবাবু বললেন, "হেমন্তবাবু, লিপটনের 'গ্রীন-লেবেল' চায়ের লোভে আজ আমি এখানে আসি নি। আমি মহাসমস্যায় পড়েছি, তাই এসেছি আপনার কাছে সুপরামর্শ নিতে।"

হেমন্ত হাসিমুখে বললে "সুপরামর্শ দেওয়া আর দাবা-বোড়ের ওপর-চাল দেওয়া, দুই-ই খুব সহজ। সুতরাং সুপরামর্শ চেয়ে আপনাকে হতাশ হতে হবে না!"

সতীশবাবু চায়ের একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে বললেন, "না হেমন্ত-বাবু, ব্যাপারটাকে আপনি হালকাভাবে নেবেন না। আমার থানার এলাকায় শহরের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি খুন হয়েছেন আর চুরি গিয়েছে আশী হাজার টাকা।"

হেমন্ত সোজা হয়ে বসে বললে, "কে খুন হয়েছে আর কার টাকা চুরি গিয়েছে?"

—"হত ব্যক্তির নাম মতিলাল মুখোপাধ্যায়। টাকা চুরি গেছে তাঁরই।"

—"হ্যাঁ, ও-নাম আমি শুনেছি বটে। তিনি তো যদুগোপাল বসু স্ট্রীটে থাকতেন?"

—"হ্যাঁ। খুনী ধরা পড়ে নি।"

—"কোন্ সূত্র পাওয়া যায় নি ?"

—"সূত্রও পেয়েছি কিছু কিছু, কিন্তু এত এলোমেলো যে, কাজে লাগাতে পারছি না। সন্দেহ করবার মতো লোকও পেয়েছি, তবু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।"

হেমন্ত আবার কৌচের উপর পা তুলে কুশনের উপরে হেলে পড়ল। তারপর দুই চোখ মুদে ফেলে বললে, "তাহলে আগে সব কথা শুনি। মিঃ দত্ত, চোখ মুদেছি বলে ভাববেন না, আমি ঘুমোবার ফিকিরে আছি। সতীশবাবু আমার অভ্যাস জানেন, চোখ মুদলে আমার শোনবার আর চিন্তা করবার শক্তি দ্বিগুণ হয়ে ওঠে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হত্যাকাহিনী

সতীশবাবু বলতে লাগলেন :

"মতিলাল মুখোপাধ্যায় খুব ধনী লোক। ব্যাঙ্কে তাঁর প্রচুর টাকা জমা আছে, তাছাড়া, কলকাতায় তাঁর বড় বড় বাড়িও আছে অনেকগুলো।

তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। তিনি নিঃসন্তান। বছর-দুই আগে তাঁর স্ত্রীরও মৃত্যু হয়েছে। মতিবাবুর এক ভাগ্নে আছেন, তাঁর নাম বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে মতিবাবুর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, ইদানিং তিনি 'ক্রণিক' অজীর্ণ-রোগে ভুগছিলেন। তাঁর পারিবারিক-চিকিৎসক হচ্ছেন ডাক্তার এ. দত্ত—যিনি আমার সঙ্গে এসেছেন। মিঃ দত্ত কেবল মতিবাবুর চিকিৎসক নন, তাঁর বিশেষ বন্ধুও। মতিবাবু লোকের সঙ্গে

মেলামেশা করতে মোটেই ভালবাসতেন না, এত ধনী হয়েও তাঁর বন্ধুর সংখ্যা তিন-চার জনের বেশি নয়। ওদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন মিঃ দত্ত। কোন কোন দরকারী বিষয় নিয়ে পরামর্শের দরকার হলে মতিবাবু আগে মিঃ দত্তকে আহ্বান করতেন।

প্রাচীন বয়সে স্ত্রীর শোকেই হোক বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের জন্যই হোক, কিছুকাল থেকে মতিবাবুকে নানারকম বাতিকে ধরেছিল।

কলকাতার বাড়িগুলো তিনি একে একে বিক্রি করে ফেলেছিলেন। সেই বাড়ি-বিক্রির টাকা দিয়ে কিনে রাখছিলেন কোম্পানীর কাগজ।

গতকল্য বৈকালেও একখানা বাড়ি বিক্রি করে তিনি আশি হাজার টাকা এনে নিজের শোবার ঘরের সিন্দুকের ভিতরে পুরে রেখে-ছিলেন। হাজার টাকার আশিখানা নোট।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই মতিবাবুর আর এক খেয়াল হয়েছিল। কিন্তু সেটা বলবার আগে তাঁর বাড়ির কিছু বর্ণনার দরকার।

মতিবাবুর বসত-বাড়িখানা মস্ত-বড়—তার তিনটে মহল। প্রথম—অর্থাৎ সদর-মহলটা যদুগোপাল বসু স্ট্রীটের উপরেই। সর্বশেষের তৃতীয় মহলের পিছনে আছে কালী বিশ্বাস লেন। সেদিকেও একটা দরজা আছে।

এখন তাঁর খেয়ালের কথা বলি। মতিবাবু আগে থাকতেন প্রথম মহলে, কিন্তু স্ত্রীর পরলোকগমনের পর থেকেই বড়-রাস্তার ধার ছেড়ে তৃতীয় মহলে এসে বাস করতেন। তিনি অন্য কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন না, যে তিন-চার জন বিশেষ বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন, তাঁরা আসতেন ঐ কালী বিশ্বাস লেন দিয়ে, তৃতীয় মহলে। এদিকেও আলাদা একটা সিঁড়ি আছে।

তৃতীয় মহলে ঢোকবার নিচেকার দরজায় কোন দ্বারবান থাকে না। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই মতিবাবুর ঘরের সামনে যে বারান্দা বা দালান পাওয়া যায়, সেখানে দিনরাত বাঁধা থাকে প্রকাণ্ড এক মাস্টিফ কুকুর। তাকে এড়িয়ে মতিবাবুর ঘরে ঢোকবার উপায় নেই। সে কেবল

কামড়ায় না, অচেনা লোক দেখলেই বিষম চেঁচিয়ে পাড়া জাগিয়ে তোলে।

বাড়ির প্রথম দুই মহলে বাস করেন মতিবাবুর ভাগিনেয় বিনোদলাল ও অন্যান্য কয়জন নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়—তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক।

মাতুলের সম্পত্তির অল্পবিস্তর তত্ত্বাবধান ছাড়া বিনোদবাবু আর কোন কাজ করেন না। তবে আমি খবর নিয়ে জেনেছি যে, বিনোদবাবুর ঘোড়দৌড়ের নেশা আছে যথেষ্ট, এবং গোপনে এই নেশায় মেতে তিনি অনেক টাকা নষ্ট করেছেন, ফলে বাজারে তাঁর ধারও সামান্য নয়।

তাঁর মাতুল এ-সব কথা জানতেন না, কিন্তু কথাগুলো জানতে পারেন আমাদের এই মিঃ দত্ত। তিনি এ-পরিবারের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, কাজেই সব জেনে-শুনেও চুপ করে থাকতে পারলেন না, মতিবাবুর কানে সব কথা তোলেন।

শুনেই তো মতিবাবু মহা খাপ্পা!—একেই তো তিনি বেজায় কড়া লোক, তার উপরে জীবনে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন যারা 'রেস' বা জুয়া খেলে তাদের। তখনি বিনোদলালের তলব হল। মামার কাছ থেকে বিষম বকুনি ও গালাগালি খেয়ে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, তিনি মতিবাবুকে দু-এক কথা শুনিয়ে দিলেন। মতিবাবু রেগে অজ্ঞান হয়ে চিৎকার করে বললেন, "জুয়াড়ীকে আমি আমার সম্পত্তির এক পয়সাও দেব না! আমি নতুন উইল করব।"

এই ব্যাপারটা হয়ে গেল কাল দুপুর-বেলায়। তারপর মতিবাবু বেরিয়ে অ্যাটর্নি-বাড়িতে যান। সেখান থেকে আশি হাজার টাকা নিয়ে বৈকালে ফিরে আসেন।

সন্ধ্যার পর তাঁর শরীর কিছু খারাপ হয়। তিনি একটু সকাল-সকালই বিছানায় আশ্রয় নেন এবং শোবার আগে নিজের হাতে ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেন। আপনারা জানেন, কাল সন্ধ্যায় অকাল-বর্ষা নেমেছিল। বৃষ্টি হয় ঘণ্টাখানেক ধরে।

চিহ্ন নেই। ধরুন, খুনীরা মতিবাবুর গলা টিপে ধরেছে, মতিবাবু ঝটাপটি করতে করতে মেঝের ওপরে এসে কাবু হয়ে পড়লেন—কিন্তু গেলাসটা ভেঙেছিল তার আগেই, কারণ লাসের পিঠের তলাতেও ভাঙা কাঁচ রয়েছে।...কিন্তু গেলাসটা ভাঙল কেন? আর গেলাসের কাঁচে খুনীর হাতই-বা কাটল কেন? গেলাসটা তো আর হঠাৎ জ্যান্তো হয়ে পাখির মতো পক্ষ বিস্তার করে কুঁজোর মুখ ছেড়ে খুনীদের আক্রমণ করতে আসে নি? যদি বলি, ধস্তাধস্তির সময়ে খুনীদের কারুর হাতে গেলাসটা ছিল, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে, গলা-টেপার সঙ্গে কাঁচের গেলাসের সম্পর্ক কি?"

সতীশবাবু প্রশংসা-ভরা কণ্ঠে বললেন, "ঠিক। হেমন্তবাবু, আপনি একটা মস্ত-বড় সূত্র আবিষ্কার করেছেন! এ কথা তো এতক্ষণ আমি ভেবে দেখি নি!"

হেমন্ত বললে, "গেলাসের নিচের দিকটা এখনো অটুট আছে দেখছি। কিন্তু ওর ভিতরটা একেবারে শুকনো। তবু ওটাকে একবার পুলিসের পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। হয়তো ওর মধ্যে কোন বিষয়ের অস্তিত্ব আছে। ওর গায়ে খুনীর আঙুলের ছাপও থাকা সম্ভব।"

সতীশবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সেটা আমিও আগে-থাকতেই স্থির করেছি।"

—"আর, এই দস্তানাটা কি আমাকে আজকের মতো ধার দিতে পারেন?"

—"তা নিন না। কিন্তু কেন?"

—"আমি দস্তানাটার রক্ত পরীক্ষা করব?"

মিঃ দত্ত কৌতূহলী স্বরে বললেন, "তাতে কোন লাভ হবে নাকি?"

—"হবে বৈকি, মিঃ দত্ত। আপনি ডাক্তার, এটা নিশ্চয়ই জানেন যে, medico legal মতানুসারে মানুষের দেহের রক্ত মাত্র চার গ্রুপে বিভক্ত করা যায়। আপাততঃ আমি পরখ করে দেখতে চাই, দস্তানার রক্ত কোন গ্রুপে বা শ্রেণীতে পড়ে। তাহলে খুনী গ্রেপ্তার হলে অনেকটা নিশ্চিন্ত বলা যেতে পারবে, এ রক্ত তারই দেহ থেকে বেরিয়েছে কিনা।"

মিঃ দত্ত বললেন, "হেমন্তবাবু, আমি জানতুম না যে, এদেশে গোয়েন্দার কাজে কেউ এমন বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। আপনি অবাক করলেন দেখছি। আজ বড় দুঃসময়ে আপনার সঙ্গে দেখা হল, নইলে আরো ভালো করে আলাপ করতুম।"

হেমন্ত বিনীতভাবে বললে, "আমি খুব রঙীন ফানুষ নই মিঃ দত্ত, দয়া করে আমাকে এত-বেশি আকাশে তুলবেন না। আর আমার সঙ্গে যদি ভাল করে আলাপ করতে চান, তাহলে অধীন সর্বদাই আপনার দ্বারদেশে হাজির থাকতে রাজি আছে।"

মিঃ দত্ত হেমন্তের একখানা হাত ধরে বললেন, "দ্বারদেশে নয় হেমন্তবাবু, একেবারে আমার দোতলার ড্রইংরুমে আপনাকে তুলে নিয়ে যেতে চাই। কাল বৈকালেই আমার ওখানে আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল। কেমন, রাজি তো?"

—"এ আমার সৌভাগ্য। কিন্তু আপনার ঠিকানা তো আমি জানি না!"

—"দশ নম্বর পরেশ মিত্র লেন। এখান থেকে ছ-সাত মিনিটের পথ।"

সতীশবাবু বললেন, "মিঃ দত্ত বেশ লোক যা হোক! আমরা পড়লুম বাদ! এক যাত্রায় পৃথক ফল।"

মিঃ দত্ত বললেন, "নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয়! আপনিও যাবেন, রবীনবাবুও যাবেন!"

আমার কিন্তু গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। সামনে পড়ে রয়েছে একটা খুন-করা মানুষের মৃতদেহ, বাড়ির ভিতর থেকে আসছে আত্মীয়দের বুক-চাপা কান্না—এইখানে দাঁড়িয়ে কিনা নিমন্ত্রণের কথা! তারপরেই বুঝলুম, মিঃ দত্ত হচ্ছেন ডাক্তার—মড়া কেটে কেটে আর লোকের মৃত্যু দেখে দেখে তাঁর মন হয়ে গেছে কঠিন; এবং সতীশবাবু হচ্ছেন, পুলিসের পুরানো লোক—জীবনে বহু নিহত মানুষের ভয়াবহ দেহ ঘেঁটে ঘেঁটে এসব দৃশ্য তাঁর চোখে হয়ে গেছে নেহাৎ সহজ, সুতরাং তাঁরও মনের বিকার না হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন শ্মশানের মুদ্দোফরাসরা

—মৃতদেহ ভস্মসাৎ হলে পর তাদের তো চিতার আগুনেই হাঁড়ি চড়িয়ে ভাত রাঁধতে দেখা যায়।

মিঃ দত্ত নিজের হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে ব্যস্ত হয়ে বললেন, "সাড়ে আটটা বাজল! সতীশবাবু, আর তো আমার থাকবার উপায় নেই—নটার ভেতরেই আমাকে এক রোগীর বাড়ি যেতে হবে। হেমন্তবাবু, আমাকে কি আর আপনার দরকার আছে?"

হেমন্ত বললে, "না মিঃ দত্ত, আপনি অনায়াসেই যেতে পারেন।"

মিঃ দত্ত প্রস্থান করলেন। হেমন্ত খানিকক্ষণ লোহার সিন্দুকটা পরীক্ষা করলে। তারপরে বললে, "সতীশবাবু, এর চাবি কোথায়?"

—"চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় খুনীর কাছে আছে। এক-গোছা চাবি। বাড়ির ভেতরের লোকই যে এই খুনের সঙ্গে জড়িত আছে, এও তার আর-একটা প্রমাণ। বাইরের খুনী চাবি নিয়ে যাবে কেন? যে চাবি নিয়ে গেছে, নিশ্চয় তার আরো কোন বদমতলব আছে।"

হেমন্ত কিছু বললে না। নীরবে ঘরের মেঝের একদিকে তাকিয়ে বসে রইল। তারপর উঠে এগিয়ে গিয়ে মেঝের উপর থেকে এক টুকরো শুকনো কাদার মতন কি কুড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ সেটা পরীক্ষা করে বললে, "সতীশবাবু, বলুন দেখি এটা কি?"

—"এক টুকরো শুকনো কাদা।"

—"হুঁ। ভিজে পথ দিয়ে হাঁটবার সময়ে খুনীদের কারুর জুতোর গোড়ালি আর 'সোলের' খাঁজে এই কাদাটা লেগে গিয়েছিল। তারপর মতিবাবুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করবার সময়ে কাদার টুকরোটা গোড়ালি আর 'সোলে'র খাঁজ থেকে খসে পড়েছে।"

আমি বললুম, "তুমি কি করে জানলে যে, ওটা আমাদেরই কারুর জুতো থেকে খসে পড়ে নি?"

—"দুটি কারণে। প্রথমত, আজ সকাল থেকে শহরের পথ-ঘাট শুকনো খটখটে! এ-ঘরে যারা ঢুকেছে তাদের কারুকেই কর্দমাক্ত পথ দিয়ে হাঁটতে হয় নি। দ্বিতীয়ত, আমি খালি-চোখেই যতদূর দেখছি,

এই কাদার ভেতরে কিঞ্চিৎ নতুনত্ব আছে।"

সতীশবাবু বললেন, খুনীদের একজনের পায়ে ছিল রবারের জুতো। তার গোড়ালি সমতল, সুতরাং এ-রকম কাদার তাল জমবার উপায় নেই।"

—"ঠিক! অতএব এটি সংলগ্ন ছিল অন্য খুনীর জুতোর সঙ্গে। একে আমি এখন সযত্নে পকেটস্থ করলুম, বাড়িতে গিয়ে অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করব।...সতীশবাবু, একবার বিনোদলালের সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা হবে কি?"

—"নিশ্চয়ই হবে!" সতীশবাবুর হুকুমে তখনি একজন লোক বিনোদলালকে খবর দিতে গেল।

খানিক পরে একটি যুবক ভীত হরিণের মতো চারিদিকে তাকাতে তাকাতে অত্যন্ত জড়োসড়ো হয়ে ঘরের ভিতর এসে ঢুকল। ফর্সা রং, ছিপছিপে দেহ, মুখ-চোখ সুন্দর। যুবকটি যে খুব সৌখীন, দেখলেই তা বোঝা যায়। কিন্তু তার মাথার কেয়ারি-করা চুল আজ স্নান ও চিরুণির অভাবে এলোমেলো, চাকচিক্যহীন। পরোনে দামী রেশমী জামা ও মিহি দেশী কাপড়, কিন্তু সেগুলোও মলিন পারিপাট্যহীন। তার চোখ ফোলা ফোলা, দুই গালেও শুকনো অশ্রুর দাগ।—যেন বিয়োগান্ত নাটকের শেষ-দৃশ্যের 'হিরো'!

হেমন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবকের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল—অনেকক্ষণ ধরে। তার চোখদুটো দেখলে মনে হয়, তারা যেন যুবকের মনের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে চাইছে!

সেই তীব্র দৃষ্টি সইতে না পেরে যুবক মাথা নামিয়ে ঘরের মেঝের দিকে নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। তারপর কম্পিতস্বরে বললে "আপনারা কি আমায় ডেকেছেন?"

হেমন্ত বললে, "আপনার নাম কি?" তার স্বরের কঠোরতা দেখে বিস্মিত হলুম।

—"শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।"

—"কাল সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আপনি কি করেছেন ?"

—"কাল সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত আমি থিয়েটারে ছিলুম।"

—"বাড়ি ফিরেছেন কখন ?"

—"রাত দেড়টার সময়ে।"

—"মোটরে করে এসেছিলেন ?"

—"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

—"কোন থিয়েটারে গিয়েছিলেন ?"

—"নাট্য-নিকেতনে।"

—"কোন দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছেন ?"

—"সদর দরজা দিয়ে।"

—"দরজা বন্ধ ছিল ?"

—"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

—"কে খুলে দিয়েছিল ?"

—"দরোয়ান।"

—"কোন জামা পরে থিয়েটারে গিয়েছিলেন ?"

—"যে জামাটা পরে আছি।"

—"থিয়েটার থেকে আপনি সোজা বাড়িতে এসেছিলেন ?"

একটু ইতস্তত করে যুবক বললে, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

হেমন্ত ধমকে বলে উঠল, "মিথ্যে কথা!"

—"আজ্ঞে—"

—"চুপ! থিয়েটার থেকে আপনি বন্ধুবান্ধব নিয়ে হোটেলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে খাবার খেয়েছেন, নেশা করেছেন। আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করবেন না!"

বিনোদলালের মুখ হয়ে গেল মড়ার মতো হলদে এবং তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল থর-থর করে।

হেমন্তের কণ্ঠস্বর হঠাৎ আবার অত্যন্ত কোমল হয়ে পড়ল! ধীরে

ধীরে সে বললে, "বিনোদবাবু, ভবিষ্যতে আর কখনো মদ খাবেন না। মদ হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু—মানুষকে সে যে-কোন মুহূর্তে নরকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। লক্ষ্য করলে দেখবেন, কোন পশুও মদ খায় না—কারণ সেটা স্বাভাবিক পানীয় নয়। যে-জিনিশে পশুর রুচি নেই, মানুষ যদি তা খায় তাহলে তাকে কি পশুরও অধম বলব না? আর একটা কথা মনে রাখবেন। কোন ভদ্রলোকেরই মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়। মদ খাওয়া যে পাপ আপনিও তা জানেন। তাই সে পাপ লুকোবার জন্যেই মিথ্যে কথা বলেছিলেন। যে-পাপ ভদ্রলোককে মিথ্যে বলতে বাধ্য করে, তার চেয়ে হীন আর কিছুই নেই। এখন আপনি যান, আমি আর কিছু জানতে চাই না।"

দারুণ আতঙ্কে একবার হেমন্তের মুখের দিকে তাকিয়েই বিনোদলাল তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সতীশবাবু বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন, "হেমন্তবাবু! আপনি যে বিনোদকে চিনতেন এ-কথা তো একবারও আমাকে বলেন নি?"

হেমন্ত বললে, "চিনতুম মানে? আজ আমি এই প্রথম বিনোদকে দেখলুম, আজ সকালেও এর নাম পর্যন্ত জানতুম না।"

প্রায় হতভম্বের মতো মুখ করে সতীশবাবু বললেন, "তবে আপনি কেমন করে বিনোদের এত গুপ্তকথা জানলেন?"

—"খুব সহজেই! ইচ্ছে, বা চেষ্টা করলে আপনিও জানতে পারতেন! বিনোদ যখন বললে যে, 'নাট্য-নিকেতন' থেকে মোটরে রাত বারোটার সময় বেরিয়ে বাড়ি ফিরেছে দেড়টার সময়ে, তখনি বুঝলুম সে সোজা বাড়িতে আসে নি। কারণ, 'নাট্য-নিকেতনে'র দূরত্ব এখান থেকে এক মাইলের বেশি নয়। মনে প্রশ্ন উঠল, এই দেড় ঘণ্টা সময় সে কোথায় কাটিয়েছে? লক্ষ্য করে দেখলুম, তার জামার হাতায় তরকারির হলদে দাগ। জামায় পানেরও ছোপ রয়েছে, জায়গায় জায়গায় পোড়া দাগ। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, কাল তার গায়ে ছিল এই জামাটাই। তরকারির

দাগ দেখে অনুমান করলুম, থিয়েটার থেকে বাড়িতে আসবার আগে সে কোন হোটেলে গিয়েছিল। কারণ, সাধারণত থিয়েটার দেখে অত রাত্রে কেউ অন্য কোথাও নিমন্ত্রণ রাখতে যায় না। তারপর চিন্তা করে দেখলুম, সিগারেটের আগুনের ফিনকি লেগে জামার নানা জায়গা পুড়ে যাওয়া, তরকারির দাগ আর পানের ছোপ লাগা—এ-সব হচ্ছে অজ্ঞানতা আর অসাবধানতার লক্ষণ। নেশা না করলে কেউ এমন বেহুঁস হতে পারে না। সেইজন্যেই আন্দাজে বিনোদকে ঐসব প্রশ্ন করেছি!"

সতীশবাবু বললেন, "অদ্ভুত আপনার তীক্ষ্ণদৃষ্টি! বিনোদকে দেখেই তার আসল চরিত্র আবিষ্কার করে ফেললেন! কিন্তু কাল রাত দশটা পর্যন্ত বিনোদ কি করেছে, এ-কথা আপনি জানতে চাইলেন কেন?"

হেমন্ত সহাস্যে বললে, "এ জিজ্ঞাসার জবাব দেবার সময় এখনো হয় নি, আমাকে দয়া করে মাপ করবেন!"

সতীশবাবু অনেকটা যেন নিজের মনে মনেই মৃদুস্বরে বললেন, "হুঁ, বিনোদ খালি জুয়াই খেলে না, নেশাও করে! হয়তো তার আরও গুণ আছে!"

হেমন্ত বললে, "আচ্ছা, সতীশবাবু, বিনোদ কাল কখন বাড়িতে ফিরেছে, দরোয়ানের কাছে সে খোঁজ নিয়েছেন কি?"

—"নিয়েছি। রাত দেড়টার সময়েই।"

—"উত্তম। আর আমার কিছু দেখবার শোনবার নেই। নমস্কার—"

সতীশবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, "এখনি যাবেন? কোন সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছেন কি?"

হেমন্ত বললে, "এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা আমার পক্ষে উচিত নয়। তবে এইটুকু জেনে রাখুন, ঘনীভূত অন্ধকারের ভেতরে আমি দু-একটি আলোক-রেখা দেখতে পেয়েছি বটে! চল রবীন, পলায়ন করা যাক।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কলকাতায় বিলাতী 'ফগ'

রাস্তায় বেরিয়ে দেখলুম, আজ শহরের এ কী অবস্থা!

চারিদিক ঢাকা পড়ে গিয়েছে যেন কুয়াশার ঘেরাটোপে! কলকাতায় যে এমন কুয়াশা হতে পারে, কখনো কল্পনা করি নি।

মুখ তুললে বোঝা যায় না, মাথার উপরে লক্ষ তারার চুমকী বসানো নীলাকাশ বলে কোন-কিছুর অস্তিত্ব আছে। এদিকে-ওদিকে যেদিকে তাকাই—সমস্ত দৃশ্য যেন লুপ্ত হয়ে গেছে পুরু ধোঁয়া আর ধোঁয়ার জঠরে। যেখানে যেখানে গ্যাস-পোস্ট আছে, সেখানকার কুয়াশা কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে মাত্র, আলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। মাঝে-মাঝে পদ-শব্দ শোনা যাচ্ছে কিন্তু পথিকরা অদৃশ্য।

হেমন্ত বললে, "ও রবীন, এ হল কি হে! লণ্ডনের বিখ্যাত বিলাতী 'ফগ' কি আমাদের দেশের প্রধান শহরে বেড়াতে এসেছে?"

হেমন্ত রয়েছে আমার কাছ থেকে মাত্র এক হাত তফাতে, কিন্তু তাকেও দেখাচ্ছে যেন আবছায়ার মতো!

একে মতিবাবুর বাড়ির পিছন-দিককার এই সরু গলিটা সাধারণতই নির্জন, তার উপরে শীতার্ত রাত, এই ভয়াবহ কুজ্ঝটিকা! মনে হচ্ছে, আমরা চলেছি নিস্তব্ধ এক অন্ধকার-রাজ্যের ভিতর দিয়ে অন্ধের মতো!

পিছনে আবার একাধিক অদৃশ্য জুতোর শব্দ হল।

আমি সাড়া দিয়ে বললুম, "কে আসে—সাবধান আমাদের দেহের ওপরে হোঁচট খাবেন না!"

পর-মুহূর্তেই মাথার ওপরে অনুভব করলুম প্রচণ্ড এক আঘাত এবং চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়ল রাশি রাশি সমুজ্জ্বল সর্ষে-ফুল এবং তার

পরেই হারিয়ে ফেললুম জ্ঞান।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলুম জানি না। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শুনলুম হেমন্তের কণ্ঠস্বর—"রবীন, রবীন!"

—"অ্যাঁ? কি বলছ? উঃ!"

—"উঠে বোসো।"

হেমন্ত আমাকে ধরে তুলে বসিয়ে বললে, "তোমার মাথা ফেটে গেছে। এখনি ব্যাণ্ডেজ করা দরকার। তাড়াতাড়ি আমার বাড়িতে যেতে পারবে?"

—"বোধহয় পারব। কিন্তু কে আমাকে আক্রমণ করলে?"

—"এখন কোন কথা নয়, আগে বাড়িতে চল।"

…নিজের বাড়িতে ফিরে হেমন্ত আমার ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে বললে, "বড় বেঁচে গিয়েছ রবীন, আর-একটু হলেই আঘাতটা মারাত্মক হয়ে উঠত।" সে তাড়াতাড়ি জল দিয়ে ক্ষতস্থানটা ধুয়ে ঔষধ প্রয়োগ করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বসল।

—"কিন্তু হেমন্ত, হঠাৎ আমার ওপরে গুণ্ডার আক্রমণ কেন?"

—"গুণ্ডা নয় রবীন, হত্যাকারী!"

—"হত্যাকারী?"

—"হ্যাঁ। এ হচ্ছে, মতিবাবুর হত্যাকারীর কীর্তি। খালি তোমাকে নয়, আমাকেও আক্রমণ করেছিল।"

—"তুমি তাদের দেখতে পেয়েছ?"

—"আবছায়ার মতো দেখেছি। দেখলেও চিনতে পারতুম না, তারা মুখোশ পরে এসেছিল।"

—"কিন্তু, কেন?"

—"তারা আমার পকেট থেকে সেই দস্তানাটা চুরি করে পালিয়েছে।"

বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলুম। তারপর বললুম, "আমার সন্দেহ হচ্ছে, বিনোদের ওপরে। নিশ্চয় সে পাশের ঘরে লুকিয়ে বসে দস্তানা

সম্বন্ধে তোমার মতামত শুনেছে।"

—"তারপর তার কোন অনুচরের সঙ্গে আমাদের পিছু নিয়েছে।"

—"হুঁ। আজকের বিদঘুটে কুয়াশা তার পক্ষে একটা মস্ত সুযোগ।"

—"দুর্যোগও হতে পারে রবীন।"

—"দুর্যোগ?"

—"হ্যাঁ, খানিকটা তাই বৈকি!"

—"মানে?"

—"এই দেখ।" হেমন্ত হাসতে হাসতে পকেট থেকে একখানা পকেট-বুক বার করে সামনের টেবিলের উপরে রাখলে!

—"পকেট-বুক!"

—"হ্যাঁ।" পকেট-বুকখানা খুলে দু-একপাতা উলটে সে একটু বিস্মিত স্বরে বললে, "না, যা ভেবেছিলুম তা তো নয়।"

—"কি তুমি ভেবেছিলে?"

—"ভেবেছিলুম, এর মধ্যে দস্তানা-চোরের নামধাম গুপ্তকথা পাব। এখন দেখছি এখানা হচ্ছে, মতিবাবুর ডায়ারি!"

—"অ্যাঃ! তবে কি এইখানাই মতিবাবুর ঘর থেকে অদৃশ্য হয়েছে?"

—"তাই তো বোধ হচ্ছে।"

—"এখানা তুমি কোত্থেকে পেলে?"

—"পিক-পকেট যেখান থেকে চিরকালই গুপ্তধন আহরণ করে।"

—"হেমন্ত, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।"

—"শোনো। কুয়াশায় গা ঢেকে আজ আমাদের একসঙ্গে আক্রমণ করেছিল দুজন লোক। খুব সম্ভব তাদের হাতে ছিল খাটো লোহার ডাণ্ডা। তারা নিশ্চয়ই আমাদের খুন করতে আসে নি, এসেছিল খালি ঐ দস্তানাটাই হাতাবার জন্যে। বোধহয় এই দস্তানা কেউ কেউ চেনে, দস্তানাটা দেখলে তারা মালিকের পরিচয় দিতে পারে। কিংবা অন্য কোন কারণও থাকতে পারে। কিন্তু সে-কথা যাক।...একজন তোমাকে আক্রমণ করে, আর-একজন আমার মাথা

লক্ষ্য করে ডাণ্ডা মারে, কিন্তু ফশকে যায়। সে আবার ডাণ্ডা তোলবার আগেই আমি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বুকপকেটে অনুভব করি এই ডায়ারিখানির অস্তিত্ব। তুমি জানো রবীন, খুব বিপদেও আমার মাথা গুলিয়ে যায় না। চোখের নিমেষ পড়বার আগেই আমি এক-হাতে তাকে জড়িয়ে সাঁৎ করে তাঁর পকেটে আর-এক হাত চালিয়ে ডায়ারিখানা তুলে নিলুম—কিন্তু সেই মুহূর্তে অন্য লোকটা তোমাকে ছেড়ে আমারও মাথায় মারে ডাণ্ডা, আমিও মাটির ওপরে পড়ে যাই। আমার মাথা ফাটে নি বটে, কিন্তু আচ্ছন্নের মতো হয়ে গেলুম। আমাকে সেই অবস্থায় পেয়ে, দস্তানাটা নিয়ে তারা সরে পড়ে। আমি যে পকেট মেরেছি, এটা নিশ্চয়ই তারা জানতে পারে নি।"

—"চোরের ওপরে আচ্ছা বাটপাড়ি করেছ বটে!···কিন্তু হেমন্ত, ডায়ারি আর চাবির গোছা চুরি দেখে সত্যি সত্যিই সন্দেহ হয় যে, বাড়ির ভেতরের কোন লোকই মতিবাবুকে খুন করেছে। হ্যাঁ, সন্দেহ কেন, একরকম নিশ্চিতভাবেই এ-কথা বলা যায়। বাইরের লোক খুন আর টাকা চুরি করেই তুষ্ট হতো—পরে মতিবাবুর চাবির গোছা আর ডায়ারি কোন কাজেই লাগতে পারত না।"

ডায়ারির পাতা ওলটাতে ওলটাতে হেমন্ত অন্যমনস্কভাবে বললে, "হ্যাঁ, সতীশবাবুরও ঐ মত।"

মিনিট পাঁচ-ছয় হেমন্ত ডায়ারি থেকে আর মুখ তুললে না। তারপর হঠাৎ উৎসাহিত-কণ্ঠে বললে, "পেয়েছি রবীন, ডায়ারি চুরির কারণ পেয়েছি! এই পাতাখানা ছাড়া ডায়ারির অন্য কোথাও আমাদের পক্ষে বিশেষ কোন দরকারি কথা নেই। শোনো—" বলেই পড়তে লাগল :

—"আমার শোবার ঘরের বড় টেবিলের ডানদিকের টানার পিছনের কাঠে একটি গুপ্তস্থান আছে। বাঁ-কোণের শেষপ্রান্তে খুব ছোট একটি স্প্রিং আছে। সেটি টিপলেই গুপ্ত স্থানটি বেরিয়ে পড়বে। ওর

মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার হীরা, চুণী, পান্না আর মুক্তা আছে। বৃদ্ধ হয়েছি, স্বাস্থ্য দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে, হঠাৎ যদি মারা পড়ি সেই ভয়ে আমার উত্তরাধিকারীর জন্যে এখানে এই কথাগুলি লিখে রাখলুম।"

—"রবীন, খুনী জানত যে, ডায়ারির মধ্যে এই গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাবে!"

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, "তাহলে এই খুনী নিশ্চয়ই বাড়ির ভিতরের লোক। এইজন্যেই সে চাবি চুরি করেছে! কাল তাড়াতাড়িতে ডায়ারি পড়তে পারে নি, খুব শীঘ্রই সে কাজ হাঁসিল করবে!"

—"করবে নাকি? দেখা যাক!" বলেই হেমন্ত উঠে 'টেলিফোনে'-র 'রিসিভার' তুলে নিয়ে থানার নম্বর বললে।

—"কে? সতীশবাবু? থানায় ফিরে এসেছেন? হ্যাঁ, আমি হেমন্ত। শুনুন। মতিবাবুর দেহ শব-ব্যবচ্ছেদাগারে পাঠিয়ে দিয়েছেন তো? বেশ। তাঁর শোবার ঘর বন্ধ আছে? উত্তম। কিন্তু একটা জরুরি কথা মনে রাখবেন। ও-ঘরের দরজার সামনে সর্বদাই যেন পাহারা রাখা হয়—কেউ যেন কোন কারণেই ও-ঘরে ঢুকতে না পায়। কেন? কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এখনো প্রকাশ করবার সময় হয় নি। রাগ করবেন না, যথাসময়ে সমস্তই বলব।···

·········বলেন কি? যে কনস্টেবল ভাঙা কাঁচের গেলাস নিয়ে একলা আসছিল, হঠাৎ পথে কারা তাকে আক্রমণ করেছে? তারপর? গেলাসটা ছিনিয়ে নিতে পারে নি? শুনে সুখী হলুম। কনস্টেবল কারুকে চিনতে পারে নি? হ্যাঁ, কলকাতার আজকের কুয়াশাটা আশ্চর্য বটে। অভূতপূর্ব! কি বললেন? মিনিট-দুয়েক আগেই গলির মোড়ের কাছে কনস্টেবল আর-এক পথিকের গায়ের ওপরে গিয়ে পড়ে? কে সে? বিনোদ? অত কুয়াশায় ওখানে সে কি করছিল? মাথা ধরেছে বলে বেড়াতে বেরিয়েছিল? এই বিশ্রী কুয়াশায়? আশ্চর্য ওজর তো! তাকে গ্রেপ্তার করবেন কিনা ভাবছেন? আপনার কর্তব্য

আপনিই ভাল বোঝেন, আমি আর কি বলব? এ-পথে আমি শিক্ষানবিস ছাড়া তো আর কিছুই নই! ……হ্যাঁ, আমার কাছেও একটা নতুন খবর আছে। আমাকে আর রবীনকেও আজ কারা আক্রমণ করেছিল। রবীনের মাথা ফেটে গেছে। বেচারী! আমার খুব বেশি লাগে নি বটে, কিন্তু সেই দস্তানাটা লুট হয়ে গেছে— কনস্টেবলের মতো আমার ভাগ্যও ভালো নয়। না, চিনতে পারি নি। একে কুয়াশা, তার ওপরে উপন্যাসের দুরাত্মাদের মতো তারা মুখোশ পরে এসেছিল। না, না, এত রাত্রে আমাদের আর দেখতে আসতে হবে না, আমরা ভালোই আছি। আচ্ছা নমস্কার।" আমার দিকে ফিরে সে বললে, "রবীন, সব শুনলে তো?"

অভিভূত-কণ্ঠে বললুম, "ভাই হেমন্ত, এ যে আমরা সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়েছি। কাল খুন, আশি হাজার টাকা চুরি, আজ আমাদের আর কনস্টেবলকে আক্রমণ! আমি ভাই কালি-কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করি, এত গোলমাল আমার ধাতে সহ্য হবে না তো!"

হেমন্ত বললে, "হুঁ, আমিও জানতুম, বটতলার ডিটেকটিভ-নভেলেই এমন সব হৈ হৈ কাণ্ড ঘটতে পারে!···কিন্তু রবীন, বুঝতে পারছ কি, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো সরাবার জন্যে খুনীরা কি-রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে! উপন্যাসকেও সত্য করে তুলতে চাইছে? কিন্তু কে তারা—কে তারা? কিছুই ধরতে পারছি না যে!"

আমি বললুম "আচ্ছা, সতীশবাবুর কাছে তুমি একটা কথা ভাঙলে না কেন?"

দুষ্টুমি-ভরা হাসি হাসতে হাসতে হেমন্ত বললে, "কি কথা?

—"মতিবাবুর ডায়ারির কথা?"

হেমন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, "রবীন, আমার এ লুকোচুরি মার্জনীয়। সত্যি কথা বলতে কি, এইটেই হবে আমার জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য 'কেস'। পুলিসের কাছে এর সমস্ত বাহাদুরিটা আমি একলাই অর্জন করতে চাই। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, আমি এ মামলাটার

কিনারা করতে পারব। অবশ্য, তারপরে আমি সরে দাঁড়াব যবনিকার অন্তরালে—জনসাধারণের কাছ থেকে পুলিসকে ষোল আনা সুখ্যাতি আদায় করবার অবসর দিয়ে।”

—“কিন্তু এ আগুন নিয়ে খেলা হচ্ছে, আমাদের প্রাণ যেতেও পারে।”

—“দেহের ভিতর থেকে এত চটপট প্রাণবায়ু যাতে বর্হিগত না হয় সে-চেষ্টার ক্রটি আমি করব না। কিন্তু···কি আশ্চর্য, আমি যে একটা বড় কথা ভুলে গিয়েছি রবীন !’ বলেই হেমন্ত টপ করে দাঁড়িয়ে উঠে নিজের পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে দিলে।

—“কি খুঁজছ তুমি ?”

—“এইটে।” হেমন্ত বার করলে সেই কাগজের মোড়কটা—যার ভিতরে সে পুরে রেখেছিল খুনীর জুতো-থেকে-খশা খানিকটা শুকনো কাদা।

মোড়কটা খুলে হেমন্ত আশ্বস্ত-স্বরে বললে, “আঃ, বাঁচা গেল; কাদার টুকরোটা ধস্তাধস্তিতে গুঁড়িয়ে গেছে বটে, কিন্তু হারিয়ে যায় নি !”

আমি বললুম, “ঐ এক টুকরো কাদাকে তুমি এমন অমূল্য নিধি বলে ভাবছ কেন ? ওর ভেতর থেকে তুমি কি খুনীকে আবিষ্কার করতে চাও ?”

—“আশ্চর্য কি ? আমার সঙ্গে পরীক্ষাগারে এস।”

হেমন্ত তার পরীক্ষাগারে গিয়ে টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। তারপর অণুবীক্ষণ ও সেই মোড়কের শুকনো কাদার গুঁড়ো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

এরকম পরীক্ষার মধ্যে আমি কিছু রস-কস পাই না। ঘরের এক-কোণে মাটি দিয়ে তৈরি একটি গায়ের ছাল-ছাড়ানো মানুষ-মূর্তি দাঁড় করানো ছিল—আমি তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম। শিল্পী কেবল মূর্তিই গড়ে নি, স্বাভাবিক সব রং বুলিয়ে, নরদেহের ত্বকের তলায় যে-সমস্ত বিশেষত্ব থাকে, তার প্রত্যেকটিই ফুটিয়ে তুলেছে। এসব দেখলে বেশ বোঝা যায়, পঞ্চভূত দিয়ে আমাদের দেহ তৈরি করতে বসে প্রকৃতি-

দেবীকে কত মাথা খাটাতে, কত শিল্প-চাতুরী প্রকাশ করতে হয়েছে। আশ্চর্য ও রহস্যময় হচ্ছে মানুষের দেহের ভিতরটা !

এমন সময় হেমন্ত আমাকে ডেকে বললে, "এই শুকনো কাদার ভেতরে কি কি আছে, জানো ?"

জানবার জন্যে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তবু বললুম, "কি কি আছে ?"

—"এর মধ্যে আছে চূণ আর বালি, সুরকি আর কয়লার গুঁড়ো। এগুলো মেশানো আছে কলকাতার পথের সাধারণ ধুলোর সঙ্গে।"

আমি বললুম, "চূণ, বালি, সুরকি আর কয়লাও মেলে কলকাতায় যেখানে-সেখানে। এর কোনটাকেই আমি অসাধারণ বলে মনে করি না।"

—"কর না নাকি ? ও !" এই বলেই হেমন্ত একেবারে চুপ মেরে গেল। তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, অত্যন্ত একমনে সে যেন কোন মহা-দরকারী কথা চিন্তা করছে।

খানিক পরে আমি বললুম, "দেখ ভায়া, এটা ভারি বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু। শুকনো কাদার গুঁড়ো, অর্থাৎ ধুলো নিয়ে এত-বেশি মাথা ঘামানো হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কের অপব্যবহার !"

হেমন্ত আমার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল অন্যমনস্কের মতো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "প্রিয় রবীন, তুমি হচ্ছ একটি প্রকাণ্ড উজবুগ !"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্রবীভূত বাতাস

পরদিন বৈকালে চললুম পরেশ মিত্র লেনে, মিঃ দত্তের চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে।

বিশেষ করে, কলকাতার উত্তর অঞ্চলে শহরের শিরা-উপশিরার মতো

যেসব ছোট ছোট গলি দেখা যায়, পরেশ মিত্র লেনও হচ্ছে ঠিক সেই-রকম। গলিটি চওড়ায় ছয়-সাত হাতের বেশি নয়, সাপের মতো এঁকে-বেঁকে পাক খেয়ে ভিতর দিকে চলে গিয়েছে।

গলিটা প্রথম যেখানে মোড় ফিরেছে, সেখানে বড় রাস্তা থেকে দেখা গেল, একখানা নতুন বাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে।

একটা জিনিস আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি, ছেলেবেলা থেকেই সর্ববিষয়েই হেমন্তের কৌতূহল হচ্ছে অসীম। হয়তো এটা ভালো ডিটেকটিভের একটা বিশেষ লক্ষণ, কিন্তু ঠিক এই কারণেই তার সঙ্গে পথ-চলা অনেক সময়ে কেবল বিরক্তিকরই নয়, নিরাপদও ছিল না।

একদিনের কথা বলি।

বাগবাজার দিয়ে যাচ্ছি আমরা দুইজনে। রাস্তায় একটা বিড়ি-ওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে কে হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল হেমন্ত। তিন, চার, ছয় মিনিট কেটে গেল, সেখান থেকে সে আর নড়বার নাম করে না।

আমি বিস্মিত হয়ে বললুম, "কি হে, ব্যাপার কি? এই দুপুর রোদে মাথার চাঁদি গরম হয়ে উঠল যে, আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে?"

হেমন্ত আমাকে একটু তফাতে টেনে এনে বললে, "রবীন, তুমি ওর দাঁত লক্ষ্য করেছ?"

—"দাঁত! কার দাঁত?"

—"ঐ যে লুঙ্গিপরা লোকটা এখনি হা হা করে হেসে উঠল? দেখ দেখ, আবার ও হাসছে। ওর দাঁত দেখ!"

আমি বিরক্তি হয়ে বললুম, "যাও যাও, বাজে বোকো না। পথে পথে লোকের দাঁত দেখে বেড়ানো আমার ব্যবসা নয়, চল!" বলেই তার হাত ধরে টান মারলুম।

কিন্তু হেমন্তকে এক ইঞ্চি নড়াতে পারলুম না। সে বললে, "ওর শ্বদন্তগুলো কি-রকম অসম্ভব বড় আর লম্বা দেখেছ?"

—"শ্বদন্ত ? শ্বদন্ত আবার কি ?"

—"মূর্খ রবীন, তুমি সাহিত্য-চর্চা ছেড়ে দাও। তুমি ভালো গোয়েন্দা বা সাহিত্যিক কিছুই হতে পারবে না। মাতৃভাষা জান না ? শ্বদন্ত, অর্থাৎ canine tooth !"

—"সাহিত্যিকের কাজ নয় শ্বদন্ত নিয়ে তদন্ত করা। চলে এস।"

—"অসাধারণ ওর শ্বদন্ত। তার ওপরে ও আবার চৌকো-চোয়ালের অধিকারী। যে-সব বড় বড় পণ্ডিত অপরাধ-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা বলেন যে—"

—"তাঁরা কি বলেন, আমি শুনতে চাই না। এখন আগে আসবে কিনা বল !"

—"উঁহু, এখন আমি যাব কোথায় ? আমি আগে ও-লোকটার পরিচয় জানতে চাই !...ঐ দেখ, লোকটা এগিয়ে চলল ! মস্ত-বড় লম্বা শ্বদন্ত, তার ওপরে চৌকো-চোয়াল—সোনায় সোহাগা ! এস রবীন, আমরাও ওর পিছনে পিছনে অগ্রসর হই !" হেমন্ত এমন বজ্রমুষ্টিতে আমার হাতের কবজি চেপে ধরল যে, তার হাত ছাড়ানো অসম্ভব।

বাগবাজারের মোড়ে এসে লোকটা চড়ল চিৎপুর রোডের বাসে। আমরাও বাসে চেপে কিনলুম টিকিট।

আমি চুপি চুপি বললুম, "এ যে, বুনো হাঁসের পিছনে ছোটা হচ্ছে ! ওর পরিচয় জেনে আমাদের কি লাভ ?"

—"লাভ হয়তো কিছুই হবে না, হতাশ-মুখে ফেরার সম্ভাবনাই প্রবল ! কিন্তু আমি হচ্ছি অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্র ! বিজ্ঞানের মতা-মতগুলো মেকি কি না, যাচাই করবার চেষ্টা করব না ?"

মনে মনে হেমন্তের অপরাধ-বিজ্ঞানকে পাঠাতে চাইলুম জাহান্নামে। মশাই, কি আপদ বলুন তো ! চৈত্রমাসের তপ্ত দুপুর, পথের কুকুর-গুলোও এখন ধুঁকতে ধুঁকতে ঠাণ্ডা আশ্রয় খুঁজছে। কোথায় বাড়িতে গিয়ে খেয়ে দেয়ে, ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করে বিজলী-পাখার তলায় শীতলপাটি বিছিয়ে বসে বরফ-দেওয়া সরবৎ পান করতে করতে রবি-

ঠাকুরের কবিতা পড়ব, না ছুটে চলেছি এক মহাপাগলের সঙ্গে কোন শ্বদন্ত ও চৌকো-চোয়ালের পিছনে! গ্রহের ফের আর কাকে বলে?

হতচ্ছাড়া শ্বদন্ত বাস থেকে নামল হ্যারিসন রোডের মোড়ে। তারপর খানিক এগিয়ে একটা কফিখানায় গিয়ে ঢুকল।

হেমন্ত রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বললে, "লোকটার পরিচয় এখনো জানা হল না তো! আমরাও কফিখানার খরিদ্দার হব নাকি?"

—"ভাই হেমন্ত, এইবার দয়া করে আমাকে মুক্তি দাও। তোমার শ্বদন্তের নাম-ধাম বংশ পরিচয় তো আমার কাছে নেই, আমি অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রও নই। আমাকে নিয়ে আর টানাটানি কর কেন?"

হেমন্ত মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভাবছে, অতপর কি করা কর্তব্য, এমন সময় বড়বাজার থানার এক ইনস্পেক্টার সেখানে এসে হাজির হলেন।

—"আরে, আরে, হেমন্তবাবু যে! এমন অসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছেন কেন?"

হেমন্ত কফিখানার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, "ঐ লোকটাকে দেখছি! ঐ যে, পরনে ডোরা-কাটা সবজে লুঙ্গী, গায়েও ডোরা-কাটা লাল গেঞ্জী, বসে বসে গোগ্রাসে মাংস গিলছে।"

ইনস্পেক্টার প্রায় মিনিটখানেক ধরে ভালো করে লোকটাকে দেখলেন, তারপর সবিস্ময়ে বললেন, "ব্যাটার সাহস তো কম নয়! দিনের বেলায় এখানে প্রকাশ্যে বসেই ফুর্তি করে খাবার খাচ্ছে! ধন্যবাদ হেমন্তবাবু, ওকে দেখিয়ে দিয়ে ভারি উপকার করলেন।"

—"কে ও?"

—"আবদুল মিয়া, মেছোবাজারের গুণ্ডা, দাগী আসামী, সাতবার জেল খেটেছে! আজ তিনদিন ধরে একটা খুনের মামলায় ওকে আমরা সারা কলকাতা-ময় খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর ও কিনা আমাদের হাতের কাছেই খোস-মেজাজে সশরীরে বর্তমান।"

আবদুল তখনি ধরা পড়ল।

হেমন্তের দুই চোখ যেন নাচতে লাগল। বাড়ি ফেরবার জন্যে একখানা ট্যাক্সি ডেকে বললে, "ভায়া হে, অপরাধ-বিজ্ঞানের মাহাত্ম্যটা দেখলে তো?"

…পরেশ মিত্র লেনের সেই প্রায় সম্পূর্ণ বাড়িখানা হঠাৎ হেমন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

মিনিট-দুয়েক ধরে বাড়িখানা দেখে সে বললে, "দেখ রবীন, আজ কিছুকাল থেকে বাংলাদেশে নতুন এক উৎপাত শুরু হয়েছে। 'স্কাইস-ক্রেপার' নামে এক অদ্ভুত—এমন কি, বেয়াড়া ধরনের বাড়ি আমরা আমেরিকায় দেখে এসেছি। আমেরিকার বায়স্কোপওয়ালারা এই 'কনারক মন্দির' আর 'তাজমহলের' দেশে এসেও সেই ঢঙে 'মেট্রো'-সিনেমার বাড়ি তৈরি করেছে! সেটা আমাদের চোখকে আঘাত দিলেও 'মেট্রোর' কর্তৃপক্ষকে দোষ দিতে চাই না। কারণ, তারা হচ্ছে সেই দেশের লোক, যারা বিদেশের ঠাকুর ফেলে, স্বদেশের কুকুর ধরে আদর করে মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। কিন্তু আজকাল বাঙালিরাও দেখছি কলকাতার পথে পথে স্কাইসক্রেপারের নকলে ঘর-বাড়ি তৈরি করত লজ্জিত হয় না। এই নতুন বাড়িখানার দিকে চেয়ে দেখ। এই বিদেশী আদর্শের বদ-হজম সহ্য করা অসম্ভব। এমন অনুকরণপ্রিয় জাতি কোনদিনই স্বাধীন হতে পারবে না।"

বিরক্ত-চোখে হেমন্ত আরো কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললুম, "তোমার স্থাপত্যের সমালোচনা রেখে এখন দশ নম্বরের বাড়ি খোঁজো। পাঁচটা বাজে যে, চায়ের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়।"

—"যাক গে উত্তীর্ণ হয়ে! এও অনুকরণ! আমরা কি ইংরেজ যে এই সময়ের মধ্যে আমাদেরও চা খেতে হবে?"

—"এস, এস, ও-সব নিয়ে পরে আলোচনা করলেও চলবে। মিঃ দত্ত হয়তো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন!"

কিছুদুর এগিয়েই দশ নম্বরের বাড়ি পাওয়া গেল। দ্বারবানের উপরে বোধহয় আদেশ ছিল আমাদের নাম শুনেই সে দোতলায় যেতে

অনুরোধ করলে।

মিঃ দত্ত তাঁর দোতলার বৈঠকখানায় বসে সত্য-সত্যই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দেখলুম, সতীশবাবু আমাদের আগেই সেখানে এসে হাজির হয়েছেন।

মিঃ দত্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, "হেমন্তবাবু, রবীনবাবু! কাল আপনারা কি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছিলেন, সতীশবাবুর মুখে তা শুনে স্তম্ভিত হয়েছি। রবীনবাবুর মাথায় এখনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে যে! নিশ্চয় ওঁর খুব লেগেছে।"

আমি বললুম, "লাগেনি বললে মিথ্যা বলা হবে। মধু খেলে মিষ্টি লাগে, ডাণ্ডা খেলে কষ্ট পেতে হয়। প্রকৃতির এই-ই স্বাভাবিক নিয়ম।"

মিঃ দত্ত বললেন, "কিন্তু, কে এই পাপিষ্ঠ? অনায়াসে যে খুন করছে, ভদ্রলোককে মারাত্মক আক্রমণ করছে, অথচ এখনো মেঘনাদের মতো লুকিয়ে আছে মেঘের আড়ালে? আমার তো মশাই, বাড়ি থেকে আর বেরুতে ভয় করছে!"

সতীশবাবু বললেন, "আপনার আবার কিসের ভয়? আপনি তো পুলিসের লোক নন?"

—"আমি পুলিসের লোক নই বটে, কিন্তু বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে পুলিসকে তো সাহায্য করছি? খুনীদের রাগ আমার ওপরে পড়তে কতক্ষণ!"

সতীশবাবু বললেন, "ভয় নেই মিঃ দত্ত, আমরা বোধহয় শীঘ্রই খুনীকে ধরতে পারব। আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারেন?"

—"আজ্ঞা করুন।"

—"আজ্ঞা নয় মিঃ দত্ত, অনুরোধ। আপনি তো মতিবাবুর বন্ধু, ও-পরিবারের অনেক খবরই রাখেন। বিনোদলালবাবু কোন-কোন লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেন, সে-বিষয়ে আমাদের কোন খবর দিতে পারেন?"

মিঃ দত্ত বিরক্তভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "বিনোদের বন্ধুদের কথা

আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবেন না !"

—"কেন বলুন দেখি ?"

—"তারা লোক ভালো নয় ! তাদের বিশেষ পরিচয় আমি জানি না বটে, কানাঘুশোয় শুনেছি, বন্ধুদের চেষ্টাতেই বিনোদের পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে ! বন্ধুরা চেষ্টা করবে না কেন ? আমার মৃত্যুর পরে বিনোদ হবে অগাধ সম্পত্তির মালিক, তারপরেই তো তাদের পোয়াবারো ! কিন্তু যেতে দিন মশাই, ও-কথা যেতে দিন !"

হেমন্ত বললে, "সতীশবাবু, শব-ব্যবচ্ছেদাগারের খবর কি ?"

—"মতিবাবুর পাকস্থলীতে কোন-রকম বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি, যদিও ডাক্তারদের আগে সেই সন্দেহই হয়েছিল। মতিবাবুকে কেউ গলা টিপে মেরে ফেলেছে কিনা, ডাক্তাররা জোর করে সে-কথাও বলতে পারছেন না, তবে তাঁরা স্বীকার করছেন যে, ওটা মৃত্যুর কারণ হলেও হতে পারে। মতিবাবুর কণ্ঠের প্রত্যেক রক্তবহা নাড়িতে অতিশয় রক্তাধিক্যের লক্ষণ পাওয়া গেছে। নিশ্চয়ই বিষম জোরে তাঁর গলা টিপে ধরা হয়েছিল। ডাক্তারের রিপোর্ট তো এই, আপনার রিপোর্ট কি হেমন্তবাবু ?"

—"আমার রিপোর্ট ? আপাতত আমার কাছে রিপোর্ট করবার মতন কোন তথ্যই নেই।"

আমি উপহাসের স্বরে বললুম, "কেন হেমন্ত, তুমি তো অনায়াসেই তোমার সেই মহামূল্যবান শুকনো কর্দম-চূর্ণের কাহিনী বলতে পারো ?"

সতীশবাবু আগ্রহ-ভরে বললেন, "দোহাই হেমন্তবাবু, আপনার এই কর্দম-চূর্ণের কাহিনী থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।"

আমার দিকে একবার রেগে কটমট করে তাকিয়ে হেমন্ত বললে, "না সতীশবাবু, শোনেন কেন, এ-সব বিষয়ে আমার বন্ধুটি হচ্ছে পয়লা নম্বরের অপদার্থ। যে-ধুলোকে আমরা রাখি পায়ের তলায়, আধুনিক অপরাধ-বিজ্ঞানে তার স্থান যে কত ওপরে, মূর্খ রবীন সে-কথা জানে না।"

কিন্তু দত্ত কৌতূহলী-কণ্ঠে বললেন, "হেমন্তবাবু, এ-সব বিষয়ে

আমিও কম-কাঁচা নই। আপনার মুখে একটুখানি ধুলোর ইতিহাস শুনতে চাই। ততক্ষণ বেয়ারারাও চা-টা নিয়ে আসবে।”

হেমন্ত বললে, “দেখুন, কিছুকাল আগেও অপরাধের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ছিল না বিশেষ-কিছুই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চুরি আর খুনের মামলার তদন্ত আরম্ভ হয়েছে খুব একালেই। আগে কোন লোকের উপর সন্দেহ হলে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করবার জন্য তাকে দেওয়া হত অমানুষিক যন্ত্রণা। তার ফলে কেউ-কেউ মারা পড়ত এবং অনেকে প্রাণের ভয়ে নির্দোষ হলেও মিথ্যা বলে অপরাধ স্বীকার করত। ইউরোপে এমন সব ঘটনাও ঘটেছে, পুলিস সন্দেহ করে একজনকে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলেছে, তারপর প্রকাশ পেয়েছে, সত্যিকার অপরাধী হচ্ছে আর-একজন লোক। আসল কথা, আগে অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশের বুদ্ধির জোরে নয়, যন্ত্রণার চোটেই আসামীর অপরাধ প্রকাশ পেত।

“কিন্তু আজকের ধারা ভিন্ন রকম। একালে পুলিস যদি যন্ত্রণা দিয়েও আসামীকে অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করে, তাহলে আদালতে তা গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু ইউরোপের আধুনিক-পুলিসকে যন্ত্রণার দ্বারা অপরাধীদের দোষ আবিষ্কার করতে হয় না। তার কারণ, পুলিস এখন বিজ্ঞানের সাহায্য পায়। অপরাধীর স্বীকার-অস্বীকার নিয়ে পুলিস মাথা ঘামায় না, ঘটনাস্থলে পাওয়া আসামীর ব্যবহার-করা কাপড়, জামা, জুতো, টুপি, লাঠি, ছোরা-ছুরি প্রভৃতি অনেক রকম জিনিসের ভেতর থেকে পুলিস বিজ্ঞানের সাহায্যে আশ্চর্য সব তথ্য আবিষ্কার করতে পারে। আসামী অপরাধ স্বীকার করলেও দণ্ড থেকে মুক্তি পায় না। এ-বিষয়ে নানাদিকে নানা কথা বলা যায়, কিন্তু আপাতত বলতে চাই কেবল ধুলোর কথা।

“আপনারা সকলেই নিশ্চয় জানেন যে, ধুলোর অগম্য ঠাঁই নেই। জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতরে একটা বাক্সে ঢাকনি-দেওয়া কৌটা রেখে দিন, তার মধ্যেও ধুলো ঢুকবে। সাধারণ চোখে সে-ধুলো যদি

দেখতে না পাওয়া যায়, তবে অণুবীক্ষণ ব্যবহার করুন—দেখবেন, কৌটার ভেতরে বাস করছে নানারকম ধুলো। এক-এক শ্রেণীর মানুষ যে-কোন জিনিস নিয়ে নিয়মিতভাবে নাড়াচাড়া করবে, তার মধ্যে বিশেষ করে পাওয়া যাবে এক এক শ্রেণীর ধুলো। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, আর ফ্রান্সের পুলিসরা এ-বিষয় নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছে। অপরাধীদের ব্যবহৃত জিনিসগুলো হচ্ছে তাদের কাছে নাম-সই-করা স্বীকার-উক্তির চেয়েও মূল্যবান।

"যারা পাঁউরুটি তৈরি করে, তাদের নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায় গমের পালো বা শ্বেতসার। যাদের কাজ ধাতু নিয়ে, তাদের জিনিসে মেলে অতি-সূক্ষ্ম ধাতব ধুলো। খনিতে যারা থাকে, তাদের ব্যবহৃত জিনিসে থাকে খনিজ ধুলো। রাস্তায় যারা পাথর ভাঙে তাদের জিনিস সূক্ষ্ম বালুময় ধুলোতে ভরা। এইরকম নানারকম জিনিস অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করে অনায়াসে বলে দেওয়া যায়, তাদের মালিক মিস্ত্রী, ছুতোর, কশাই, মুচি বা অন্য কোন শ্রেণীর লোক।

প্রফেসর সেভেরিন ইকার্ড নানা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করেছেন, নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত ট্যাঁকঘড়ি বা হাতঘড়ির ভেতরে যে ধুলো জমে, তার সাহায্যে খুব সহজেই বলে দেওয়া চলে, কোন শ্রেণীর লোক হচ্ছে ঘড়ির মালিক। এইবার একটা সত্য গল্প বলি :

"বিলাতের এক পাড়াগাঁয়ে একবার একটি স্ত্রীলোককে কে খুন করে পালায়। স্ত্রীলোকটির দেহে ছুরির আঘাত ছিল বটে, কিন্তু সে আঘাতই তার মৃত্যুর কারণ নয়। লাল ও নীল রেশমী সুতোয় পাকানো দড়ার ফাঁশ তার গলায় লাগিয়ে কেউ তাকে হত্যা করে পথের ধারে ফেলে পালিয়ে গেছে।

"পুলিস দস্তুরমত বৈজ্ঞানিক-প্রথায় তদন্ত শুরু করলে। হত স্ত্রীলোকটির পোশাকে পাওয়া গেল তামাকের ধুলো, অর্থাৎ নস্য ; তার জামা-কাপড়ের কোন কোন জায়গায় কয়লার গুঁড়োও দেখা গেল। তারও ওপরে আবিষ্কৃত হল অভ্র, silicate of calcium আর magnesium

প্রভৃতি খনিজ পদার্থের ধুলো।

"কিছুদিন পরে পুলিস সন্দেহক্রমে একটা লোককে গ্রেপ্তার করলে। অণুবীক্ষণ দিয়ে তার আঙুলের নখের ফাঁকে দেখা গেল ঐসব অভ্র, ফস্লা আর অন্যান্য পদার্থের অতি সূক্ষ্ম ধুলো এবং—সবচেয়ে যা সন্দেহজনক—লাল-নীল রেশমী সুতোর টুকরো। জানা গেল, সে নস্য নেয়। তার পকেটে একখানা ছুরি ছিল, তাতেও রয়েছে অস্পষ্ট রক্তের ছাপ।

"আসামী বললে, 'সে গ্যাসের কারখানায় আর খনিতে ঠিকে কাজ করে। সে কারখানা আর খনির ঠিকানাও দিলে। কিন্তু তার নখের ফাঁকে যে সব খনিজ পদার্থের ধুলো ছিল, তার দেওয়া ঠিকানা মতো কারখানা আর খনিতে গিয়ে সে-রকম ধুলো পাওয়া গেল না। কিন্তু যে গাঁয়ে নারীহত্যা হয়েছে, সেখানকার ধুলোয় মিশ্রিত খনিজ পদার্থের গুঁড়োর সঙ্গে আসামীর নখের ধুলো হুবহু মিলে গেল।' তখন আসামী বাধ্য হয়ে অপরাধ স্বীকার করলে।

"ভেবে দেখুন, পুলিস যদি অণুবীক্ষণের সাহায্য গ্রহণ না করত, তাহলে হত স্ত্রীলোকটির পোশাক আর হত্যাকারীর নখের ফাঁক থেকে কিছুই আবিষ্কার করতে পারত না, কারণ, যে-সব ধূলিকণা পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো কিছুতেই ধরা পড়ত না সাধারণ দৃষ্টিতে।

"আমিও এই পদ্ধতিতেই কাজ করবার চেষ্টা করি। মতিবাবুর লাসের পাশে যে দস্তানাটা আমরা পেয়েছিলুম, সেটা খোয়া না গেলে আমিও হয়তো তার ভেতরকার ধুলো পরীক্ষা করে অনায়াসেই বলতে পারতুম, দস্তানার মালিকের পেশা কি এবং দস্তানার ভেতর ছিল কোন শ্রেণীর ধুলো। আশা করি, আমার বক্তব্য আপনারা বুঝতে পেরেছেন, আর আমার বলবার কিছু নেই।"

সতীশবাবু বললেন, "হেমন্তবাবু, সেই শুকনো কাদার গুঁড়ো তো আপনি পরীক্ষা করেছেন বলে শুনছি, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছেন?"

হেমন্ত অবহেলা-ভরে বললে, "ধুলো পেয়েছি বটে, কিন্তু অত্যন্ত বাজে ধুলো, কোনো কাজে লাগবে বলে মনে হচ্ছে না !...কই মিঃ দত্ত, কোথায় আপনার চা ? এতক্ষণ তো পাগলের মতো বকে মরলুম, কিন্তু আর তো চা না হলে চলে না।"

—"নিশ্চয়, নিশ্চয় ! বেয়ারা, এই বেয়ারা ! জলদি চা লে-আও।"

চা এল, খাবার এল।

মিঃ দত্ত বললেন, "হেমন্তবাবু, আপনার লেকচার শুনে আজ অনেক জ্ঞানলাভ করলুম, ধন্যবাদ !"

চা পান করতে করতে হেমন্ত বললে, "ঐ দরজাটার পর্দার ফাঁক দিয়ে যে-ঘরটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে শেলফের ওপরে অত শিশি-বোতল সাজানো কেন ? ওটা কি আপনার ডিসপেন্সারি ?"

—"না হেমন্তবাবু, ওটা আমার ডিসপেন্সারি নয়, ও-ঘরটি হচ্ছে আমার রসায়নাগার।"

—"রসায়নাগার ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি তো জানেন, রসায়ন-শাস্ত্র নিয়ে আমি অল্পবিস্তর পরীক্ষা-কার্য করি। যদিও জ্ঞান আমার সামান্য, তবু ঐ রসায়নাগারের পিছনে আমি অনেক টাকা খরচ করেছি। আপনি ও-ঘরটি দেখবেন ?"

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে হেমন্ত হাসতে হাসতে বললে, "রবীন জানে, সব ব্যাপারেই আমার কৌতূহলের সীমা নেই—বিশেষ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে। আমার লেকচার তো শুনলেন, এইবার রসায়ন-শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।"

—"আপনাকে নতুন কথা শোনাবার শক্তি আমার আছে বলে মনে হয় না। বড়-জোর আমার রসায়নাগারটি আপনার মতো গুণীকে দেখিয়ে ধন্য হতে পারি। চা খাওয়া হয়েছে ? আসুন !"

মিঃ দত্তের সঙ্গে আমরা তিনজনেই পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। আমি এই রসায়নাগারের মধ্যে বিশেষ কোন নতুনত্ব পেলুম না, কারণ,

হেমন্তের পরীক্ষাগারের সাজ-সজ্জার সঙ্গে এরও মিল আছে অনেকটা। সেই শিশি, বোতল, জার, অণুবীক্ষণ, কাচের মাপজোপের গেলাস, বকযন্ত্র প্রভৃতি। তবে এই রসায়নাগারের জন্যে মিঃ দত্ত হেমন্তের চেয়ে ঢের বেশি টাকা খরচ করেছেন, সেটা বুঝতে দেরি লাগে না।

আমি রসায়ন-রসে বঞ্চিত, কাজেই এ-ঘরের যথার্থ মর্যাদা হয়তো বুঝতে পারলুম না। সতীশবাবুরও অবস্থা বোধহয় আমারই মতো কারণ বোকা বনবার ভয়ে তিনি একেবারে বোবা হয়ে গেলেন। কিন্তু সমঝদার হেমন্ত কৌতূহলে বালকের মতন চঞ্চল হয়ে উঠল। বিপুল আগ্রহে একবার এটা, একবার ওটা পরখ করে এবং প্রশ্নের পর প্রশ্নে মিঃ দত্তকে যেন আচ্ছন্ন করে দেয়।

—"ওটাতে কি আছে মিঃ দত্ত?"

মিঃ দত্ত হয়তো আমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য ও অদ্ভুত এক রাসায়নিক পদার্থের নাম করেন ও তার গুণাগুণ বুঝিয়ে দেন।

—"আর, ওটাতে?"

আবার একটা অচেনা নাম ও গুণাগুণের ব্যাখ্যা।

—"তাকের ওপরে শিশি-বোতলের সঙ্গে এই থার্মসফ্লাস্কটাতে কি আছে মি দত্ত?"

—"লিকউইড এয়ার!"

—"লিকউইড এয়ার—অর্থাৎ তরল বা দ্রবীভূত বাতাস? হাওয়াকেও আপনারা জলে পরিণত করেছেন—আশ্চর্য।"

—"কিছুই আশ্চর্য নয় হেমন্তবাবু। জল দেখা যায়, বাতাস দেখা যায় না। কিন্তু দুই-ই প্রবাহিত হয়, তাই বিজ্ঞানে বাতাসকেও বলে তরল জিনিস বা fluid!"

সতীশবাবু এতক্ষণ পরে বললেন, "কিন্তু fluid হলেও জলের মতো এই দ্রবীভূত বাতাসকে দেখা যায় না তো?"

—"দেখা যায় বৈকি, খুব দেখা যায়। বাতাস একরকম গ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। বাতাসের তাপ যখন zero-র দুশো সত্তর

ডিগ্রী নিচে নামানো যায়, বাতাস তখনি হয় দ্রবীভূত। তাকে তখন দেখতে হয় একরকম জলের মতই, আর জলের মতই তাকে এক পাত্র থেকে আর-এক পাত্রে ঢালা চলে। দ্রবীভূত বাতাস বিষম ঠাণ্ডা। কিন্তু তার অবশিষ্ট তাপ আরও নিচে নামিয়ে আনলে সেটা জমে অধিকতর শীতল বরফ হয়ে পড়বে।"

আমি বিস্মিত-স্বরে বললুম, "জলীয় বাতাস শুনেই চমকে গিয়েছি, তারপরেও বাতাস হবে আবার নিরেট বরফ! অবাক কাণ্ড! তাকে তখন দেখাবে কি-রকম?"

—"অবিকল বরফের মতই। যদিও সেটা হবে এমন ঠাণ্ডা যে, সাধারণ বরফকেও তখন গরম বলা যেতে পারবে ঐ বাতাস-বরফের সাহায্যে রাসায়নিকরা—বাতাসের চেয়ে তো বটেই, পৃথিবীর সব-চেয়ে হাল্কা গ্যাসকে অর্থাৎ হাইড্রোজেনকে দ্রবীভূত করতে পারেন। আর তারপরের ধাপ হচ্ছে বরফে পরিণত হাইড্রোজেন।"

সতীশবাবু বললেন, "ফ্লাস্কের মুখে ছিপি না দিয়ে, তুলোর নুটি এঁটে রেখেছেন কেন মিঃ দত্ত? বাতাস দ্রবীভূত হলেও পালিয়ে যেতে পারে তো?"

"দ্রবীভূত বাতাসও উপে যায় বটে। কিন্তু ফ্লাস্কের মুখে তুলোর বদলে ছিপি এঁটে রাখলে, দ্রবীভূত বাতাস দড়াম করে পাত্র ফেটে বেরিয়ে আসতে পারে।"

হেমন্ত হাসিমুখে বললে, "যাক, আমাদের ঋণ গায়ে-গায়ে শোধ হয়ে গেল মিঃ দত্ত! আমি শোনালুম সাধারণ ধুলোর কাহিনী! অবশ্য গুণানুসারে আপনারই কৃতিত্ব বেশি। কিন্তু এই দ্রবীভূত বাতাস আপনার কোন কাজে লাগে?"

—"আমরা—অর্থাৎ রাসায়নিকরা—দ্রবীভূত বাতাসকে ব্যবহার করি অন্য জিনিসকে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা করবার জন্যে। একে অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে বিস্ফোরকরূপেও কাজে লাগানো চলে। কিন্তু বাতাসকেও দ্রবীভূত করা হচ্ছে বহু ব্যয়সাধ্য, ধনী ছাড়া আর কেউ

তা পারে না। রসায়নকে সখ করে আমি প্রায় ফকির হতে বসেছি।"

হেমন্ত বললে, "আজ রাত হয়ে গেল মিঃ দত্ত, আপনার দামি সময় আর নষ্ট করব না। কিন্তু আগে-থাকতে এটাও জানিয়ে রাখছি, আপনার মতন বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য যখন হল, তখন সহজে আপনাকে মুক্তি দেব না। আমি আবার এসে নতুন নতুন আশ্চর্য কথা শুনে যাব।"

মিঃ দত্ত একমুখ হেসে বললেন, "বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। অবশ্যই আসবেন, আমার বাড়িতে আপনার অবারিত দ্বার জানবেন!"

ঘরের ভিতর থেকে বেরুতে বেরুতে হেমন্ত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "বাতাসের বরফ, বাতাসের বরফ! ধন্য বিজ্ঞান ধন্য! এবারে এসে হয়তো খেয়ে যাব, গন্ধের বরফি!"

মিঃ দত্ত হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "না হেমন্তবাবু আপনাকে অতটা বেশি সৌভাগ্যের অধিকারী বোধহয় করতে পারব না!"

পথ দিয়ে আসতে আসতে হেমন্ত আবার সেই নতুন বাড়িখানার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি ভয় পেয়ে বললুম, "কি হে, আবার তুমি স্বদেশী আর বিদেশী স্থাপত্য নিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করবে নাকি?"

—"না, না, নির্ভয় হও! এ বাড়িখানা হচ্ছে আমার চক্ষুশূল।" বলেই সে হন হন করে এগিয়ে চলল।

বড় রাস্তায় পড়ে সতীশবাবু বললেন, "এইবার আমাকে থানার দিকে ফিরতে হবে। মিঃ দত্তকে কেমন লাগল?"

হেমন্ত উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, "চমৎকার, চমৎকার! অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লোক, তিলমাত্র পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই। একটু থেমে স্বর বদলে আবার বললে, সতীশবাবু আপনাকে একটি ফর্দ উপহার দিচ্ছি, কাজে লাগে কি না, দেখবেন।"

—"উপহার? কি উপহার দেবেন?"

—"একখানা কাগজ। মতিবাবুর যে নোটগুলো চুরি গেছে এতে তাদের নম্বরগুলো টোকা আছে। এই নিন।"

অতিশয় বিস্মিতভাবে সতীশবাবু বললেন, "অ্যাঁ! এ কাগজ আপনি কোথায় পেলেন?"

—"কোন কথা জিজ্ঞাসা না করলেই বাধিত হব। দিন দুই-তিন বাদে সবই জানতে পারবেন। চল রবীন!"

হতভম্ব সতীশবাবুকে সেইখানে রেখে আমরা ধরলুম বাড়ির পথ।

খানিক দূর এসে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "এ-কাগজের কথা তুমি আমাকেও বলনি কেন?"

হেমন্ত বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে বললে, "তোমাকে বলে লাভ? তুমি তো একটি আস্ত গাড়ল!"

—"গাড়ল!"

—হ্যাঁ, প্রথম শ্রেণীর গর্দভ। এখানে আমার শুকনো কাদা নিয়ে পরীক্ষার কথা কে তোমাকে বলতে বলেছিল?"

—"তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে?"

—"তা নয়তো কি? তোমাকে আগেই বলিনি, এ-মামলায় আমি পুলিসকে আমার হাতের তাস দেখাতে চাই না?"

—"মাপ কর ভাই, ভুলে গিয়েছিলুম!"

হেমন্ত হেসে ফেলে বললে, "আচ্ছা, এ যাত্রা তোমাকে মাপ করা গেল!"

—"কিন্তু ঐ কাগজখানা?"

—"কৌতূহলে তুমিও তো আমার চেয়ে কম যাও না দেখছি! ও-কাগজ সম্বন্ধে কোন রহস্যই নেই। আজ সকালে মতিবাবুর ডায়ারিতেই পেয়েছি নোটের নম্বরগুলো। যে-পাতায় নম্বরগুলো তোলা ছিল, খুনের দিনেই সেখানা লেখা হয়েছে। অর্থাৎ মতিবাবু ব্যাঙ্ক থেকে বৈকালে ফিরে এসেই নোটের নম্বর টুকে রেখেছিলেন।…হুঁ, মতিবাবু দেখছি, খুব সাবধানী লোক ছিলেন।"

কালকের ও আজকের রাতে কত তফাৎ। কাল ছিল অভাবিত কুয়াশায় চারিদিক কালো, আর আজ আকাশ থেকে শহরের মাথায় ঝরে পড়েছে সোনার চাঁদের আলো।

হেমন্তও সেটা লক্ষ্য করে বললে, "আজ তিন দিনে প্রকৃতিদেবী তিনরকম বেশ পরিবর্তন করলেন। পরশু দেখলুম শীতের বাদল, কাল দেখলুম শীতের কুয়াশা, আর আজ দেখছি শীতের জ্যোৎস্না। রবীন তারপর আমাদের পিছনে পিছনে ও আবার কাকে দেখছি।"

ফিরে দেখলুম, মতিবাবুর ভাগনে বিনোদবাবু আসছেন। তাঁর চেহারা যেন আরও শুকনো, রোগা ও ছন্নছাড়ার মতো বলে বোধ হল।

হেমন্ত বললে, "আরে আরে, বিনোদবাবু যে! এদিকে কি মনে করে?"

—"কে, হেমন্তবাবু? রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় পথে পায়চারি করছি। আজকাল রোজ সন্ধ্যায় বিষম মাথা ধরছে! কিন্তু আপনারা এখানে কেন?"

—"মিঃ দত্ত আজ আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন।"

—"ও, তাই নাকি? আচ্ছা আসি।" বলেই তিনি ফুটপাথ দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। তারপর আবার ফিরে এসে বললেন, "হেমন্তবাবু, মিঃ দত্ত কি আমার সম্বন্ধে কোন কথা আপনার কাছে বলেছেন?"

—"না। কিন্তু আপনার এমন সন্দেহের কারণ কি?"

বিনোদবাবু কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, "দেখুন হেমন্তবাবু, মিঃ দত্ত আমার হতভাগ্য মামার বিশেষ বন্ধু ছিলেন বটে, কিন্তু আমাকে বোধহয় তিনি পছন্দ করেন না। মামার মৃত্যুর দিনে তাঁর সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হয়েছিলো, এ-কথা আপনারা জানেন। কিন্তু তার আসল কারণ কি, সেটা আপনারা শুনেছেন?"

—"আপনি রেস খেলেন বলে মতিবাবু আপনার ওপরে বিরক্ত হয়েছিলেন তো?"

"হ্যাঁ, আর মামার কাছে সে খবর দিয়েছিলেন ঐ মিঃ দত্তই। এটা কি তাঁর উচিত হয়েছে?"

—"কেন উচিত হয় নি? আপনি অসৎ সংসর্গে অধঃপাতে যাচ্ছিলেন, তাই তিনি মতিবাবুকে সাবধান করে দিয়েছিলেন আপনার মঙ্গলের জন্যে।"

বিনোদবাবু কেবল বললেন, "ও!"

হেমন্ত বললে, "আপনাকে আমিও একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

—"করুন।"

—"মতিবাবুর হত্যার জন্যে কারুর ওপর আপনার সন্দেহ হয় কি?"

—"সন্দেহ? কারুর ওপরে সন্দেহ করবার অধিকার আমার নেই।" বলেই বিনোদবাবু দ্রুতপদে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

আমরা আবার অগ্রসর হলুম। যেতে যেতে আমি বার বার পিছন ফিরে তাকাতে লাগলুম। কিন্তু বিনোদবাবু একেবারেই অদৃশ্য!

হেমন্ত উচ্চহাস্য করে বললে, "রবীন, তুমি বারবার কেন যে পিছন ফিরে তাকাচ্ছ, সে-কথা আমি বলতে পারি।"

—"বল দেখি।"

—"তোমার মনের ভাবটা হচ্ছে এইরকম: 'কাল রাতে পথে যখন আমাদের আর পাহারাওয়ালার ওপরে আক্রমণ হয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই ঘটনাস্থলের কাছে বিনোদকে দেখা গিয়েছিল। আজও হল আমাদের পিছনে বিনোদের আকস্মিক আবির্ভাব। এর মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কি না—বিনোদ আবার লুকিয়ে আমাদের পিছনে আসছে কিনা? কেমন এই তো?"

হেমন্তর কথা যে সত্য, সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিনোদলালের অন্তর্ধান

পরদিন বৈকালে বসে বসে হেমন্তের সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময়ে সতীশবাবু এসে ঢুকলেন ঘরের ভিতরে।

হেমন্ত বললে, "হঠাৎ এ-সময়ে? কোন খবর-টবর আছে নাকি?"

সতীশবাবু চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললেন, "ভালো মন্দ দুই খবরই আছে।"

—"যথা?"

—"সেই ভাঙা কাঁচের গেলাসের ওপরে আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়াছে।"

—"হুঁ; সুখবর বটে।"

—"আমাদের পুরানো দপ্তর থেকে এক আসামীর আঙুলের ছাপ বেরিয়েছে। দুই ছাপই এক আঙুলের।"

সাগ্রহে আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে হেমন্ত বললে, "কে সেই আসামী?"

—"একে একে সব বলছি। বিশ বছর আগে জাল নোট চালাবার চেষ্টা করে হরিহর নামে একটা লোক ধরা পড়েছিল। কিন্তু মামলা বিচারাধীন, সেই সময়েই একদিন সে হাজত থেকে সরে পড়েছিল পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে। তারই আঙুলের ছাপের সঙ্গে গেলাসের আঙুলের ছাপ মিলে গেল অবিকল।"

—"সেই হরিহর এখন কোথায়?"

—"কেউ তা জানে না। হয়তো তার আসল নাম হরিহরই নয়। যখন সে হাজতে ছিল, তখন অনেক চেষ্টা করেও পুলিস তার যথার্থ

পরিচয় আদায় করতে পারে নি। তবে তার কথাবার্তা, হাব-ভাব ও ব্যবহারে এইটুকু অনুমান করা গিয়েছিল যে, সে ভালো ঘরের ছেলে আর সুশিক্ষিত। পুলিস যার-পর-নাই খোঁজ নিয়েও আর হরিহরের কোন পাত্তাই পায় নি। আজ বিশ বছর পরে হরিহরের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, ভাঙা গেলাসের কাঁচে। জালিয়াত অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে এসে হয়েছে হত্যাকারী। কিন্তু আবার সে অদৃশ্য হয়েছে।"

—"হরিহরের ছবি আপনাদের কাছে নেই? সে নাম বদলাতে পারে, চেহারা বদলাতে পারবে না তো?"

—"ছবি নিশ্চয়ই আছে। এই নিন তার লিপি।"

সতীশবাবু একখানা ফোটো বার করে টেবিলের উপরে রাখলেন। আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলুম, একটি অত্যন্ত শান্তশিষ্ট যুবকের চেহারা। চোখ বড় বড়, নাক টিকলো, দাড়ি-গোঁফ কামানো, মাথায় লম্বা চুল।

ছবিখানা খানিকক্ষণ মন দিয়ে দেখে হেমন্ত বললে, "বিশ বছর আগে হরিহরের বয়স ছিল কত?"

—"বাইশ-চব্বিশের বেশি নয়।"

—"তাহলে আজ তার বয়স হবে বিয়াল্লিশ কি চুয়াল্লিশ, এতদিনে তার চেহারার যথেষ্ট পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। আচ্ছা ছবিখানা আজ আমার কাছে থাক।"

আমি বললুম, "মতিবাবুকে খুন করতে এসেছিল দুজন লোক। বোঝা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে হরিহর; কিন্তু আর একজন কে?"

সতীশবাবু ম্লান হাসি হেসে বললেন, "সেটাও আমরা আন্দাজ করতে পেরেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেও পুলিসের হাত ছাড়িয়ে লম্বা দিয়েছে।"

হেমন্ত সবিস্ময়ে বললে, "পালিয়েছে! কে পালিয়েছে?"

—"শুনুন। মতিবাবুর চোরাই-নোটের নম্বরগুলো আপনি কি উপায়ে সংগ্রহ করেছেন, জানি না; কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল,

কারেন্সি থেকে আজই কেউ এমন দশখানা হাজার টাকার নোট ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে, যার নম্বরগুলো আছে আপনারই দেওয়া কাগজে।"

—"বলেন কি মশাই ?"

"—হ্যাঁ। তারপরেই খবর পেলুম, আজ সকালে বিনোদলালকেও কারেন্সি অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে।"

—"বিনোদবাবু কি বলেন ?"

"আপাতত বিনোদের মতামত জানবার কোন উপায়ই আর নেই।"

—মানে ?"

—"বিনোদ পালিয়ে গেছে।"

—"পালিয়ে গেছে! বিনোদ পালিয়ে গেছে ?" উত্তেজিতভাবে হেমন্ত চেয়ারের উপরে সিধে হয়ে বসল।

—"একেবারে নিরুদ্দেশ। কারেন্সি অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে এসে আবার কখন যে কোন পথ দিয়ে সে অদৃশ্য হয়েছে, কেউ তা দেখতে পায় নি! বিনোদের নামে ওয়ারেণ্ট আমি তৈরি করেই রেখে-ছিলুম, কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে দেখি, খাঁচার ভেতরে পাখি আর নেই।"

হেমন্ত অর্ধ-স্বগত স্বরে বললে, "বিনোদ পলাতক! বিনোদকে দেখা গেছে, কারেন্সিতে ?"

অনুতাপ-ভরা কণ্ঠে সতীশবাবু বললেন, "কি অন্যায়ই করেছি! গোড়া থেকেই ওর ওপরে আমার সন্দেহ হয়েছিল। তখনি যদি গ্রেপ্তার করতুম।"

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলুম যে, পালিয়ে গিয়ে বিনোদ নিজেই নিজের অপরাধটা ভালো করে প্রমাণিত করলে। কিন্তু এই বীভৎস ব্যাপারে তার হাত ছিল কতখানি ? সে কি হরিহরেরই হুকুম তামিল করেছিল ? হরিহরও কি তার সঙ্গেই দেশছাড়া হয়েছে ?

হেমন্ত হঠাৎ দৃঢ়স্বরে বললে, "নিশ্চিন্ত হন সতীশবাবু। আমাকে আরো দিন-তিনেক সময় দিন। তার ভেতরেই বোধহয় এ-মামলাটার

একটা কিনারা করে ফেলতে পারব।”

সতীশবাবু বললেন, “এ-মামলার একরকম কিনারা তো করে এনেছিই, পাজী বিনোদ গা-ঢাকা দিয়েই তো যত মুশকিলে ফেললে।”

হেমন্ত বললে, “কিছু ভাববেন না সতীশবাবু, বিনোদলালকে আবার আপনার হাতের কাছে পাবেন খুব শীঘ্রই। পালিয়ে সে যাবে কোথায়? তাকে আপনার মুঠোর ভেতর এনে দেব—এই আমার পণ!”

আরো কিছুক্ষণ কথা কয়ে সতীশবাবু নিলেন বিদায়। হেমন্ত চিন্তিত মনে চুপ করে বসে রইল।

আমি বাড়ি যাবার জন্যে যখন গাত্রোত্থান করলুম, তখন সে বললে, “রবীন, আজ সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে আর সিনেমায় যেতে পারব না। আমার হাতে আজ অনেক কাজ আছে।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আবার খুন

প্রভাতী চা পান করতে করতে হেমন্তের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল, কুমারটুলির বিখ্যাত খ্যাঁদা বা খোকা-গুণ্ডার কথা।

হেমন্ত বলছিল, “এটা তো ইংরেজের আদালতে প্রমাণিত একটা সত্য ঘটনা! বাংলা, ইংরেজি সব কাগজেই এর বিবরণ বেরিয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখ রবীন, খ্যাঁদা আর তার দলবল সন্ধ্যার পরেই গরাণহাটা থেকে একটা হতভাগ্য লোককে প্রকাশ্যভাবে বন্দী করে কলকাতার জনতাবহুল পথ দিয়ে খানিক খোলা ট্যাক্সিতে চড়ে, আর খানিক পায়ে হেঁটে শোভাবাজার ছাড়িয়ে এল, পথের ওপরেই তাকে খুন করলে; তার কাটামুণ্ড নিয়ে আবার বটতলায় এসে এক বন্ধুকে দেখিয়ে গেল; তারপর মুণ্ডটা গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়ে এল—অথচ কেউ তাকে কোন

বাধা দিতে পারলে না, পথিকরাও নয়, পুলিসও নয়! কোন উপন্যাসে এমন ঘটনা বেরুলে, সমালোচকরা অস্বাভাবিক গাঁজাখুরি বলে চেঁচিয়ে ফাটাতেন সারা আকাশখানা! কিন্তু এখন তাঁরা কি বলবেন?"

এমন সময় অত্যন্ত হন্তদন্তের মতো সতীশবাবুর সশব্দে আবির্ভাব!

হেমন্ত বললে, "কি হয়েছে? আপনার চেহারার অবস্থা তো ভাল নয়?"

—"আবার খুন!" বলে সতীশবাবু ধপাস করে চেয়ারের উপরে বসে পড়লেন।

হেমন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "খুন?"

—"হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ! আবার খুন হয়েছে, আর খুনী নিশ্চয়ই সেই বিনোদ।"

—"আপনি কি বলছেন সতীশবাবু? বিনোদ খুন করেছে? কাকে? মিঃ দত্তকে নয় তো?"

—"মিঃ দত্তকে সে কেন খুন করবে?"

—"তার ওপরে বিনোদ মোটেই খুশি নয়।"

—"না হেমন্তবাবু, খুন হয়েছে একটা নতুন লোক—কিন্তু মতিবাবুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে লিপ্ত আছে বলে তাকেও আমরা খুঁজছিলুম।"

হেমন্ত আবার বসে পড়ে বললে, "ভালো করে সব কথা গুছিয়ে বলুন।"

—"বলি। ভোরবেলায় খবর পেলুম, গঙ্গার ধারে একটা মড়া পড়ে আছে। দেখতে গেলুম, এমন প্রায়ই যেতে হয়, কারণ, গঙ্গার ধারে লাস পাওয়া নতুন কথা নয়। কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়েই আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল! একটা জোয়ান লোকের লাস, আর সে মারা পড়েছে ঠিক মতিবাবুর মতই! মুখে সেই আতঙ্ক, বিস্ময় ও যন্ত্রণার চিহ্ন, আর গলায় সেই সাংঘাতিক নীল দাগ।"

—"নীল দাগ!"

—"হ্যাঁ। তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। পরীক্ষা করে

বোঝা গেল, লোকটাকে অন্য কোথাও খুন করে তার লাসটাকে এখানে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে। লোকটাকে এখনো কেউ সনাক্ত করতে আসে নি। গায়ে পাঞ্জাবী, তার পকেটে পেলুম একখানা ছোরা—সুতরাং মানুষটি গোবেচারা ছিল না। পরনে পাজামা, পায়ে রবারের জুতো।"

"যা সন্দেহ করছেন, তা মিথ্যে নয়। গলায় নীল দাগের সঙ্গে পায়ে রবারের জুতো দেখে আমারও সন্দেহ জেগে উঠল। মতিবাবুর বাড়িতে হত্যাকারীদের একজনের যে রবারের জুতোর মাপ আমরা নিয়েছিলুম, তার সঙ্গে এই জুতোর মাপ একেবারে ঠিকঠাক মিলে গেল!"

—"এই লোকটাই সেই ভূতপূর্ব জালিয়াত হরিহর নয় তো?"

—"না। এর আঙুলের ছাপ অন্যরকম।"

—"তাহলে মতিবাবুর দুই খুনীর একজনের সন্ধান পাওয়া গেল?"

—"তাইতো মনে হচ্ছে। আর এক খুনী নিশ্চয়ই বিনোদলাল। কিন্তু সে তো পলাতক!"

—"তাহলে এই নতুন হত্যার জন্যে কার ওপরে আপনার সন্দেহ হয়?"

—"ঐ বিনোদের ওপরেই। হেমন্তবাবু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিনোদ এই কলকাতাতেই গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে। খুব সম্ভব, তার সঙ্গে এই লোকটা চোরাই-নোটের অংশ নিয়ে গোলমাল করেছিল, কিংবা এ তাকে কোন রকম ভয় দেখিয়েছিল, তাই বিনোদ গলা টিপে একে বধ করে নিজের পথ সাফ করেছে!"

অল্পক্ষণ ভেবে হেমন্ত বললে, "কেসটা দাঁড় করিয়েছেন মন্দ নয়, কেবল ধোপে টিকলে হয়।"

—"কেন?"

—"তাহলে এর মধ্যে হরিহরের স্থান কোথায়?"

—"সেইটাই ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো পরে বোঝা যাবে। আপনি কি লাসটাকে দেখবেন?"

হেমন্ত তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে বললে, "দরকার কি ? আমি যে ঘটনার মালা গেঁথেছি, এটা হচ্ছে তারই একটা ঘটনামাত্র। এর পরেও যদি দু-দশটা খুন হয় তাহলেও আমার ঘটনার মালা নতুন করে গাঁথতে হবে না।" একটু থেমে, হঠাৎ স্বর বদলে সে আবার বললে, "সতীশবাবু, খুনীকে আপনি আজকেই গ্রেপ্তার করতে চান ?"

সতীশবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "সে কি ! বিনোদ কোথায় আছে, আপনি জানেন ?"

—"তা নিয়ে আপাতত আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। কারণ, আমি তো আগেই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, বিনোদকে আমি আবার আবিষ্কার করবই ! আপাতত বিনোদ সম্বন্ধে সমস্ত ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এখন যা বলি, মন দিয়ে শুনুন। আজ বৈকালে রবীনকে নিয়ে আমি মতিবাবুর শয়নগৃহে যেতে চাই। মিঃ দত্তকেও দরকার হবে, তিনিও এই খুনী-ধরা ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।... আপনাকে আরো যা যা করতে হবে বলছি, পাশের ঘরে চলুন। সেই-সঙ্গে একটা নতুন জিনিসও দেখাব।"

সতীশবাবুর সঙ্গে আমিও পাশের ঘরে যাব বলে ওঠবার উপক্রম করছি, হেমন্ত হেসে উঠে বললে, "না রবীন, কৌতূহল দমন কর—তুমি এই ঘরেই থাকো। তাহলে আজ যখন এই রহস্য-নাট্যের শেষ দৃশ্যের উপরে পড়বে যবনিকা, তখন তার বিস্ময়টা তুমি রীতিমতো উপভোগ করতে পারবে।"

সতীশবাবুকে নিয়ে হেমন্ত তার পরীক্ষা-ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল —আমি একলা বিরক্ত মনে চুপ করে বসে রইলুম।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে ওদের দুজনের মধ্যে ফিস ফাস করে কি কথাবার্তা হল, কিছুই শুনতে পেলুম না—যদিও শোনবার জন্যে আমার প্রাণ করছিল ছটফট !

শেষের দিকে কেবল একবার শুনতে পেলুম, সতীশবাবু সবিস্ময়ে বলছেন "কি আশ্চর্য !"

বিস্ময়ের কারণটা আবিষ্কার করতে না পেরে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল, এবং এই লুকোচুরির জন্যে হেমন্তকে অভিশাপ দিতে লাগলুম বারংবার!

নবম পরিচ্ছেদ

দস্তানার পুনরাবির্ভাব

বৈকালে হেমন্তের সঙ্গে আমি আবার সেই ভয়াবহ ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। মতিবাবুর শয়ন ঘর।

সারা বাড়িটা ঠিক সমাধির মতন নীরব। লোকজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তারা সবাই যেন ভয়ে দমবন্ধ করে একেবারে চুপ মেরে গেছে।

মতিবাবুর শূন্য শয্যার দিকে তাকিয়ে মনের ভিতরটা খচ খচ করতে লাগল। এই তো মানুষের জীবন। কত সাধে পাতে নরম বিছানা, কিন্তু শোবার আগেই হঠাৎ বেজে ওঠে মহাকালের ঘণ্টা—ঢং ঢং ঢং!

খানিক পরেই মিঃ দত্ত এসে হাজির!

হেমন্ত বললে, "আসুন মিঃ দত্ত, নমস্কার! আজও আর-একবার আপনাকে কষ্ট দিলুম।"

—"কষ্ট? কিছুমাত্র না! আপনাদের সাহায্য করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। বলুন, আমায় কি করতে হবে?"

—"দু-চারটে কথা জানতে চাই। নতুন খুনের কাহিনীটা শুনেছেন তো?"

—"সতীশবাবুর মুখে শুনলুম। এ কি ভীষণ ব্যাপার, ভয়ে আমার বুক কাঁপছে মশাই!"

—"বিনোদবাবু পলাতক।"

—"সব শুনেছি। বিশেষ সন্দেহজনক।"

—"কিন্তু খুনীকে আমি গ্রেপ্তার করবই।"

—"না হেমন্তবাবু, বিনোদ যে এমন ভয়াবহ কাজ করতে পারে, এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।"

—"মানুষ চেনা বড় কঠিন মিঃ দত্ত, বড়ই কঠিন। কিন্তু দু-দুটো খুন করে খুনী পালিয়ে যাবে কোথায়? আমার বিশ্বাস সে এইখানেই আছে।"

আশ্চর্য হয়ে মিঃ দত্ত বললেন, "কোথায়?"

—"এই বাড়িতেই! মিঃ দত্ত, এ-বাড়িখানা যেমন মস্ত, তেমনি সেকেলে। এখানে আনাগোনা করছেন আপনি অনেকদিন। আপনি কি বলতে পারেন, এ-বাড়ির কোথাও কোন চোর-কুঠরী আছে কি না? সেকেলে বাড়িতে প্রায় চোর-কুঠরী থাকত।"

"আপনি কি মনে করেন, বিনোদ এই বাড়িতেই লুকিয়ে আছে? তা কেমন করে হবে? না মশাই, আমি কোন চোর-কুঠরীর সন্ধান-টন্ধান জানি না।"

—"মতিবাবুর মুখেও কোনদিন শোনেন নি?"

—"না।"

—"আচ্ছা, আমার কাছে ভালো করে এই বাড়িটার বর্ণনা করতে পারেন?"

—"তা নিশ্চয়ই পারি! এ বাড়ির সবটাই আছে আমার নখদর্পণে!"

তারপর প্রায় আধঘণ্টা ধরে দু-জনের মধ্যে চলল প্রশ্নোত্তরের ঘটা। শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠলুম। মনে হল সমস্তটাই যেন অর্থহীন। বিনোদ নিশ্চয়ই এ-বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে নেই—সে এমন কাঁচা ছেলে নয়! হেমন্তের ধারণা ভুল।

হঠাৎ একজন পাহারাওয়ালা এসে জানালে, ইনস্পেক্টারবাবুর কাছ থেকে একজন হেমন্তবাবুকে ডাকতে এসেছে!

—"আমাকে? আমাকে আবার কি দরকার? বল-গে যাও, আমি এখন ভারী ব্যস্ত। আচ্ছা থাক, আমি নিজেই যাচ্ছি। এস তো রবীন,

খবরটা কি শুনে আসি।"

আমরা নিচে নেমে গেলুম। কিন্তু নিচে গিয়ে কারুকেই দেখতে পেলুম না।

হেমন্ত বললে, "কে ডাকতে এসেছে ? গেল কোথায় ?"

মিনিট-ছয় অপেক্ষা করেও কারুর দেখা পাওয়া গেল না।

হেমন্ত বিরক্ত হয়ে বললে, "চুলোয় যাক ইনস্পেক্টারবাবুর লোক। আমার এখন অনেক কাজ। চল, আবার উপরেই যাই।"

ঘরে ঢুকে হেমন্ত আবার টেবিলের সামনে গিয়ে বসে পড়ল। মিঃ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এসেছিল ?"

"কেউ না। কেবল মিছে সময় নষ্ট হল। হ্যাঁ, কি বলছিলেন ? এ-বাড়ির সিঁড়ির তলায় চোর-কুঠরীর মতো একটা ঘর আছে, কিন্তু সে-ঘরে কয়লা থাকে ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তাহলে আপনার মতে বিনোদ এখানে নেই ?"

—"না।"

মিনিট পাঁচেক ধরে হেমন্ত গম্ভীর মুখে ভাবতে লাগল।

তারপর ঘরের বাইরে সিঁড়ির উপরে শুনলুম ভারি ভারি পায়ের শব্দ! দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন হাসিমুখে সতীশবাবু।

হেমন্ত বললে, "এই যে, আসুন! ব্যাপার কি সতীশবাবু ? একমুখ হাসি যে ?"

মিঃ দত্ত আগ্রহ-ভরে বললেন, বিনোদের খোঁজ-টোজ পেয়েছেন বুঝি ?"

—"না, পেয়েছি খালি এই জিনিস দুটো।" বলেই সতীশবাবু পকেট থেকে বার করলেন একজোড়া সাদা দস্তানা।

হেমন্ত দস্তানা দুটো সতীশবাবুর হাত থেকে নিয়ে পরীক্ষা করতে-করতে বললে, "হুঁ"। এর একটা দস্তানা আমি যে চিনি! রক্তের দাগ

আর নেই বটে, কিন্তু কাঁচ দিয়ে কাটা অংশটা এখনো তেমনই আছে!"

মিঃ দত্ত উত্তেজিত স্বরে বললেন, "তাই নাকি? কই দেখি—দেখি"

—"এই নিন।"

মিঃ দত্ত দস্তানা নেবার জন্যে দুটো হাত ব্যাগ্রভাবে বাড়িয়ে দিলেন —সঙ্গে সঙ্গে হেমন্ত দস্তানা ফেলে নিজের দুহাতে তাঁর হাত দুখানা জোরে চেপে ধরলে এবং পরমুহূর্তেই সতীশবাবু টপ করে তাঁর জোড়া হাতে পরিয়ে দিলেন হাতকড়ি।

বিস্ময়ে ও ক্রোধে অভিভূত হয়ে মিঃ দত্ত কয়েক মুহূর্ত একটাও কথা কইতে পারলেন না। তারপর চিৎকার করে বললেন, "হেমন্তবাবু! এ-সব কি প্রহসন?"

হেমন্ত বললে, "প্রহসন নয় হরিহর, বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য!"

—"হরিহর! কে হরিহর?"

—"তুমি হরিও হতে পারো, হরও হতে পারো, দত্তও হতে পারো! কোন্‌টা তোমার আসল নাম, কেউ জানে না!"

সতীশবাবু কঠোর স্বরে বললেন, "মিঃ দত্ত, মতিবাবুকে খুন আর আশী হাজার টাকা চুরির অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলুম।"

—"কোন্ প্রমাণে?"

হেমন্ত বললে, "দত্ত, প্রমাণ কি একটা আছে? আজও তুমি মতিবাবুর টানা থেকে মতিবাবুরই চাবি দিয়ে যে চল্লিশ হাজার টাকার হীরে মুক্তো, পান্না-চুনি চুরি করেছ, সে-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। সতীশবাবু, দত্তের জামা-কাপড় খুঁজে দেখুন তো।"

মিঃ দত্ত বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সতীশবাবু তাঁকে ধরে একবার ঝাঁকানি দিতেই তিনি ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। তাঁর পকেটের ভিতর থেকে সত্যসত্যই চোরাই মাল ও মতিবাবুর চাবির গোছা বেরিয়ে পড়ল।

হেমন্ত বললে, "দত্ত, এখন তুমি অপরাধ স্বীকার করবে?"

মিঃ দত্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

হেমন্ত বললে, "আচ্ছা, তবে আমার মুখ থেকেই তুমি নিজের কাহিনী শোনো। তোমাকে তো সেদিনও বলেছি দত্ত, এখনকার বৈজ্ঞানিক-পুলিসকে অপরাধীর স্বীকার-উক্তির ওপরে নির্ভর করতে হয় না। তুমি পাথরের মতো বোবা হয়ে থাকলেও ফাঁসিকাঠ তোমাকে ক্ষমা করবে না।"

দশম পরিচ্ছেদ

হেমন্তের কথা

সতীশবাবু, আমি সংক্ষেপেই সব বলব। যবনিকা-পতনের সময় বেশি বাক্যব্যয় ভালো নয়।

বিনোদের উপরে আমার একবারও সন্দেহ হয় নি—সে মাতাল ও জুয়াড়ি জেনেও। প্রথমত, মদ খাওয়া, জুয়াখেলা আর খুন করা এক-কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এটা ভালো করেই জানা গিয়েছে যে, খুনের সময় সে বাড়িতে ছিল না। সে যে সত্যসত্যই রাত বারোটা পর্যন্ত থিয়েটারে ছিল এবং তারপরে রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত ছিল হোটেলে, এর প্রমাণ আমি নিজে গিয়ে সংগ্রহ করেছি। হোটেল থেকে সে ফিরে এসেছিল প্রচণ্ড মাতাল হয়ে। সে এমন বেহুঁস হয়েছিল যে, খেতে গিয়ে জামা-কাপড়ে ঢেলেছিল মাংসের ঝোল আর জামা-কাপড়ের নানা জায়গা পুড়িয়ে ফেলেছিল সিগারেটের আগুনে। এমন চৈতন্যহীন মত্ত অবস্থায় কেউ এ-ভাবে এত চালাকি খেলিয়ে চুপি চুপি খুন করতে পারবে না। সতীশবাবু, কেবল এই একটিমাত্র কারণে বিনোদের উপর সন্দেহ করা আমাদের উচিত হয় নি। বেহুঁস মাতাল যে খুন করতে পারে না, এ-কথা আমি বলছি না। আমার মনে হচ্ছে, খুব বেশি মাতাল

এত গোপনে খুন করে সরে পড়তে পারে না।

তবু যে সে পালিয়ে গেছে, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, পুলিস, তাকে গ্রেপ্তার করতে চায়, কোনগতিকে এটা সে জানতে পেরেছিল, এবং পালাবার আগে সে যে কারেন্সি থেকে রাহাখরচের জন্যে নিজের কিছু টাকা ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, এটা আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি।

আপনারা সন্দেহ করেছিলেন, হত্যাকারী হচ্ছে বাড়ির লোক। কারণ, বাড়ির সব দরজা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ, এবং কুকুরটা চেনা লোক দেখেই চ্যাঁচায় নি। কিন্তু কাদামাখা পদচিহ্ন ও অচেনা রবারের জুতোর অস্তিত্ব দেখেই আমি বুঝেছিলুম, খুনীরা এসেছে বৃষ্টির পরে, রাস্তা থেকেই। আমি মনে মনে খুনের রাতের ঘটনাগুলো সাজিয়ে-ছিলুম এইভাবে (অবশ্য এটা জানবেন যে, সমস্ত প্লটটা একদিনে একসঙ্গে হঠাৎ আমার মনের ভিতরে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে নি। কোন ঘটনা-সূত্র পেয়েছি আগে, আবার গোড়ার দিককার কোন সূত্র পেয়েছি শেষের দিকেই।)

ধরুন, রাম আর শ্যাম মতিবাবুকে খুন করবে। রাত সাড়ে দশটার সময় মতিবাবুর বাড়িতে ঢোকবার দরজা বন্ধ হয়, খুনীরা সে খবর রাখে। রাত নটার সময় বৃষ্টি থামল। রাম ও শ্যাম ঘটনাস্থলে প্রবেশ করলে। রামের সঙ্গে মতিবাবুর চেনাশোনা ছিল। মতিবাবু তখনো শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করেন নি, পরিচিত লোক বলে রাম বিনা আহ্বানেই ভিতরে গিয়ে ঢোকে। কুকুরটাও রামকে বিলক্ষণ চিনত, তাই গোল-মাল করে নি। আর রামের সঙ্গে গিয়েছিল বলে, শ্যামকে দেখেও চ্যাঁচায় নি। শ্যাম নিশ্চয় দরজার বাইরে এক-আধ মিনিট অপেক্ষা করেছিল, কারণ তার জুতোর স্পষ্ট ছাপ আমরা পেয়েছি। চলন্ত লোকের পায়ের ছাপ আর দণ্ডায়মান লোকের পায়ের ছাপ একরকম হয় না, এটা সকলেই জানে। পরে রামের আহ্বানে শ্যামও তাকে সাহায্য করবার জন্যে ঘরের ভিতরে যায়। কাজ শেষ করে দু-জনেই

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। রাত সাড়ে-দশটার সময়ে দ্বারবান রাস্তার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয়। কাজেই বাইরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

রাম হচ্ছে মতিবাবুর বন্ধু, সে তাঁর সব অভ্যাসের কথা জানে। ডায়ারির ভিতরে মতিবাবুর কোন কোন গুপ্তকথা আছে, এটাও হয়তো তার অজানা ছিল না। খুনের রাতে হয়তো কোন কারণে ভয় পেয়ে বা সময়-অভাবে সে ডায়ারি পড়বার সুযোগ পায় নি। কিন্তু পরে যথাসময়ে কাজে লাগাতে পারবে বুঝে ডায়ারি আর চাবির গোছা নিয়ে পালায়। সে এ-বাড়ির বন্ধু, খুনের পরও এখানে তার প্রবেশ বন্ধ হবার ভয় নেই। খুব সম্ভব, রাম হ্যাণ্ডনোটে মতিবাবুর কাছ থেকে বারে বারে টাকা ধার করেছিল, তাই যাবার সময়ে নির্বিচারে সব হ্যাণ্ডনোটও সঙ্গে নিয়ে পালায়।

ঘটনাস্থলে এসে মতিবাবুর মৃতদেহ দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। লাসের গলায় ঐ নীল দাগটা কিসের? আঙুলের চাপে ঠিক ওরকম কালশিরা পড়ে না। তারপর লাসের পিঠের তলায় ঐ ভাঙা কাঁচের টুকরো থাকার মানে কি? ধস্তাধস্তি হল বিছানায়, কুঁজোর মুখ থেকে গেলাস কেন এখানে এল, কেনই-বা ভাঙল, কেনই-বা একজন খুনীর হাত কাটল?

আমার মন বললে, একজন খুনী গেলাসে কোন বিষাক্ত পদার্থ ঢেলে মতিবাবুর কাছে আসে। আর-একজন তাঁকে চেপে ধরে। মতিবাবুকে গেলাসের বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা হয়।—তিনি ধস্তাধস্তি করতে করতে বিছানা থেকে নেমে পড়েন এবং সেই মুহূর্তেই গেলাসের বিষ তাঁর গলায় ঢেলে দেওয়া হয়। সে বিষ এমন ভয়ানক যে, মতিবাবু চ্যাঁচাবারও সময় পান নি—কিন্তু তাঁর ধস্তাধস্তির চোটে খুনীর হাতের গেলাস ভেঙে খুনীর হাত কেটে যায়। তারপর ভাঙা কাঁচের ওপরে গিয়ে পড়ে মতিবাবুর দেহ। সব ব্যাপার ঘটে দু-এক সেকেণ্ডের মধ্যে।

বিষ যদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই মতিবাবুকে গলা টিপে

মারা হয় নি। কিন্তু ডাক্তাররা শবদেহে বিষের কোন অস্তিত্ব পান নি। তবু আমার সন্দেহ গেল না। কারণ ঐ ভাঙ্গা গেলাস! ওটা না থাকলে আমি ডাক্তারদের কথাই বিশ্বাস করতুম। কিন্তু গেলাস যখন পাওয়া গেছে, মতিবাবুকে নিশ্চয়ই কিছু খাওয়ানো হয়েছে। সেটা কি হতে পারে? হয়তো এমন কোন নতুন বিষ, ডাক্তাররা যার নাম জানেন না।

আপনারা কেউ লক্ষ্য করেন নি, কিন্তু দত্তকে প্রথম দিন দেখেই আমি লক্ষ্য করেছিলুম তার ডান হাতের ওপর ফ্লেসকলারের 'প্লাস্টার' লাগানো আছে। গোয়েন্দার প্রথম কর্তব্য, সকলকে সন্দেহ করা। খুনীর হাত বা আঙুল কেটেছে, তার প্রমাণ রয়েছে, দত্তের আঙুল কাটা! দত্ত হচ্ছে মতিবাবুর বন্ধু। তার এ-বাড়িতে অবাধ গতি এবং সে হচ্ছে রাসায়নিক, তার পক্ষে কোন অজানা বিষের অস্তিত্ব জানা অসম্ভব নয়। এ সন্দেহগুলো আমার মাথায় ঢুকেছিল; কিন্তু সন্দেহমাত্র।

ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত ঐ দস্তানার রহস্য নিয়েও অনেক ভেবেছিলুম। কারণ ওরকম পুরু পশমী দস্তানা কেউ হাতে পরে না, বিশেষ বাংলাদেশে। তবে প্রথমে কোনই সদুত্তর পাই নি।

পরে বুঝেছি, ঐ দস্তানাটা ছিল হরিহরের—অর্থাৎ দত্তের সঙ্গীর হাতেই। সেই-ই দস্তানা পরা হাতে কাঁচের গেলাসটা ধরেছিল, আর কাঁচের গেলাসটা তাকে দিয়েছিল, দত্তই। সেই সময়েই গেলাসের গায়ে দত্তের আঙুলের ছাপ পড়ে। কিংবা গেলাসটা ভাঙবার পর দত্ত তার ওপরে হাত দিয়েছিল।

কিন্তু রক্তমাখা দস্তানাটা কেন আমি নিয়ে যেতে চাই, সেটা জানবার জন্যে দত্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তারপর সে চলে যায় ও পথে আমরা আক্রান্ত হই। পাহারাওয়ালার কাছ থেকেও ভাঙা গেলাসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা হয়। আমার কাছে দস্তানা আর পাহারাওয়ালার কাছে ভাঙা গেলাস আছে, এ-কথা বাইরের লোকের মধ্যে কেবল

দত্তই জানত। সে-জন্যেও তাকে আমি সন্দেহ করি। কিন্তু কেবল সন্দেহ করে তো লাভ নেই, আগে দরকার প্রমাণ।

সতীশবাবু আমি যে দু'একটি বিষয় প্রথমে আপনার কাছে লুকিয়েছিলুম, পরে আজই সকালে আপনার কাছে প্রকাশ করেছি। ঘটনাস্থলের কর্দম-চূর্ণ পরীক্ষা করবার পর তার মধ্যে আমি কাদার সঙ্গে পেয়েছিলুম চূণ, সুরকি, বালি ও কয়লার গুঁড়ো। যেদিন আমরা দত্তের বাড়িতে চা খেতে যাই, সেদিন দেখলুম তার পাশেই রয়েছে কয়লার দোকান। গলির সেখানটায় মাটির সঙ্গে চুণ, বালি, সুরকি ও কয়লার গুঁড়ো ছড়ানো। তার দু-তিন খানা বাড়ির পরেই দত্তের বাড়ি। সুতরাং এখানকার মাটি মাড়িয়ে তাকে রোজই আনাগোনা করতে হয়। বৃষ্টিতে পথে কাদা হলে এখানকার কাদার চাপ যে তার জুতোর গোড়ালি আর সোলের ফাঁকে লেগে থাকবে, এটা বেশ সহজেই বোঝা যায়। ঐ নতুন বাড়ি ও কয়লার দোকানই দত্তের প্রতি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

দত্তের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে আমি সকলের অগোচরে সেই নতুন বাড়ির সামনের পথ থেকে একমুঠো ধুলো তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম। পরে পরীক্ষা করে দেখেছিলুম, আগেকার কর্দম-চুর্ণ আর এই একমুঠো ধুলোর উপাদানে কোন প্রভেদই নেই। মতিবাবুকে যে খুন করেছে, ঐ নতুন বাড়ির সামনেকার মাটি মাড়িয়েই তাকে যেতে হয়েছে।

তারপর দত্তের রসায়নাগার দেখে আমার সন্দেহ আরো বেড়ে উঠল। সেখানে আবিষ্কার করলুম, দ্রবীভূত বাতাস। আমি রসায়নশাস্ত্র পড়েছি, রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি ; কিন্তু সেদিন দত্তের সামনে ন্যাকা সেজেছিলুম, তার কাছ থেকে কথা আদায় করবার জন্যে।

ধাঁ করে আমার মাথায় একটা ভীষণ সত্যের ইঙ্গিত জাগল! দ্রবীভূত বাতাসকেই দত্ত বিষের মতো ব্যবহার করেছে! সতীশবাবু, আপনি হয়তো জানেন না, এই দ্রবীভূত বাতাসকে রাসায়নিকরা নানা নির্দোষ কাজে লাগান বটে, কিন্তু এ-জিনিস মানুষের মুখের ভিতরে

ঢেলে দিলে তখনি তার মৃত্যু হবে, অথচ মৃতদেহে তার কোন চিহ্নই পাওয়া যাবে না। কি মারাত্মক বুদ্ধি চাতুরী! ভাগ্যে দ্রবীভূত বাতাস হচ্ছে অত্যন্ত দুর্লভ জিনিস—সাধারণ হত্যাকারীর নাগালের বাইরে! নইলে দ্রবীভূত বাতাস মানুষের সমাজে বিভীষিকা সৃষ্টি করতে পারত।

দ্রবীভূত বাতাস এমন ভয়ানক ঠাণ্ডা যে, পরীক্ষাগারে হাতে পুরু দস্তানা না পরলে কাঁচের পাত্রে তাকে নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব। এইজন্যেই হত্যাকারী হাতে দস্তানা পরে কাঁচের গেলাসে দ্রবীভূত বাতাস ঢেলে মতিবাবুকে তা পান করতে বাধ্য করেছিল!

তারপর হরিহরের অস্তিত্ব আবিষ্কার। সতীশবাবু আমাকে যে ছবি দিয়েছিলেন, তাতে হরিহরের মুখে দাড়ি গোঁফ নেই, কিন্তু দত্তের মুখে গোঁপ আর ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। দত্তের বয়স এখন চল্লিশের ওপরে, তার মুখেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু হরিহরের মুখের সঙ্গে দত্তের মুখের কিছু কিছু সাদৃশ্য আমি পেয়েছিলুম। আমি কিছু কিছু ছবি আঁকতেও জানি। হরিহরের চোখ, নাক, ঠোঁট অনেকটা দত্তের মতই। তাই কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে হরিহরের ছবির মুখে বসিয়ে দিলুম দত্তের মতো গোঁফ আর ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি! ফল হল বিস্ময়কর! বুঝেছ রবীন, সতীশবাবু সেই ছবি দেখে সেখানাকে প্রথমে দত্তের ছবি বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তারপর আমাদের জানতে বাকি রইল না, আমাদের দত্তমশাই—থুড়ী, মিঃ দত্ত হচ্ছেন কোন দেশের বাজপাখি!

'লিকউইড এয়ার' দিয়ে দত্ত তার পাপ কাজের সঙ্গীকেও পাঠিয়ে দিয়েছে যমের বাড়ি। কি করে তাকে মারা হয়েছে, এখনো তা প্রকাশ পায় নি বটে, তবে হত্যাকারী যে দত্ত, তাতে আর সন্দেহ নেই। দ্রবীভূত বাতাসের এমন ভয়াবহ ব্যবহার পৃথিবীর আর কোন অপরাধী বোধহয় জানে না। দত্ত তাকে মেরেছে কেন? একজন সাক্ষী বা অংশীদার বা পথের কাঁটা সরাবার জন্যেই।

দত্ত জানত, আমি রসায়ন-শাস্ত্র নিয়ে অল্প-বিস্তর নাড়াচাড়া করি। তার ভয় হয়েছিল, এ-রকম অসাধারণ দস্তানা দেখে আমার মনে দ্রবী-

ভূত বাতাস সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত জাগা হয়তো অসম্ভব নয়। অপরাধীর মন কিনা! তাই উপর চালাকি করতে গিয়ে, দস্তানা কেড়ে নিয়ে আমার হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হয় মতিবাবুর ডায়ারিখানা!

আর একটু বাকি আছে। দত্তকে হাতে-নাতে ধরবার জন্যে আজ আমি এখানে ফাঁদ পেতেছিলুম! খুনীর পকেট থেকে ডায়ারি হস্তগত করেই আমি বুঝেছিলুম, খুনী যখন মতিবাবুর চাবি নিয়ে গেছে, তখন টেবিলের গুপ্তস্থান থেকে চল্লিশ হাজার টাকার হীরে-মুক্তো চুরি করার প্রথম সুযোগ সে কখনোই ছাড়বে না! দত্তের আবির্ভাবের আগেই আমি টেবিলের ডানদিকের টানার ফাঁকে এমনভাবে একটা আলপিন ঢুকিয়ে রেখেছিলুম যে, কেউ টানা খুললেই আলপিনটা সরে পড়ে যাবে।

তারপর দত্ত এল। পাহারাওয়ালাকে শেখানো ছিল, সে একটা বাজে কথা বলে আমাদের বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। দত্ত রইল ঘরে একা! মিনিট কয় পরে আমরা ফিরে এলুম। টেবিলের কাছে গিয়ে দেখি, টানার ফাঁকে আলপিন নেই। তখনি বোঝা গেল, দত্ত সুযোগের অপ-ব্যবহার করে নি!

এদিকে দত্ত যখন এখানে বসে আমার সঙ্গে কথা কইছে সতীশবাবু তখন গিয়েছেন দত্তের রসায়নাগার ও বাড়ি খানাতল্লাস করতে! তারি ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে দস্তানাজোড়া! ঐ দস্তনাও এই মামলায় এক বড় সাক্ষীর কাজ করবে।

দত্ত, এখনো কি তুমি অপরাধ স্বীকার করবে না? দেখছ তো, তোমার প্রতি-পদক্ষেপের হিসাব রয়েছে আমার কাছে! অতিরিক্ত চালাকের মতন তুমি খুনের জন্যে এমন একটা দিন নির্বাচন করেছিলে, যেদিন হয়েছিল মতিবাবুর সঙ্গে বিনোদের ঝগড়া! তারপরে আমাদের ভিতরের খবর জানবার আর বিনোদের উপরে দোষ চাপাবার জন্যে তুমি সেজেছিলে পুলিসের সাহায্যকারী বন্ধু। তুমি হচ্ছ গভীর জলের মাছ! অসাধরণ মস্তিষ্কচালনা করেছিলে বটে, কিন্তু পাপীর সমস্ত চাতুর্যই মিথ্যা। ভগবান ঘুমিয়ে থাকেন না!

এত সেয়ানা হয়েও দত্ত ধরা পড়ল প্রধান তিনটে কারণে। প্রথমত, সেই তুচ্ছ চূর্ণ-বালি-সুরকি-কয়লার গুঁড়ো। দ্বিতীয়ত, ভাঙা কাঁচের উপরে তার আঙুলের ছাপ। তৃতীয়ত, উপর চালাকি করে সে যদি আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ না করত, তাহলে আমিও দ্রবীভূত বাতাসের অভাবিত ও বিস্ময়কর ব্যবহারটা আন্দাজে কল্পনা করতে পারতুম না! বলতে কি, দ্রবীভূত বাতাসের কথা একবারও আমি ভাবি নি। কিন্তু দত্তের রসায়নাগারে ঐ দুর্লভ জিনিসটিকে দেখেই আমার মনের ভিতরে জেগেছিল একটা আশ্চর্য সন্দেহ!

সতীশবাবু, এখনো কি আপনি বিনোদকে গ্রেপ্তার করতে চান? কিন্তু আর সে আপনাকে ভয় করবে না, দু-দিন পরেই আবার তার দেখা পাবেন। খবরের কাগজে হত্যাকারীর গ্রেপ্তারের বিবরণ বেরুলেই বিনোদ আর অজ্ঞাতবাস করতে রাজি হবে না!

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিনোদ এবারে ভালো ছেলে হবে।

সতীশবাবু, আর-একটা কথা। ইউরোপে এখন বিজ্ঞান-জানা খুনী, চোর বা অপরাধীর দল রীতিমত ভারী। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে, এদেশের অপরাধীরা এখনো পাপ-কাজে বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে শেখে নি। অবশ্য এটা সকলেই জানে যে, বিখ্যাত পাকুড়-খুনের মামলায় প্রকাশ পেয়েছে; অপরাধীরা হত্যাকার্যে প্লেগের জীবাণু ব্যবহার করে অভাবিত চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছে! কিন্তু এ-শ্রেণীর শিক্ষিত অপরাধী এখানে দুর্লভ। নইলে এ-দেশী পুলিসকে সাত হাত জলের তলায় পড়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাবুডুবু খেতে হত! তবু আমার মত হচ্ছে, এদেশের পুলিসের উচিত, বিজ্ঞান সম্বন্ধে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করা। কেননা, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষেও বৈজ্ঞানিক অপরাধীর দল ভারী হওয়ার সম্ভাবনা আছে যথেষ্টই!

এস রবীন, শ্রীমান দত্তের সামনে পরলোকের দরজা খুলে দিয়ে এখন আমরা সসম্মানে প্রস্থান করি। নমস্কার, সতীশবাবু। দত্ত, কিছু মনে কোরো না। তোমাকে আর নমস্কার করবার ইচ্ছা হচ্ছে না!

●

সূর্যনগরীর গুপ্তধন

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইনকাদের স্বর্ণভাণ্ডার

বিখ্যাত ভূ-পর্যটক ফিলিপ সাহেবের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয় নামকরা ব্যারিস্টার মিঃ গুহের বাড়িতে, একটি বৈকালী চায়ের সভায়।

কিন্তু মৌখিক পরিচয়ের আগেই ফিলিপ সাহেব খবরের কাগজে পাঠ করেছিলেন বিমল ও আমার খ্যাতি কাহিনী।

সুতরাং মৌখিক পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হতেই ফিলিপ সাহেব উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন, "বিমলবাবু! কুমারবাবু! এই গোটা পৃথিবীটার উপরে আমি সারাজীবন ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি বটে, কিন্তু আপনাদের সামনে আমি হচ্ছি চাঁদের কাছে জোনাকীর মতন তুচ্ছ!"

বিমল লজ্জিত স্বরে বললে, "মিঃ ফিলিপ, নিজেকে আপনি এতটা ছোট মনে করছেন কেন?"

—"করব না, বলেন কি? আমার দৌড়াদৌড়ি তো কেবল মানুষের চেনাশোনা পৃথিবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু আপনারা বার বার দেখেছেন অজানা পৃথিবীর গুপ্ত রহস্য—এমনকি পৃথিবীর বাইরে মঙ্গলগ্রহে গিয়েও আপনারা হানা দিতে ছাড়েন নি। আপনাদের অগম্য স্থান বোধহয় ত্রিভুবনের কোথাও নেই!"

আমি বললুম, "না মিঃ ফিলিপ, এখনো পাতাল রাজ্যটা দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি!"

বিমল বললে, "কিন্তু দেখবার ইচ্ছা আমাদের ষোলো আনাই আছে।"

সেখানে বিনয়বাবুও হাজির ছিলেন। তিনি বললেন, "তোমার এই সব উদ্ভট ইচ্ছা আমি ভয় করি বিমল! মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়, কোন দিন তুমি হয়তো যমালয়েও বেড়াতে যাবার বায়না ধরে বসবে।"

বিমল জিভ কেটে বললে, "সর্বনাশ! আমি অভিমন্যুর মতো বোকা নয় বিনয়বাবু! যে দেশে ঢুকলে আর বেরুবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না, সে-দেশে যাবার নাম কোনোদিনই আমি মুখে আনব না।"

ইতিমধ্যে খাবার ও চা এল। ফিলিপ সাহেব চা পান করতে করতে তাঁর দেখা নানান দেশের গল্প বলতে লাগলেন—কখনো হিমালয়ের তুষার-ঝটিকার কথা, কখনো অনন্ত তুষারের স্বদেশ সুমেরু ও কুমেরুর কথা, কখনো গোবি সাহারার অগ্নিময় বালুকা-সাগরের কথা এবং কখনো বা আফ্রিকার অজ্ঞাত সূর্যকরহারা নিবিড় অরণ্যের কথা। নানা দেশের নানা জাতের অদ্ভুত মানুষ ও তাদের রীতি-নীতি এবং বন্ধুতা ও শত্রুতার কথা, অদেখা ও না-শোনা সব জীবজন্তুর রোমাঞ্চকর কথা—তাঁর মুখে সমস্ত কথা শুনতে শুনতে আমাদের চির-উৎসাহী মন আবার যেন ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বার জন্য ছটফট করতে লাগল।

ফিলিপ সাহেব সর্বশেষে বললেন, "যখনি যে-দেশ দেখবার সাধ হয়েছে তখনি সেই দেশেই আমি ছুটে গিয়েছি। কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও একটি দেশ আজও আমার দেখা হয় নি।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কেন?"

—"ভয়ে।"

—"ভয়ে? কিসের ভয়ে?"

—"তা ঠিক জানি না। তবে সে দেশ দেখতে গিয়েও ভয়ে পালিয়ে এসেছি বটে।"

বিমলের কৌতূহল অত্যন্ত জাগরিত হয়ে উঠল। সে বিস্মিত স্বরে বললে, "কিসের ভয় তা জানেন না, তবুও পালিয়ে এসেছেন?"

—"হ্যাঁ আপনারা এল ডোর‍্যাডোর নাম কখনো শুনেছেন?"

বিনয়বাবু বললেন, "এল ডোর‍্যাডো বলতে বোঝায় সোনার দেশ।

ষোলো শতাব্দীতে স্পেনের সেনাপতি পিজারো দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথমে এই এল ডোর‍্যাডোর সন্ধান দেন। তাঁর পরেও শত শত লোক এই সোনার দেশের খোঁজে অগ্নিদগ্ধ পতঙ্গের মতন ছুটে গিয়েছে বটে, কিন্তু তাদের সার হয়েছে কেবল কাদা-মাখাই। আজ পৃথিবীর সকলেই জানে এল ডোর‍্যাডো হচ্ছে কল্পিত স্বপ্ন মাত্র, তার অস্তিত্ব দুনিয়ার কোথাও নেই।"

ফিলিপ সাহেব হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বললেন, "এল্ ডোর‍্যাডোর কথা স্বপ্নকাহিনী নয়। অবশ্য সে-দেশটা যে সোনা দিয়ে তৈরি এমন অসম্ভব কথা আমি বলতে চাই না। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়াডর রাজ্যে এমন এক গুপ্তদেশের অস্তিত্ব আছে যার বিপুল ভাণ্ডারে মিলবে অফুরন্ত সোনাদানা আর অমূল্য ধনরত্ন। পিজারো হয়তো এল ডোর‍্যাডো বলতে সেই দেশকেই বুঝেছিলেন।"

বিমল বললে, "মিঃ ফিলিপ, এল ডোর‍্যাডো নিয়ে আমি কোন তর্কই করব না—নামে কি আসে যায়? কিন্তু কোন দেশ থেকে আপনি ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছিলেন, আমাকে সেই কথাই বলুন।"

ফিলিপ বললেন, "তাহলে আগে আমাকে ইতিহাসের দু-এক পাতা ওলটাতে হয়। গল্পের আসরে ইতিহাস কি আপনাদের পছন্দ হবে?"

বিনয়বাবু বললেন, "এল ডোর‍্যাডোর গাঁজার ধোঁয়ার চেয়ে ইতিহাস আমার ভাল লাগবে।"

ফিলিপ সাহেব আগে তাঁর পাইপে তামাক ভরে অগ্নি-সংযোগ করলেন। তারপর দু-পা ছড়িয়ে চেয়ারে আড় হয়ে পড়ে বলতে লাগলেন, "আজ যারা সারা আমেরিকার কর্তা হয়ে বসেছে, আসলে তারা আমেরিকার আধুনিক পোষ্যপুত্র ছাড়া আর কেউ নয়। পণ্ডিতরা প্রমাণ করেছেন, আমেরিকার প্রাচীন ও প্রথম সন্তানরা এসেছিল এশিয়া থেকে। কোন্ পথ দিয়ে তারা এসেছিলেন, তারও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকা এবং উত্তর-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে আছে বেরিং প্রণালী। এখানে আমেরিকা ও এশিয়ার ভিতরে ব্যবধান হচ্ছে মাত্র

চল্লিশ মাইল। প্রচণ্ড শীতের সময়ে প্রণালীর জল যখন জমে বরফ হয়ে যায়, তখন এশিয়ার মানুষ অনায়াসেই পদব্রজে আমেরিকায় গিয়ে হাজির হতে পারে। এশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার এই যোগসাধন হয় হাজার হাজার বছর আগে।

"আমরা আমেরিকার আদিম বাসিন্দা রেড ইণ্ডিয়ান বা লাল মানুষদের অসভ্য বলে মনে করে থাকি। এ বিশ্বাস ভুল। লাল মানুষেরা এক সময়ে সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। এবং এখানেও এক এক যুগে হয়েছিল এক এক-জাতীয় সভ্যতার উত্থান ও পতন। তাদের নাম হচ্ছে প্রাচীন মায়া-যুগ, পরবর্তী মায়া যুগ, টলটেক-যুগ, অ্যাজটেক-যুগ ও ইনকা-যুগ। এই সব বিভিন্ন যুগে লাল-মানুষরা আমেরিকার দিকে দিকে সভ্যতার এবং স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের যে সকল বিরাট নিদর্শন রেখে গিয়েছে, প্রাচীন মিশর প্রভৃতি দেশের বহু-প্রশংসিত কীর্তির চেয়ে তাদের মূল্য কম নয়। ষোলো শতাব্দীতেও স্পেনীয় দস্যুরা যখন আমেরিকা আক্রমণ করেছিল, তখন তারা অ্যাজটেক ও ইনকা সাম্রাজ্যের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য দেখে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

"১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে হার্ণাণ্ডো কর্টেজ দস্তুরমত বিশ্বাসঘাতকতা ও ছলনার দ্বারা অ্যাজটেক সম্রাট মণ্টেকুজোমাকে পরাজিত করে গোটা মেক্সিকো কেড়ে নেয়। তারপর ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে আসে আর এক নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক দস্যু, তার নাম ফ্রানসিস্কো পিজারো। দক্ষিণ আমেরিকার বর্তমান কলম্বিয়া, ইকুয়াডর ও পেরু প্রভৃতি দেশ তখন ইনকা-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল চওড়ায় পাঁচশো মাইল ও লম্বায় দুই হাজার সাতশো মাইল।

"পিজারো মাত্র একশো আটষট্টি জন সৈনিক নিয়ে পেরু আক্রমণ করতে এসে দেখে ইনকা-সম্রাট আটাহুয়াল্পা চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। পিজারো বুঝলে তার অকিঞ্চিৎকর ফৌজ তুচ্ছ নদীর মতো ইনকাদের সৈন্য-সাগরে তলিয়ে যাবে। তখন সে এক নিচ কৌশল অবলম্বন করলে। বন্ধুতার ভান করে সম্রাট আটাহুয়াল্পার

কাছে সাদর আমন্ত্রণ পাঠালে। সম্রাটের দুর্ভাগ্য, সরল বিশ্বাসে তিনি পিজারোর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ফলে তিনি হলেন দুরাত্মা পিজারোর হাতে বন্দী। সম্রাট ও প্রধান নেতা শত্রু হস্তগত, ইনকা সৈন্যেরা হতাশ হয়ে পরাজয় স্বীকার করে পালিয়ে গেল।

"এইবারে আমাদের আসল কাহিনীর আরম্ভ। ইনকাদের রাজধানীর নাম কুজকো—অর্থাৎ সূর্যনগরী (The city of the Sun)। পিজারো যখন বন্দী সম্রাটকে নিয়ে সূর্যনগরী দখল করে বসল, তখন দেশের চারিদিকে উঠল হাহাকার। সাম্রাজ্যের নানা দিক থেকে দলে দলে লাল-মানুষ তাল তাল সোনার বস্তা নিয়ে ছুটে আসতে লাগল। ইনকাদের দেশ ছিল সোনার খনির জন্য বিখ্যাত। লাল-মানুষরা বুঝেছিল, সেই সোনার লোভেই এসেছে স্পেনীয় দস্যুর দল। তাই তারা চেয়েছিল রাশি রাশি স্বর্ণের বিনিময়ে ইনকা-সম্রাটকে উদ্ধার করতে।

"সোনার স্তূপ নিয়ে লাল-মানুষরা শত্রু-শিবিরে আসতে আসতে হঠাৎ একদিন খবর পেলে, পাপিষ্ঠ পিজারো তাদের সম্রাটকে হত্যা করেছে। যারা সোনার তাল নিয়ে আসছিল, তারা তৎক্ষণাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল স্পেনীয়রা আর তার কোনই সন্ধান পেলে না।

"কিন্তু স্থানীয় লাল-মানুষরা আজও আসল খবর জানে। অ্যাণ্ডেস্ পর্বতমালা হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার হিমালয়—উত্তর-দক্ষিণে তার বিস্তার হচ্ছে সাড়ে চার হাজার মাইল। তার উচ্চতম শিখরের উচ্চতা ২২,৯০০ ফুট। ইকুয়াডরে এই পর্বতমালার অন্তর্গত একটি পাহাড় আছে, তার নাম হচ্ছে ল্লাঙ্গানাটি। তারই মধ্যে কোন স্থানে আছে ইনকাদের বিপুল গুপ্তধনের বিরাট ভাণ্ডার। শোনা যায় পৃথিবীর আর কোথাও এক জায়গায় অত সোনার তাল নেই। কিন্তু সেখানে যাবার গুপ্তপথ জানে কেবল একজাতের লাল-মানুষ। আজ পর্যন্ত তারা শ্বেতাঙ্গদের বশ মানেন নি বা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসে নি। বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা নিজেদের পর্বত-রাজ্যের মধ্যে বাস করে। তারা কিছুতেই শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে রাজী নয়। কোন শ্বেতাঙ্গ

তাদের পর্বত-রাজ্যের মধ্যে ঢুকলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারে না। এই পর্বত রাজ্যকে ইনকা সাম্রাজ্যের পূর্ব রাজধানীর নামানুসারে সূর্যনগরী বলে ডাকা হয়। গত চারশো বছরের ভিতরে বহু স্বর্ণলোভী শ্বেতাঙ্গ সূর্যনগরীর সন্ধানে যাত্রা করেছে, কিন্তু পরে তাদের আর খোঁজই পাওয়া যায় নি।

"অ্যাণ্ডেস পর্বতমালার একস্থানে 'আরুয়াকো ইণ্ডিয়ান' নামে এক জাতের লাল-মানুষ বাস করে। বছরের অন্যান্য সময়ে তারা আধুনিক সভ্য জগতের চোখের সামনেই থাকে বটে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট তারিখে কিছুকালের জন্যে দল বেঁধে অরণ্য ও পর্বতের মধ্যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায় কেউ তা জানে না, তারাও কারুকে বলে না।

"অনেক খোঁজখবর নিয়ে আমি শেষটা দু-চারটে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। আরুয়াকো লাল-মানুষেরা নাকি প্রতি বৎসরই নির্দিষ্ট সময়ে ঐ গুপ্ত সূর্যনগরীতে গমন করে। তারা সেখানকার দেবালয়ে ইনকা-সাম্রাজ্যের পূর্ব-গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রার্থনা করতে যায়।"

"আমি একদিন স্থির করলুম, গোপনে আরুয়াকোদের অনুসরণ করে সূর্যনগরীর রহস্য ভেদ করব। পাছে তাদের সন্দেহ হয়, সেই ভয়ে আমি আগে আমার অনুগত চারজন লাল-মানুষকে গুপ্তচররূপে আরুয়াকোদের পথে পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু সেই যে তারা গেল, আর তাদের দেখা পেলুম না। তারপর যথাসময়ে আরুয়াকোরা আবার স্বস্থানে ফিরে এল, তবু গুপ্তচররা এল না। আমার বিশ্বাস, তাদের কেউ বেঁচে নেই। এই ঘটনার পর আমি সূর্যনগরীর রহস্য নিয়ে আর কোন-দিনই মাথা ঘামাই নি। বলুন, আমি কি অকারণেই ভয় পেয়েছি?"

বিনয়বাবু বললেন, "নিশ্চয়ই নয়—নিশ্চয়ই নয়! মিঃ ফিলিপ, আপনার অবস্থায় পড়লে আমিও সেখান থেকে পালিয়ে আসতুম।"

বিমল বললে, "আমি কিন্তু পালিয়ে আসতুম না।"

বিনয়বাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "তার মানে?"

বিমল বললে, "আমি হলে সূর্যনগরী না দেখে ফিরে আসতুম না।"

ফিলিপ মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠে বললেন, "তাহলে একটা নতুনত্ব হত বটে! দক্ষিণ আমেরিকায় বাঙালীর অ্যাডভেঞ্চার! এ একটা কল্পনাতীত ব্যাপার!"

বিমল বললে, "না মিঃ ফিলিপ, মোটেই কল্পনাতীত নয়। ইকুয়াডরের পাশেই হচ্ছে ব্রেজিল রাজ্য। গেল শতাব্দীতেই একটি অসহায় গরিব বাঙালীর ছেলে অ্যাডভেঞ্চারের লোভে ঐ ব্রেজিলে গিয়েই কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস নামে রীতিমত অমর হয়ে আছেন।"

ফিলিপ বললেন, "ঠিক, ঠিক, আমারই ভুল হয়েছে! কিন্তু বিমলবাবু, আপনি যা বললেন সেটা কি আপনার মনের কথা? আমি যদি সূর্যনগরীর সন্ধানে যাত্রা করি, তাহলে আপনি কি আমার সঙ্গী হতে রাজি আছেন?"

টেবিলের উপরে সশব্দ করাঘাত করে বিমল বললে, "নিশ্চয়ই রাজি আছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙালী বীরবালা

বিমল সূর্যনগরে যেতে রাজি আছে শুনে ফিলিপ সাহেব বিস্ফারিত চক্ষে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন; তারপর বাঁ-হাতে মুখ থেকে পাইপটা খুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে আনন্দিত স্বরে বললেন, "আমার হাতে হাত দিন বিমলবাবু! আপনার মতন সাহসী আর বুদ্ধিমান সঙ্গী পেলে আমি আবার নির্ভয়ে ইকুয়াডরে যাত্রা করব।"

আমি বললুম, "মিঃ ফিলিপ, আপনাদের দল থেকে আমি বাদ পড়ে যাব না তো?"

ফিলিপ সাহেব বললেন, "বিলক্ষণ! আপনাদের খবর যে রাখে সেই-ই তো জানে যে, আপনারা তুজনে অভেদাত্মা।"

মিঃ গুহ বললেন, "হাঁ, আপনারা হচ্ছেন ছায়া আর কায়া!"

বিনয়বাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, "কি সর্বনাশ! বিমল, বিমল, তুমি কী বলছ? আবার গুপ্তধন! আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা!"

বিমল হেসে বললে, "হঁ। বিনয়বাবু! চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, আমাদের সঙ্গে গুপ্তধনেরও বোধহয় তেমনি কোন যোগ আছে!"

বিনয়বাবু ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, "ছি ছি, এত লোভ ভালো নয়! কেবল টাকার স্বপ্ন দেখবার জন্যে পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি নয়!"

বিমল বললে, "আপনার মুখে এ কথা শুনে তুঃখিত হলুম বিনয়বাবু! এতদিনেও আপনি আমাদের চিনতে পারলেন না! গুপ্তধনের দোহাই দিয়ে আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছি বটে, কিন্তু টাকার তুঃস্বপ্ন একবারও দেখিনি। আপনি কি জানেন না, আমাদের রক্তে রক্তে মেশানো আছে তুর্গম পথের নেশা, অজানা বিপদের টান আর অদেখা নতুনের আনন্দ? নরম ফুল-বিছানায় শুয়ে তন্দ্রায় এলিয়ে আমরা তুর্লভ মানব জীবনের মূল্যবান দিনগুলিকে ব্যর্থ করে দিতে চাই না, আমরা গতিশীল করে তুলতে চাই এর প্রতি মুহূর্তটিকে! আমরা দেখতে চাই যা দেখিনি, আমরা শুনতে চাই যা শুনিনি, আমরা লাভ করতে চাই যে-নতুনকে আজও পাই নি। নিত্য নতুন পথ, নিত্য নতুন দৃশ্য, নিত্য নতুন গতির ছন্দ! বিশ্বকে ভালো করে ভোগ করতে চাই বিনয়বাবু, টাকার লোভে আমরা কোনোদিনই পাগল হই নি!"

ফিলিপ সাহেব বললেন, "বিনয়বাবু আপনার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি! ভারতবর্ষ আজ যে জীবনের যাত্রাপথে এতটা পিছিয়ে পড়েছে, এর কারণ এখানকার লোকেরা আজ অবলম্বন করতে চায় জড়ের ধর্ম! অথচ আমাদের দেশ ইউরোপের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেখান থেকে দলে দলে লোক বেরিয়ে পড়েছে পৃথিবীর চারিদিকে—জলে-স্থলে-শূন্যে! কেউ আকাশে উঠে বায়ুমণ্ডলের বাইরে যেতে চায়,

কেউ অতল সমুদ্র-গর্ভে নেমে পাতালের ইতিহাস জানতে চায়—আবার কেউ বা যেতে চায় তৃষ্ণার্ত সাহারার অশেষ মরু-জগতে, জ্বলন্ত ভিসুভিয়াসের মৃত্যুভীষণ উদরে, বিপদসঙ্কুল সুমেরু-কুমেরুর তুষার ঝটিকার মধ্যে! শান্তিময় গৃহের আনন্দ আর আত্মীয়-বন্ধুর আদর-যত্ন ছেড়ে কেন তারা জীবনকে এমনভাবে বিপন্ন করে নিশ্চিত মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করতে চায় হাসিমুখে? এইসব মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ কি তুচ্ছ টাকার লোভেই ঘরের মায়া ত্যাগ করে?”

আমি বললুম “হ্যাঁ, মিঃ ফিলিপ, এই পথের নেশাই একদিন ভারতকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করে তুলেছিল। আপনাদের ইউরোপ যখন ভূমধ্যসাগরের তীরে নিদ্রিত হয়ে আছে, ভারতের ছেলে তখন রচনা কারছিল সপ্তসাগরের ইতিহাস। যাঁরা প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তাঁদের অনেকে বলেন আমেরিকার বুকেও পড়েছিল ভারতের পদচিহ্ন।”

ফিলিপ সাহেব বললেন, “এ কথা আমি বিশ্বাস করি কুমারবাবু! কাম্বোডিয়ায় আর জাভায় আজও প্রাচীন ভারতের যে-সব হাতের কাজ বর্তমান আছে, তাদের বিপুলতার সামনে বহু-বিজ্ঞাপিত মিশরেরও কীর্তি ছোট হয়ে যায়। কিন্তু যারা কাম্বোডিয়ার ওঙ্কারধামের আর জাভার বড়বুদ্ধের মন্দির গড়েছিল তাদের বংশধররা আজ পূর্বপুরুষদের চিনতে পারে না, এইটেই হচ্ছে আধুনিক ভারতের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য!”

বিনয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, “মিঃ ফিলিপ, আমার মুখের একটা ছোট্ট কথাকে মস্ত-বড় করে তুলে আপনারা যে প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, আমিও তাতে যোগ দিতে রাজি আছি। কিন্তু ব্যাপারটাকে এত বড় করে দেখবার দরকার আছে কি? হচ্ছিল ইনকাদের সূর্যনগরীর গুপ্তধনের কথা। আমার মত হচ্ছে আরুয়াকো লাল-মানুষরা তাদের পূর্বপুরুষদের গুপ্তধন কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তা নিয়ে আমাদের ব্যস্ত হবার দরকার নেই।”

ফিলিপ সাহেব বললেন, “ওদের গুপ্তধনের জন্য আমি একটুও ব্যস্ত নই। গুপ্তধনের লোভে আমি পৃথিবী-পর্যটনের ব্রত গ্রহণ করি নি।”

—"তবে আপনি সূর্যনগরীতে যেতে চান কেন ?"

—"সূর্যনগরীর রহস্য জানার জন্যে। ভেবে দেখুন বিনয়বাবু, নবীন আমেরিকার আধুনিক সভ্যতার মধ্যে আমরা যে লাল-মানুষদের পাই, তাদের আসল মুখ থাকে মুখোসের তলায় ঢাকা। আজও তারা মনে মনে শ্বেতাঙ্গদের বহিঃশত্রু বলে ঘৃণা করে, আমাদের কাছে নিজেদের কোন গুপ্ত তথ্যই প্রকাশ করে না। স্পেনীয় ডাকাতরা আমেরিকায় গিয়েছিল অর্থলোভে, তাই তারা অ্যাজটেক আর ইনকা-সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছিল। এমনকি পরধর্মদ্বেষী স্পেনীয় পুরোহিতরা লাল-মানুষদের পুরাতন পুঁথিপত্রগুলো পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলতে ছাড়ে নি। নিদারুণ হিংসা আর মূর্খতার ফলে একটা প্রাচীন সভ্য-জাতির অধিকাংশ ইতিহাস লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, লুপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু কেবল শ্বেতাঙ্গদের কাছে থেকেই ! তাদের নিজেদের কাছে প্রাচীন ইনকা-সভ্যতা এখনো অবিকৃতরূপেই বিরাজ করছে। অ্যাণ্ডেস পর্বতমালার কোন অজানা অন্তরালে আছে এই যে অদ্ভুত সূর্যনগরী, এখানে কেবল ইনকাদের গুপ্তধনই পুঞ্জীভূত করা নেই, তাদের প্রাচীন সভ্যতার সমস্ত রীতি-নীতি আর বিচিত্র আদর্শ নিশ্চয়ই এখানে আগেকার মতই জাগিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা যাব সেই-সব তথ্যই পুনরুদ্ধার করতে।"

বিনয়বাবু বললেন, "বেশ, তাহলে আমার আর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, সূর্যনগরীতে যাত্রা করলে আপনাদের পদে পদে বিপদগ্রস্ত হতে হবে।"

ফিলিপ বললেন, "ও-বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। সূর্যনগরীর পথে যে পদার্পণ করেছে, সে আর ফেরে নি। ভাগ্য যে আমাদের প্রতি বেশি প্রসন্ন হবে এমন ভরসাও দিতে পারি না। খুব সম্ভব, আমরাও ফিরব না।"

বিনয়বাবু হতাশভাবে বললেন, "তাহলে সূর্যনগরীর গুপ্তকথা জেনে আমাদের লাভ কি ?"

—"লাভ ? লাভ আবার কি ? ক্যাপ্টেন স্কট প্রাণ দিয়েছিন মেরু-

প্রান্তের তুষার-স্তূপের মধ্যে। তাতে তাঁর কোনই লাভ হয় নি। হিমালয়ের উচ্চতম শিখরের ওপরে উঠতে গিয়েও অনেকে আত্মদান করেছে—মরবার সময়ে তারাও বোধহয় লাভ-ক্ষতির কোন কথাই ভেবে দেখে নি।"

বিমল বললে, "কিন্তু সেই সব বীর প্রমাণিত করে গেছেন, ইচ্ছা করলেই মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারে। মিঃ ফিলিপ, দক্ষিণ আমেরিকার দিকে কবে আপনি যাত্রা করতে পারবেন?"

ফিলিপ বললেন, "আমি? আমি হচ্ছি পরিব্রাজক, ভ্রমণ করাই আমার ধর্ম। যখনি যাত্রার ঘণ্টা বাজবে তখনি আমি প্রস্তুত।"

বিমল বললে, "ভ্রমণ করা আমার ধর্ম নয় বটে, কিন্তু সুদূর অজানার আহ্বান সর্বদাই আমার কানে বাজে। তবে এখানে একটা কথা আছে। আপনার ঐ স্বর্ণনগরীতে যাবার জন্যে কিছু আয়োজন তো করতে হবে?"

—"আয়োজন! কি আয়োজন?"

—"সেটা আপনিই বলতে পারবেন, কারণ আমরা কোনোদিন ইকুয়াডরে যাইনি, সেখানে কি-রকম বিপদের সম্ভাবনা, তাও আমরা জানি না।"

ফিলিপ অল্পক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, "বিপদ? হুঁ, ওদেশে আমাদের জন্যে যে অনেক-রকম বিপদ-আপদ অপেক্ষা করে আছে সে কথা আগেই আমি বলেছি। দুর্গম গহন অরণ্য, তার মধ্যে আছে হিংস্র জন্তু; নির্জন মরুর চেয়েও শুষ্ক বিশাল পর্বত-রাজ্য—তারই আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকবে শত শত লাল-মানুষের সতর্ক চক্ষু। সে-সব নিষ্ঠুর চোখ যখনি আমাদের আবিষ্কার করবে তখনি ছুটে আসবে উত্তপ্ত বুলেটের ঝটিকা! এ-সব বিপদ আমরা এখানে বসেই কল্পনা করে নিতে পারি। এর উপরেও আছে অজ্ঞাত সব বিপদ, তাদের কথা আমি জানি না, সুতরাং বলতেও পারব না।"

বিমল বললে, "তবে আর ও-সব কথা ভেবে লাভ নেই—অজানাকে জানব আমরা গায়ের জোরেই। কেবল এইটুকু আজ স্থির হয়ে রইল, আজ থেকে পনেরো দিনের মধ্যেই আমরা ভারতবর্ষের আশ্রয় ত্যাগ

করব।"

আমার বুকের ভিতরে প্রাণ নেচে উঠল দুর্দান্ত আনন্দে। নীল সাগরের সুদূর পারে আছে দক্ষিণ আমেরিকার বিরাট হিমালয় এবং তারই কোলে লুকিয়ে আছে সূর্যনগরীর গুপ্ত রহস্য। সেখানে বনে বনে রাজত্ব করে জাগুয়ার-বাঘ, অজগর আর র‍্যাটল-সাপ, ঘোড়া ছুটিয়ে পাহারা দেয় মাথায় পালক-পরা বন্য লাল-মানুষের দল—পূজা করে তারা অদ্ভুত সব দেবতাকে, নরবলি দেয়, হয়তো এখনো মানুষের মাংস খায়। বিপদের সেই বেড়াজালের মধ্যে আছে না-জানি কত বৈচিত্র্যের রোমাঞ্চ, কত ঘটনার পর ঘটনার মহোৎসব।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা কয়ে ফিলিপ সেদিনের মতন বিদায় গ্রহণ করলেন।

বিমল বললে, "বিনয়বাবু, আপনিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন তো?"

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না।"

ঠিক সেই সময় বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বিনয়বাবুর মেয়ে মৃণু। যাঁরা "হিমালয়ের ভয়ঙ্কর" উপন্যাস পড়েছেন তাঁদের কাছে মৃণুর নতুন পরিচয় দিতে হবে না। আজ এখানে তারও চায়ের নিমন্ত্রণ। এতক্ষণ সে ছিল অন্দরমহলে, বাড়ির মেয়েদের কাছে।

মৃণু ছুটে এসে বিনয়বাবুর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "সূর্যনগরীতে তুমি কেন যাবে না বাবা?"

বিনয়বাবু বললেন, "ও, তুই বুঝি আড়াল থেকে সব শুনছিলি?"

মৃণু হেসে বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কেন যাবে না বাবা?"

বিনয়বাবু মেয়ের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "তোকে এখানে একলা ফেলে রেখে গেলে আমার মন যে কেমন করবে মা!"

মৃণু বললে, "কেন তোমার মন কেমন করবে বাবা? আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল না!"

—"তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব সূর্যনগরীতে? বলিস কি রে?"

—"কেন বাবা, আমি কি আর ছোটটি আছি? এই মাসেই যে আমি উনিশ পার হলুম! আর আমার যে সাহসের অভাব নেই তাও তুমি জানো! হিমালয়ের সেই রাক্ষসরা যখন আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তখন—"

বিনয়বাবু বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, "থাক, থাক, ও-সব কথা আর বলতে হবে না। এখন বাড়ি চল।"

মৃণু ধীরে ধীরে বিমলের কাছে গিয়ে বললে, "বিমলদা, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।"

বিমল বাধো বাধো গলায় বললে, "না মৃণু, তা হয় না।"

—"কেন?"

—"তুমি তো আমাদের মতো পুরুষ-মানুষ নও!"

মৃণু চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বললে, "আমি যে পুরুষ মানুষ নই, সেটা আর তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না, মশাই। কিন্তু মেয়ে হলেই যে আলমারির সাজানো পুতুল হতে হবে, এ কথা আমি মানব না। অজ্ঞাতবাসে যাবার সময়ে পাণ্ডবরাও কি দ্রৌপদীকে সঙ্গে করে নিয়ে যান নি? চাঁদবিবি, রানী লক্ষ্মীবাঈ কি সাজানো পুতুল ছিলেন? আজও কি রুশিয়ায় আর চীনদেশে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েরাও যুদ্ধ করছে না? মেয়ে হলেই ভীরু হতে হবে? তুমি তো জানো বিমলদা আমিও বন্দুক-লাঠি-ছোরা ধরতে পারি!"

বিনয়বাবু বিস্মিত স্বরে বললেন, "সর্বনাশ, সর্বনাশ! বিমল, কুমার —দেখ, দেখ, তোমাদের সঙ্গে থেকে থেকে মৃণুরও স্বভাব কিরকম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে! পাগলের মতো যাই মুখে আসছে তাই বলছে!"

একখানা খবরের কাগজ খুলে ধরে আড়ালে মুখ লুকিয়ে আমি খুব হাসতে লাগলুম।

বিমল কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বললে, "দেখ মৃণু, তোমার জন্যে আমরাও বকুনি খেয়ে মরছি!"

মৃণু বললে, "ও সব বাজে কথায় আমি ভুলছি না। আমায় না নিয়ে

গেলে আমি কেঁদে-কেটে রসাতল করব।"

বিমল বললে, "এটা ঠিক মেয়ের মতই কথা হল বটে। মৃণু তুমি কেঁদে জিততে চাও?"

মৃণু অভিমান-ভরা স্বরে বললে, "হ্যাঁ, তাই। আমায় নিয়ে না গেলে আজ কাঁদব, কাল কাঁদব, রোজ কাঁদব—আমি কেঁদেই জিতব!"

আমি বললুম, "বিনয়বাবু, মৃণুর অশ্রু-সাগরে যদি তলিয়ে যেতে না চান, তাহলে ওর কথায় সায় দিয়ে আত্মরক্ষা করুন।"

বিনয়বাবু খানিকক্ষণ হতভম্বের মতন বসে রইলেন। তারপর মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "কালে কালে এ হল কি। পৃথিবী ওলটাতে আর বুঝি দেরী নেই!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যাত্রা

বাঘার রাগ হয়েছে।

সারমেয়-শ্রেষ্ঠ বাঘার সঙ্গে তোমাদের অনেকেরই বোধহয় চেনা-শোনা আছে। তবে যাঁরা এখনও বাঘার নাম শোনেন নি তাঁদের জানিয়ে রাখা দরকার, সে হচ্ছে মস্ত-বড় একটি দেশী কুকুর। দেশী হলেও বুদ্ধি, শক্তি, সাহস ও বিক্রমে বাঘা হচ্ছে অসাধারণ, তার গুণে আমি ও বিমল কতবার কত বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করেছি!

বিমলের সঙ্গে বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি, রামহরি গেলাস তুলে জল-পান করছে আর বাঘা তার মুখের পানে চেয়ে ধমক দিচ্ছে ঘেউ ঘেউ রবে। আশা করি বিমলের পুরাতন ভৃত্য রামহরিকেও নতুন করে চিনিয়ে দিতে হবে না।

বিমল সুধোলে, "কি গো রামহরি, বাঘা এত চটেছে কেন?"

রামহরি হেসে বললে, "ওকে আমার রসগোল্লার ভাগ দিতে ভুলে গিয়েছি !"

আমি বললুম, "রাগ করিস নে রে বাঘা, আয় তোকে দুখানা বিস্কুট দিচ্ছি।" তাকে দুখানা বিস্কুট বার করে দিলুম, বাঘা ঘন ঘন ল্যাজ নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানালে।

বিমল বললে, "হ্যাঁ রামহরি, আরো দু-চার দিন ভালো করে রসগোল্লা খেয়ে নাও, কারণ শীগগিরই আমরা যে দেশে যাচ্ছি সেখানে ময়রারা রসগোল্লা বানায় না।"

রামহরি চমকে উঠে বললে, "তার মানে ? তোমরা আবার কোথাও যাচ্ছ নাকি ?"

—হ্যাঁ লাল-মানুষদের মুল্লুকে।"

—"ও বাবা সে আবার কোথায় ?"

—"আমেরিকার নাম শুনেছ তো ? সেইখানে।"

—"মাপ কর খোকাবাবু, বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু আমার ভীমরতি হয় নি। গঙ্গাতীর ছেড়ে ম্লেচ্ছ-মুল্লুকে আমি যাব না।"

—"তোমাকে যেতে হবেই !"

—"কখখনো না, কখখনো না। আমায় কি তোমরা কলুর বলদ পেয়েছ ? নাকে দড়ি দিয়ে যেখানে খুশি টেনে নিয়ে যাবে ? আচ্ছা মাথা-পাগলাদের পাল্লায় পড়েছি যা-হোক হাড় জ্বালিয়ে মারলে !"

আমি বললুম, "বিমল, এ-যাত্রা রামহরিকে রেহাই দাও। বুড়ো হলে লোকে কাপুরুষ হয়।"

রামহরি রেগে যেন তিনটে হয়ে বললে, "কি রামহরি দাস কাপুরুষ ? জানো, হাতে একগাছা পাকা বাঁশের লাঠি পেলে আজও আমি যমের তোয়াক্কা রাখি না ?"

ঠিক এমনি সময় ঝড়ের মতন ঘরে এসে ঢুকল মৃণু। ছুটে গিয়ে রামহরির দুই হাত চেপে ধরে সে নাচতে নাচতে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, "নাচো রামুদা' আমার সঙ্গে তুমিও একটু নাচো !"

রামহরি ব্যস্ত হয়ে বললে, "আরে আরে দিদিমণি, কর কি—কর কি। আমার কি আর তোমার সঙ্গে নাচবার বয়েস আছে ?"

মৃণু বললে, "না না রামহরি, তোমাকে একবার নাচতেই হবে। আজ আমার ভারি আনন্দের দিন।"

রামহরি বললে "এত আনন্দ কিসের গা ? তোমার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে নাকি ?"

রামহরির হাত ছেড়ে দিয়ে মৃণু বললে, "ধেৎ! বিয়ে! এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে পরাধীন হবার মেয়ে আমি নই।"

আমি বললুম, "ব্যাপার কি মৃণু ? বিনয়বাবু তোমার কথায় রাজি হয়েছেন বুঝি ?"

—হ্যাঁ কুমারদা, রাজি না হয়ে উপায় কি ? আমার কান্নার অভিনয়টা নিশ্চয়ই খুব ভালো হয়েছিল। ঐ যে বাবা আসছেন, ওঁর মুখেই সব শোনো !"

বিনয়বাবু ঘরে ঢুকেই ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "মৃণু, তুমি অন্যায়-রকম বাচাল হয়ে উঠেছ ? মোটর থামাতে না থামাতেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো ছুটে চলে এলে। এর অর্থ কি ?"

মৃণু তাড়াতাড়ি বিনয়বাবুর কাছে গিয়ে দুই হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললে, "এর অর্থ কি জানো বাবা ? তুমি যে আমার কথায় রাজি হয়েছ, বিমলদা আর কুমারদাকে এই সুখবরটা দেবার জন্য আমার আর তর সই ছিল না !"

বিনয়বাবু আরো বেশি রেগে গিয়ে বললেন, "তর সইছিল না। সুখবর ! বাঙালীর মেয়ে যাচ্ছেন আমেরিকায় ধিঙ্গিপনা করতে ! এটা আবার সুখবর নাকি ?"

মৃণু বাপের বুকে মাথা রেখে বললে, "তুমি রাগ করো না। তুমি যে আমার লক্ষ্মী বাবা।"

রামহরি এতক্ষণ মহা বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করে অবাক হয়ে সব শুনছিল। এতক্ষণ পরে সে বললে, "ওগো বিনয়বাবুমশায়, এ-সব

কী শুনছি? আমাদের খোকাবাবু আর কুমারবাবু কি এক ছিষ্টিছাড়া লাল-মানুষের দেশে যাবার বায়না ধরেছে। মৃণুদিদিও ঐ দুই ডানপিটে বোম্বেটের সঙ্গে যাবে নাকি?"

বিনয়বাবু হতাশভাবে একখানা চেয়ারের ওপর বসে পড়ে শ্রান্ত স্বরে বললেন, "আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না রামহরি, আমি কিছু জানি না।"

মৃণু বললে, "তুমি যদি অমন করে কথা কও বাবা, তাহলে আমি কিন্তু আবার কাঁদতে বসব।"

বিনয়বাবু বললেন, "রক্ষে কর বাছা, আমি আর কোন কথাই কইব না।"

রামহরি বিমলের কাছে গিয়ে বললে, "ও খোকাবাবু, এসব কি শুনছি?"

বিমল বললে, "হ্যাঁ রামহরি, মৃণুও আমাদের সঙ্গে যাবে।"

—"তাহলে তোমারও ঐ মত?"

—"মোটেই নয়। মৃণু আমাদের সঙ্গে না গেলেই ভালো হয়।"

মৃণু যেন তেলে-বেগুনের মতন জ্বলে উঠে বললে, "তাই নাকি? বীরত্ব জিনিশটা বুঝি পুরুষদের একচেটে?"

বিমল হেসে বললে, "আমি তোমার মতন কাঁদুনে বীর-বালার সঙ্গে তর্ক করতে ভয় পাই। তবে তর্ক না করেও এ-কথা বলতে পারি যে, তুমি সঙ্গে গেলে আমাদের তোমাকে নিয়েই বিব্রত হয়ে থাকতে হবে। আমরা ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যাচ্ছি না মৃণু!"

মৃণু কোন রকমে রাগ সামলে বললে, "ইডেন গার্ডেনে বেড়াবার ইচ্ছা আমার একটুও নেই মশাই! ইকুয়াডরে পৌঁছে আমিও তোমাদের কাছ থেকে চকোলেট কি আইসক্রিম খেতে চাইব না। নিজের ভার আমি নিজেই বইতে পারব, তোমরা দয়া করে নিশ্চিন্ত হও।"

মৃণু সঙ্গে থাকলে আমাদের যে নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব, একথাটা কিছুতেই তাকে বোঝানো গেলো না। বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে রক্তলোভী

শত্রু ও হিংস্র জন্তুদের মধ্যে আমাদের সর্বদাই বাস করতে হবে, পদে পদে যুঝতে হবে সাক্ষাৎ মৃত্যু ও নানা অভাবিত বিপদের সঙ্গে, এসব ক্ষেত্রে বাঙালী মেয়ের উপস্থিতি কল্পনা করাও সহজ নয়।

কিন্তু মৃণু এ-যাত্রা কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না। মৃণু যাচ্ছে বলে বিনয়বাবুকেও যেতে হল। তিনি বলে-কয়ে নারাজ রামহরিকেও রাজি করালেন।

আমি বললুম, "কিন্তু মৃণু-ঠাকরোণ তুমি কি শাড়ি পরেই লাল-মানুষের সঙ্গে হাতাহাতি করবে?"

মৃণু ঘাড় নেড়ে বললে, "নিশ্চয়ই নয়। যতদিন ইকুয়াডরে থাকব শাড়ির নামও আমি মুখে আনব না। আজকেই দরজীর বাড়িতে খাঁকী কোট প্যাণ্টের অর্ডার দেব, কি বল বাবা?"

বিনয়বাবু গম্ভীরস্বরে বললেন, "আমি হচ্ছি ওল্ড ফুল, আমার মতামতের মূল্য নেই। তুমি যা খুশি করতে পারো।"

রামহরি বললে, "ঘোর কলি উপস্থিত। এইবার থেকে দেখছি শাড়ি পরে ঘোমটা দিতে হবে পুরুষদেরই।"

মৃণু বললে, "সে কথা মন্দ নয়। ঘোমটার ভেতরে পুরুষদের দাড়ি-গোঁফ কেমন মানায়, সেটা দেখবার জন্যে আমার লোভ হচ্ছে।"

রামহরি বললে, "দিদিমণি, তুমি খালি দুষ্টুর ধাড়ী নও, তোমার বাক্যি-বাণগুলিও বিষ-মাখানো।"

—"শালুক চিনেছেন গোপাল-ঠাকুর" বলেই রামহরির গোঁফ ধরে মৃণু জোরে এক টান মারলে।

রামহরি আর্তনাদ করে বললে, "উঃ আমি তো লাল-মানুষ নই দিদিমণি, আমার গোঁফ নিয়ে আর টানাটানি করা কেন?"

মৃণু বললে, গোঁফ আর টিকি দেখলেই আমার টান মারবার ইচ্ছে হয়।"

—"বাবা, তোমার পায়ে দণ্ডবৎ। ভগবান নিশ্চয়ই পুরুষ গড়তে বসে ভুল করে তোমাকে গড়ে ফেলেছিলেন।"

—"যা বলেছ! সেইজন্যেই তো আমি পুরুষের ব্রত নিয়ে ভগবানের ভুল শোধরাবার চেষ্টা করছি।"

রামহরির সাধ্য কি যে কথায় মৃণুকে এঁটে ওঠে। আর কেবল রামহরি কেন, মৃণুর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতে গেলে আমাদের কারুর অবস্থাই বিশেষ আরামদায়ক হতো না। এক সন্তান বলে বিনয়বাবু তাঁর মেয়েটিকে সব দিক দিয়ে যেমন শিক্ষিত করে তুলেছিলেন, তেমনি তাকে স্বাধীনতাও দিয়েছিলেন যথেষ্ট। কলেজে-পড়া বাঙালীর মেয়ে বললে মনের মধ্যে যে দুর্বলতার প্রতিমূর্তি ভেসে ওঠে মৃণু তেমন মেয়ে নয়। তার দীর্ঘ ঋজু দেহখানি শক্তি ও স্বাস্থ্যে সুন্দর।···

······ঠিক দিন-পনেরো পরেই আমাদের যাত্রা শুরু হল! বিরাট ও অনন্ত এক জলের সাম্রাজ্য, মানুষ তার কোন অংশের নাম দিয়েছে ভারত সাগর, কোন অংশের চীন-সাগর এবং কোন অংশের বা প্রশান্ত সাগর। নাম আলাদা আলাদা বটে, কিন্তু চেহারা একই। আকাশের স্থির নীলিমার তলায় কেবল অস্থির নীলিমার গতির উচ্ছ্বাস! দিকচক্রবাল পর্যন্ত চিরকাল চলেছে স্থিরতার সঙ্গে এই অস্থিরতার অপূর্ব আলাপ! সূর্য উঠে দিনের বেলায় এখানে জলেও আগুন জ্বালে, রাত্রে চাঁদ এসে ঢেউয়ে দুলিয়ে দেয় হীরা-মানিকের মালা।

আমরা সমুদ্রযাত্রা করেছি অনেকবার, কিন্তু মৃণুর পক্ষে এ হচ্ছে একেবারে নতুন অদেখা জগৎ—দিন-রাত সে কেবল ডেকের উপরেই থাকতে চায়। কান পেতে জলের গান শোনে, অবাক বিস্ময়ে তার চোখ ছোটে সামুদ্রিক পাখিদের পিছনে পিছনে। মাঝে মাঝে জাগে সবুজ স্বপ্নের মতন ছোট ছোট দ্বীপ, আর মৃণু শিশুর মতন আনন্দে করতালি দিয়ে বলে ওঠে, "দেখ বাবা? দেখ কুমারদা! ঐ দ্বীপে কারা থাকে জানো? রূপকথার পরীরা! আমি বেশ বুঝতে পারছি, ওর প্রবালতটে উঠে রোজ রাত্রে মৎস্যনারীরা বীণায় বীণায় বাজায় সমুদ্র-রাগিণী! আহা, ওখানে যদি আমাদের বাড়ি হত।"

পথে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল না। যথাসময়ে গিয়ে

নামলুম দক্ষিণ আমেরিকার মাটিতে। এইবারে দেখা যাক ভাগ্যদেবী আমাদের সামনে তোলেন কোন দৃশ্যের যবনিকা!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বরফের আগুন-পাহাড়

কলম্বিয়ার রাজধানী বোগাটো শহর। ট্রাম, ট্যাক্সি, ইলেকট্রিক, থিয়েটার, বায়োস্কোপ—এখানে আধুনিক সভ্যতার কোন উপকরণেরই অভাব নেই।

এখানকার বাসিন্দাও দেখলুম অনেক-রকম। খাঁটি লাল-মানুষই বেশি—সেই সঙ্গে আছে নিগ্রো ও অন্যান্য মিশ্র জাতি। শেষোক্তদের মধ্যে একজাতের নাম "মেস্টিজো", তাদের দেহে আছে স্পানিয়ার্ড ও লাল-মানুষদের রক্ত। আর একজাতের লোকের নাম "চোলস"—তারা মেস্টিজো ও লাল-মানুষদের বংশধর!

বোগাটো থেকে আমরা চললুম ইকুয়াডরের রাজধানী কুইটো নগর। পথিমধ্যে দেখা হল আরুয়াকো লাল-মানুষদের সঙ্গে।

তাদের কুটীরগুলি গোল গোল। এক-একটি পরিবার এক এক-জোড়া কুটীরে বাস করে। কারণ হচ্ছে অদ্ভুত। এদেশী রীতি অনুসারে স্বামী ও স্ত্রীকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে থাকতে হয় এবং স্বামীর ঘরে স্ত্রী বা স্ত্রীর ঘরে স্বামী প্রবেশ করতে পায় না।

আমরা যখন আরুয়াকোদের দেশে গিয়ে হাজির হলুম, তখন তাদের পল্লীগুলি ছিল প্রায় জনশূন্য! যাদের দেখলুম তাদের অধিকাংশই হয় বুড়ো, নয় শিশু, নয় পঙ্গু বা রুগ্ন, একজন জোয়ান বা সক্ষম লোকের সঙ্গে দেখা হল না।

ফিলিপ বললেন, "বৎসরের এই সময়েই আরুয়াকোরা উপাসনা

করতে যায় সূর্যনগরীতে। দেশে পড়ে থাকে কেবল অক্ষমরা।

আমরা আবার যাত্রা শুরু করলুম।

যাত্রাপথের প্রথম থেকেই চোখের সামনে জেগে আছে অ্যাণ্ডেস মহাপর্বতের ক্রমোন্নত শিখরমালা। এই সাড়ে চারি হাজার মাইল ব্যাপী পর্বত প্রথম যেখান থেকে মাথা তুলেছে, সেখানে তার উচ্চতা খুব বেশি বা অসাধারণ নয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার দীর্ঘতা বেড়ে উঠে অবশেষে হারিয়ে গিয়েছে অনন্ত আকাশের মেঘ-রাজ্যের ভিতরে। পাহাড়ের পর পাহাড়—যেন তাদের আর শেষ নেই—এ যেন এক বিশাল সোপান-শ্রেণী এবং প্রত্যেক পাহাড় হচ্ছে সোপানের এক-একটি ধাপ! এমনি ধাপে ধাপে সে উঠে গিয়েছে প্রায় তেইশ হাজার ফুট উপরে। ভারত-বর্ষের হিমালয় পর্বত অ্যাণ্ডেস এর চেয়ে উঁচু (২৯,০০২ ফুট) বটে কিন্তু লম্বায় সে অনেক ছোট—মাত্র দেড় হাজার মাইল। চওড়াতেও অ্যাণ্ডেস বড় সামান্য নয়, স্থানে স্থানে প্রায় পাঁচশো মাইল।

এক বিরাট পর্বত সাম্রাজ্যের মধ্যে নানা জায়গায় নানারকম জলবায়ু আবহাওয়া—কোথাও শীত, কোথাও গ্রীষ্ম, কোথাও বর্ষা! এবং এখানকার দৃশ্যবৈচিত্র্যেরও যেন অন্ত নেই! অ্যাণ্ডেসের কোন কোন স্থান মরুভূমির মতো নিষ্পাদপ, আবার কোন কোন স্থান অপূর্ব শ্যামলতায় সুন্দর। এর কোথাও আছে উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরি, আবার কোথাও দেখা-যায় চিরতুষারের দিগন্তব্যাপী শুভ্রতা।

নয় হাজার তিন শতো পঞ্চাশ ফুট ওপরে উঠে আমাদের গম্যস্থান ইকুয়াডরে এসে উপস্থিত হলুম! এর রাজধানীর নাম কুইটো। এখানকার ঠাণ্ডা আবহাওয়া ভারী ভালো লাগল। শুনলুম সারা বছরের কোন সময়েই এখানে গ্রীষ্মের উৎপাত নেই। চারিদিকে পর্বতমালার স্নেহাশীর্বাদ নিয়ে শহরটি প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর খাতায় নিজের নাম লিখে রেখেছে। স্পানিয়ার্ডরা প্রথম যখন লাল-মানুষদের কাছ থেকে শহরটি কেড়ে নেয়, তখনও কুইটো প্রাচীন বলে গণ্য ছিল।

কুইটোর মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছে একটি পনেরো হাজার নয়শো

দশ ফুট উঁচু আগ্নেয়-পর্বত। স্থানীয় লোকেরা তাকে "পিচিঞ্চা" বা "ফুটন্ত গিরি" বলে ডাকে। ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে সে হঠাৎ অগ্নি-উদগার করে গরম নুড়ি ও ছাই ঢেলে গোটা কুইটো শহরকে কবর দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সে আর আগুন নিয়ে এমন সাংঘাতিক খেলা করে নি।

ইকুয়াডর রাজ্য শাসিত হয় প্রজাতন্ত্রের দ্বারা। এখানকার পাহাড়ের উপর যারা বাস করে, তাদের অধিকাংশই হচ্ছে খাঁটি বা ঈষৎ মিশ্রিত জাতের লাল-মানুষ। এখানকার পুরুষরা "পঞ্চোশ" বা উজ্জ্বল-রঙের 'র‍্যাপার' এবং স্ত্রী লোকেরা পুরু শাল গায়ে দিয়ে বেড়ায়। তারা যেমন ভদ্র তেমনি শান্ত। তাদের পেশা হচ্ছে চাষ-বাস বা দড়ি তৈরি করা বা পশমী কাপড় বোনা। পৃথিবীর সবদেশেই যে 'পানামা' টুপী বিখ্যাত তা ইকুয়াডরেই প্রস্তুত হয়।

পাহাড়ের উপর থেকে কুইটো শহরকে দেখায় ঠিক ছবির মতো। উজ্জ্বল সূর্যের স্বর্ণকিরণে শহরের লাল-ছাদওলা সাদা রঙের বাড়িগুলি ঝকমক ঝকমক করতে থাকে। শহরের রাজপথ থেকেই চারিধারে কুড়িটি ছোট-বড় আগ্নেয় পাহাড়কে দেখা যায়।

কুইটো শহর থেকে আর একটি দৃশ্য দেখলুম। পিচিঞ্চা আগ্নেয়গিরি এবং তার ভিতরটা অগ্নিময়; কিন্তু বাইরে থেকে তাকে চেনবার যো নেই। কারণ, তার উর্ধ্বদিকে আছে চির-তুষারের শ্বেত প্রলেপ এবং নিচের দিকটা ঢাকা তৃণ ও বন্য জঙ্গলের শ্যামলতায়। বরফে ঢাকা অগ্নি পর্বত,—আশ্চর্য!

কুইটো থেকে বেরিয়েই ফিলিপ সাহেব আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে কয়েকজন এদেশী মালবাহী কুলি সংগ্রহ করলেন। কুলিরা কয়েকটি ঘোড়া ও লামার পিঠে মোটঘাট তুলে দিয়ে আমাদের পিছনে পিছনে আসতে লাগল। 'লামা' বলতে তোমরা বুঝবে হয়তো তিব্বতী সন্ন্যাসী কিন্তু এ লামা তা নয়। এ হচ্ছে উটের ছোট-খাটো সংস্করণ—যদিও এদের পিঠে কুঁজ থাকে না। লামা হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকারই জন্তু,

পাহাড়ের দুর্গম পথে অনায়াসেই তারা ভারি ভারি মাল নিয়ে আনা-গোনা করতে পারে।

তারপর আমরা অগ্রসর হলুম ল্লাঙ্গানাটি পাহাড়ের দিকে—যার গর্ভে লুকানো আছে সূর্যনগরী ও তার গুপ্তধনের রহস্য! জানি না, আমরা তাকে আবিষ্কার করতে পারব কিনা এবং প্রাণ নিয়ে এ পথ দিয়ে আবার ফিরতে পারব কিনা! কিন্তু চিরদিনই আমরা নিরুদ্দেশের যাত্রী, রহস্য-সাগরে সাঁতার কাটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ, তাই আগ্রহ-ব্যাকুল হৃদয়ে আমরা পদে পদে উঠতে লাগলুম উপরে, উপরে, আরো উপরে—যেখানে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল কাণ্ডার-জাতীয় বৃহৎ গৃধ্ররা দলে দলে, যেখানে সুদূর থেকে তুষার-মুকুট পরা শৈলশিখরদের মৌন আহ্বান ভেসে আসতে লাগল—আয়, আয়, আয় রে পথ-পাগলের দল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মূর্তির পর মূর্তি

আমরা এখন ল্লাঙ্গানাটি পাহাড়ের সম্মুখে।

এতটা পথ এগিয়ে এসেও আমরা বিপদের ইঙ্গিত পর্যন্ত দেখতে পাইনি। পথিমধ্যে বহু লাল-মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে এবং আমাদের আর বিশেষ করে মৃণুকে দেখে তাদের চোখগুলো রীতিমত বিস্ময় চকিত হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু বিস্ময়ের চমক ছাড়া সেসব দৃষ্টিতে আর কোন ভীতিকর ভাব লক্ষ্য করি নি। তারা তো বিস্মিত হবেই—বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ তাদের চোখে পড়ল বোধহয় এই প্রথম!

কিন্তু আজ একটি গ্রামের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে একটা ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি যদিও চমকপ্রদ নয়, তবুও ফিলিপ সাহেব যেন কিছু

ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

গাঁয়ের পথে গাছের ছায়ায় বসে কয়েকজন লাল-মানুষ জটলা করছিল, আমরা তাদের কাছ দিয়ে কথা কইতে কইতে অগ্রসর হচ্ছি হঠাৎ লাল-মানুষদের একজন লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠল। সে দাঁড়িয়ে উঠতেই কবির ভাষা মনে পড়ল—"পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ!"

সত্য, কি বিশাল মূর্তি তার! লম্বায় সে অন্ততঃ সাত ফুটের কম নয়, কিন্তু তবু তাকে বিশেষ ঢ্যাঙ্গা বলে মনে হচ্ছিল না; কারণ চওড়ায় তার দেহ এমন আশ্চর্য-রকম বৃহৎ যে, তুলনায় লোকটার অস্বাভাবিক দীর্ঘতাও সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আবার, সেই অসাধারণ লম্বা ও চওড়া দেহেরও অনুপাতে তার মুখখানা হচ্ছে অসম্ভব রকম বড়! তার চোখদুটো কুৎকুতে হলেও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি—যেন বিষধর সর্পের মতন! মস্ত নাকটা শিকারী পাখির মতন বাঁকানো। উপর-ঠোঁটের মাঝখানটা কাটা—ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে বড় বড় দুটো হিংস্র ও হলদে দাঁত! মাথায় পালকের টুপি, দেহে রঙীন ঝলমলে পোশাক, পেশী স্ফীত, বলিষ্ঠ, দীর্ঘ ডানহাতে একটা বর্শা!

লোকটা মাটির উপর সশব্দে পা ফেলে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। তাকে দেখেই বাঘার কণ্ঠে ফুটল গর্জন-রব!

ফিলিপ সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "কালো বাজ!"

সে বিষম হেঁড়ে-গলায় হো হো করে হেসে পরিস্কার ইংরেজীতে বললে, "হাঁ হাঁ—আমি কালো বাজই বটে! মিঃ ফিলিপ, তুমি এখনো আমাকে ভোলোনি দেখছি!"

ফিলিপ মৃদু হেসে বললেন, "তোমার ঐ পরমসুন্দর চেহারা একবার দেখলে কি জীবনে ভোলা যায়?"

কালো বাজ তার বর্শাদণ্ডটা মাটির উপরে ঠক ঠক করে ঠুকতে ঠুকতে বললে, "আমার চেহারা পরমসুন্দর কিনা জানি না, তবে যথার্থ পুরুষ-মানুষেরই মতন বটে! আমি তোমাদের মতন আদুরে ননীর পুতুল নই!"

ফিলিপ বললেন, "তোমাকে ননীর পুতুল বলে আমি অভিধানের অপমান করব না। কিন্তু কালো বাজ, তুমি এখানে বসে বসে কি করছ বল দেখি?"

—"তোমার কথার জবাব দেবার আগে আমি জানতে চাই তুমি আবার এদেশে কেন?"

—"বেড়াতে এসেছি।"

—"বেড়াতে? এই পাহাড় আর জঙ্গল কি বেড়াবার জায়গা? এই দেখবার জন্যে তোমরা এসেছ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে? একবার এদেশ দেখেও তোমার দেখবার সাধ মেটেনি?"

—"না।"

—"বেশ, তবে বেড়িয়ে বেড়াও।"—বলেই সে ফিরে হন হন করে আবার গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল।

আমরাও আবার অগ্রসর হলুম।

বিমল সুধোলে, "লোকটা কে, মিঃ ফিলিপ?"

—"লাল-মানুষদের একজন সর্দার।"

—"দেখছি আপনি ওকে চেনেন।"

হ্যাঁ, গেল-বারে এদেশে এসে ওর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু ওকে আমি ভয় করি।"

—"কেন?"

—"আমরা এখন যেখানে এসেছি, এইটিই হচ্ছে সূর্যনগরে যাবার প্রধান পথ। গেল-বারেও ওকে এখানে দেখেছিলুম। আমার বিশ্বাস, কালো বাজ এইখানে বসে পাহারা দেয়—যাতে বাইরের কেউ সূর্য-নগরের পথ ধরে এগুতে না পারে।"

—"তাহলে কালো বাজ আমাদের শত্রু?"

—"মিত্র যে নয়, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

মৃণু বললে, "কালো বাজ! মাগো, নামের ছিরি দেখ! এমন নামও কেউ রাখে!"

ফিলিপ বললেন, "অনেক লাল-মানুষেরই নামকরণ হয় বিশেষ জন্তুর নাম অনুসারে।"

মৃণু বললে, "কালো বাজ যখন বললে তার চেহারা পুরুষ-মানুষের মতো, তখন আপনার বলা উচিত ছিল, যমদূতরাও পুরুষ মানুষ। বাব্বা, কি চেহারা!"

ফিলিপ বললেন, "হয়তো ওর প্রকৃতিও ওর আকৃতির চেয়ে সুন্দর নয়। আমার মনে দুশ্চিন্তার উদয় হচ্ছে। হয়তো গতবারের মতন এবারেও আমাদের ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হবে।"

মৃণু বললে, "বিমলদা, মিঃ ফিলিপের সঙ্গে কথা কইতে কইতে কালো বাজ কি-রকম চোখে বার বার আমার পানে তাকাচ্ছিল, সেটা তোমরা কেউ লক্ষ্য করেছ কি?"

—"এ-পথে বাঙালীর মেয়ে কেউ দেখেনি। কালো বাজ হয়তো বিস্মিত হয়েছিল।"

—"না বিমলদা, না! কালো বাজের চোখ যেন খাই খাই করছিল!"

—"ওটা তোমার মনের ভ্রম হতেও পারে।"

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মৃণুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "মৃণুর ভ্রম হোক আর না-ই হোক, আজ থেকে ওকে আমি একদণ্ড কাছ-ছাড়া হতে দেব না।"

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমরা যেখানে গিয়ে তাঁবু ফেললুম, সে-জায়গাটি বড় মনোরম। উপরে নীল আকাশ, তলায় সুদূর গিরি-শ্রেণীর শুভ্র তুষার রেখা, তারপর পাহাড়ের গায়ে মাখা ধূসর রঙ এবং তার নিচে স্নিগ্ধ-সবুজ শ্রী এবং এই বিভিন্ন বর্ণমালার উপরে ঝরে ঝরে পড়ছে অস্তগামী সূর্যের রক্তরাগ-ঝরণা।

মৃণু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "বিমলদা, ও কুমারদা! খালি ছবি নয়, এখানে গানও আছে! তোমরা ঝরণার কুলু কুলু তান শুনতে পাচ্ছ?"

আমি বললুম, "শুধু ঝরণার তান নয় মৃণু, তাকে দেখতেও পাচ্ছি।"

—"কৈ, কৈ—কোথায়?"

—"বনের ফাঁকে—ঐখানে !"

"বাঃ, বাঃ কি চমৎকার ! ও যেন সোনালী জল-নর্তকী, নাচতে নাচতে নিচে নামছে পৃথিবীর নাট্যশালায়। সাধ হচ্ছে, এইখানেই ঘর বেঁধে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিই।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক যখন ঝাপসা হয়ে গেল, আমরা তখন তাঁবুর ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। এখানে তাঁবু খাটানো হয়েছে তিনটে। প্রথম তাঁবুতে থাকব আমি, বিমল, রামহরি আর বাঘা, তার পরের তাঁবুতে বিনয়বাবু আর মৃণু, তার পরের তাঁবুতে মিঃ ফিলিপ। কুলিরা গেল কাছাকাছি কোন গ্রামে রাত কাটাতে। রাত দশটার ভিতরেই খাওয়া-দাওয়া সেরে সকলে শুয়ে পড়লুম !…

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না, হঠাৎ বাঘার ঘন ঘন চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি, বিমল তাঁবুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার বন্দুকটা পরীক্ষা করছে।

আমি জেগেছি দেখে, সে বললে, "কুমার বাঘা অকারণে চ্যাঁচায় না। শীগগির বন্দুক নাও—"

এমন সময়ে বাহির থেকে মৃণুর গলা পাওয়া গেল—"বিমলদা, কুমারদা ! বাঘা চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করে কেন ?

—"কি সর্বনাশ, মৃণু তাঁবুর বাইরে ! এস, এস, বেরিয়ে এস"—বলেই বিমল তাঁবুর ভিতর থেকে অদৃশ্য হল। আমিও অবিলম্বে বন্দুক নিয়ে তার পিছনে পিছনে ছুটলুম।

বেরিয়ে গিয়ে দেখি, ইতিমধ্যে কখন বাইরে এসে রামহরি মৃণুকে ধরে টানাটানি আরম্ভ করেছে, আর থেকে থেকে বলছে, "তোমার পায়ে পড়ি দিদিমণি, তাঁবুর ভেতরে চল !"

মৃণু বললে, "আমাকে ছেড়ে দাও রামহরি, ছেড়ে দাও। আমারও হাতে বন্দুক আছে—আমি কারুকে ভয় করি না !"

বিমল কঠিন কণ্ঠে বললে, "মৃণু, এখনি তাঁবুর ভেতরে যাও !"

তাঁবুর মধ্য থেকে বিনয়বাবুর ডাক শোনা গেল, "মৃণু, মৃণু !"

—"যাও মৃণু তোমার বাবাকে আর ভয় দেখিও না!"

মৃণু অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সেখান থেকে চলে গেল।

এমন সময় কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে ফিলিপ সাহেব এসে বললেন, "ব্যাপার কি মশাই! এত গোলমাল কিসের—" বলতে বলতে হঠাৎ আর্তনাদ করে তিনি একলাফে পিছিয়ে গেলেন!

আমি বললুম, "কি হল মিঃ ফিলিপ, হল কি?"

—"আমার বুকের উপরে কি একটা এসে লেগেছে!"

পর-মুহূর্তে বিমলের টর্চের আলো গিয়ে পড়ল ফিলিপ সাহেবের বুকের উপরে! তাঁর জামার বুক-পকেটে সংলগ্ন হয়ে আছে একটা উজ্জ্বল ইস্পাতের শলাকা!

শলাকাটা জামা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে দেখতে ফিলিপ সাহেব বললেন, "হুঁ, এ যে দেখছি 'ব্লো পাইপের তীর'! ভাগ্যে আমার বুক-পকেটে আছে একটা 'গান-মেটালে'র সিগারেট-কেস, তাই এ-যাত্রা বেঁচে গেলুম! সিগারেট-কেস আমার বর্মের কাজ করেছে—ধন্য ভগবান!"

বিমল বিস্মিতস্বরে বললে, "ব্লো-পাইপ! আমি তো জানতুম ও-অস্ত্র ব্যবহার করে বোর্নিওর লোকেরা—"

—"না, দক্ষিণ আমেরিকাতেও ব্লো-পাইপের ব্যবহার আছে। এ শলাকা বিষাক্ত, আহত হলে আর রক্ষা নেই। নিশ্চয়ই এখানে শত্রুর আবির্ভাব হয়েছে, সে আবার অস্ত্র ছুঁড়তে পারে। আসুন ঐ বড় পাথর খানার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নি।"

পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলুম।

চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে। তার আলোর উজ্জ্বলতা কমে এলেও চারিদিক দেখা যাচ্ছিল অস্পষ্টভাবে।

পিছনে চাঁদ নিয়ে ডান-দিকের পাহাড় ও অরণ্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—যেন কালিমাখা চিত্র। সেদিকে জনপ্রাণীর সাড়া নেই।

বাঁ-দিকের অরণ্য চাঁদের আলোয় করছে ঝিলমিল ঝিলমিল সেদিকেও কেউ নেই।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আচম্বিতে ডানদিকের অন্ধকার ফুঁড়ে একে একে বেরিয়ে আসতে লাগল মূর্তির পর মূর্তি। ক্রমে সংখ্যায় হল তারা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন। তাদের সর্বাগ্রে যে মূর্তিটা রয়েছে, তার বিরাট আকার দেখেই অনুমান করতে পারলুম সে হচ্ছে কালো বাজ স্বয়ং!

বিমল বললে, "মূর্তিগুলো আমাদের দিকেই আসছে। সবাই বন্দুক তোল, ওরা আরো কাছে এলেই গুলি ছুঁড়বে।"

আমি বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করলুম কালো বাজের দিকে।

মূর্তিগুলো পায়ে পায়ে খুব কাছে এসে পড়ল। বন্দুকের ঘোড়া টিপি টিপি করছি, এমন সময়ে মূর্তিগুলো হঠাৎ স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই সভয়ে চিৎকার করে উঠে প্রাণপণে দৌড় মেরে একসঙ্গেই আবার অন্ধকারের অন্তরালে মিলিয়ে গেল।

বিমল আমার হাত চেপে ধরে অভিভূত স্বরে বললে, "দেখ, দেখ, বাঁ-দিক চেয়ে দেখ।"

ও কী দৃশ্য! বাঁ-দিকের চন্দ্রালোকে কতকটা স্পষ্ট অরণ্য ভেদ করে বেরিয়ে আসছে মূর্তির পর মূর্তি! ভালো করে দেখা যাচ্ছিলনা, তবু এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, প্রত্যেক মূর্তিই কালির মতন কালো এবং প্রত্যেক মূর্তিই লম্বায়-চওড়ায় মানুষের চেয়ে ঢের বড়! তারা মাটির উপর দিয়ে চলছে মাতালের মতন টলতে টলতে এবং তাদের ভাবভঙ্গি সম্পূর্ণ অমানুষিক! প্রত্যেক মূর্তিই উলঙ্গ!

আমার বুক ধড়-ফড় করে উঠল! এমন অস্বাভাবিক ও অভাবিত দৃশ্য আর কখনো দেখিনি!

কে এরা? পৃথিবীর জীব? না নরকের মূর্তিমান অভিশাপ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রক্তাক্ত পদচিহ্ন

বিস্ময়-নীরবতার মাঝখানে সর্বপ্রথমে কথা কইলে বিমল। সে ফিলিপের কাঁধের উপরে হাত রেখে ঠেলা মেরে বললে, "মিঃ ফিলিপ, কে ওরা ? ওরা কি পৃথিবীর মানুষ ?"

ফিলিপ হতভম্বের মতো বললেন, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না !"

এর মধ্যে মৃণু আবার কখন ছুটে বেরিয়ে এসেছে এবং তার পিছনে পিছনে বিনয়বাবুও।

বিনয়বাবু মৃণুর একখানা হাত চেপে ধরে বললেন, "মৃণু, মৃণু ! তুমি শীগগির তাঁবুর ভেতরে চলে এস !"

মৃণু রাজি নয় দেখে তিনি তাকে জোর করে টানতে টানতে আবার তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু সেই বিভীষণ মূর্তিগুলো একবারও আমাদের দিকে ফিরে তাকালো না ; দেখলে মনে হয়, আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা যেন সম্পূর্ণ অচেতন। কয়েক মুহূর্ত তারা পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে আবার একসঙ্গে অগ্রসর হল।

রামহরি আর্তস্বরে বলে উঠল, "এই গো ! এইবারে ভূতগুলো আমাদের ঘাড় ভাঙতে আসছে !"

বিমল বললে, "না। ওরা যাচ্ছে ঐ ঝরণার দিকে। ওরা বোধহয় আমাদের দেখতেই পায় নি।"

ফিলিপ বললেন, "লাল-মানুষগুলো নিশ্চয় ওদের দেখেই পালিয়ে গিয়েছে। আর ওরাও চলেছে তাদেরই পিছনে !"

আমি বললুম, "দেখ বিমল, দেখ! মূর্তিগুলো কি-রকম দু-দিকে হেলে পড়ে টলতে টলতে এলোমেলো পায়ে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষরা তো ওভাবে চলে না।"

দেখতে দেখতে মূর্তিগুলো ঝরণার কাছে গিয়ে মোড় ফিরে বনের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ! বাতাস নিঃসাড়, অরণ্যও নীরব। শোনা যায় খালি নির্ঝরের গুঞ্জন-গান; দেখা যায় তার জলের ধারায় চাঁদের আলোর ফুলঝুরি।

তারপরেই আচম্বিতে ভয়াবহ প্রাণ-কাঁপানো আর্তনাদের ঐকতান জেগে উঠে সেই স্তব্ধ নিশীথের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল, ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। একজন নয়, দু-জন নয়—যেন অনেক লোক একসঙ্গে সভয়ে বা মৃত্যু-যাতনায় চিৎকার করে কেঁদে উঠল! বনের ভিতরে বিষম একটা হুটোপুটির শব্দও শোনা যেতে লাগল এবং এটাও লক্ষ্য করলুম যে, তিনচারটে বড় বড় গাছ সশব্দে দুলে দুলে উঠছে।

রামহরি মাটির উপরে উবু হয়ে বসে পড়ল। ফিলিপ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিনয়বাবু তাঁবুর ভিতর থেকে ব্যস্তস্বরে চিৎকার করে বার বার আমাদের ডাকতে লাগলেন।

বিমল বললে, "রামহরি, তুমি তাঁবুর ভিতরে যাও। বিনয়বাবুকে গোলমাল করতে মানা কর। আমাদের এখন এইখানেই দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে হবে।"

অরণ্য আবার শব্দহীন। নিঝুম রাত নিয়েছে যেন সমাধির মৌন-ব্রত। প্রায় ছয়-সাত মিঃ কেটে গেল, কিন্তু আর কোন বিভীষিকারই সাড়া পাওয়া গেল না। ঐ চন্দ্রকরোজ্জ্বল অরণ্যের শ্যামল যবনিকার ওপারে এইমাত্র কোন বিয়োগান্ত দৃশ্যের মারাত্মক অভিনয় হয়ে গেল, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি সেই কথাই ভাবতে লাগলুম।

এতক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিলিপ বললেন, "বিমলবাবু, এ-অঞ্চলে যা-কিছু জানবার কথা সমস্তই আমি সংগ্রহ করেছিলুম। কিন্তু

এইমাত্র যে কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিগুলো দেখলুম, ওদের কোন কথাই তো আমার নোটবুকে লেখা নেই! ওদের রহস্য কিছুই জানি না বটে, তবে এটা বেশ বুঝতে পারছি যে, এখানকার লাল-মানুষরা ওদের জানে আর যমের মতো ভয় করে, তাই আমাদের আক্রমণ করতে এসে ওদের দেখেই ভীরু হরিণের মতো পালিয়ে গেল।"

আমি বললুম, "কিন্তু পালিয়ে গিয়েও লাল-মানুষরা আত্মরক্ষা করতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না। জঙ্গলের ভিতর থেকে যে আর্তনাদ ভেসে এল, তা আমরা সকলেই শুনেছি!"

বিমল বললে, "আমার ইচ্ছে হচ্ছে, চুপি-চুপি গিয়ে একবার জঙ্গলের ভিতরে উঁকি মেরে আসি!

ফিলিপ সচকিত কণ্ঠে বললেন, "রক্ষা করুন মশাই, আপনার ঐ ভীষণ ইচ্ছাকে দমন করুন! জঙ্গলের ভেতরেই চাপা থাক্, তা দেখবার ইচ্ছা আমার একটুও নেই!"

বিমল বললে, "আচ্ছা, আপাতত আমার ইচ্ছাকে দমন করছি। কিন্তু রাত পোয়ালেই জঙ্গলের ভেতরে আমাকে যেতেই হবে, কারুর মানা তখন শুনব না।"

আরো ঘণ্টাখানেক আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু উল্লেখ-যোগ্য আর কোন ঘটনাই ঘটল না। এবং সে জন্যে আমি দুঃখিত নই, কারণ অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের উপর দিয়ে যে-সব ঘটনার পর ঘটনার ঝটিকা বয়ে গেল, এক রাত্রের পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট!

তারপর তাঁবুর ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম বটে, কিন্তু মৃণু ছাড়া আমাদের প্রত্যেককেই পালা করে সারারাত পাহারা দিতে হল। বাঘা তো সমস্ত রাতটাই জেগে জেগে কাটিয়ে দিলে! সে এত উত্তেজিত হয়েছিল যে, তার চিৎকার একবারও থামল না।

পূর্ব-আকাশে উষার প্রথম দীপ্তি ভালো করে ফুটে উঠতে না-উঠতেই বিমল আমাকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিলে। উঠে বসে দেখি, বিমল ও ফিলিপ ধরাচূড়ো পরে প্রস্তুত।

বিমল চুপি চুপি বললে, "কুমার ভায়া, বনের ভেতরে যেতে চাও তো চটপট তৈরি হয়ে নাও। মৃণু বোধহয় এখনো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্ন দেখছে। সে জাগলে এখনি সঙ্গে যাবার বায়না ধরবে!"

তৈরি হতে আমার পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না। তারপর পা টিপে টিপে তাঁবুর ভিতর থেকে তিনজনে বেরিয়ে পড়লুম।

প্রভাত এসেছে রূপোলী আলো আর পাখির ঝঙ্কার সঙ্গে নিয়ে। গাছের পাতা ঝিলমিল করছে বাতাসের আদর-ছোঁয়ায়! দূরে দূরে বরফে-মোড়া পাহাড়গুলিকে মনে হচ্ছে যেন চকচকে ইস্পাতের পাত দিয়ে গড়া। কোথাও বিভীষিকা বা রহস্যের অভাস নেই।

আমরা ঝরণার কাছে এসে দাঁড়ালুম। কাল রাতে এইখান থেকেই সেই লাল-মানুষদের ও ভীষণ মূর্তিগুলোকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছিলুম।

ঝরণাটি ঝরে পড়ে বয়ে যাচ্ছে একটি উপত্যকার উপর দিয়ে। ছোট-বড় পাথরের উপরে তার স্বচ্ছ সঙ্গীতময় জলের গতি দেখলেই মনে পড়ে নৃত্যশীল কলহাস্য-চঞ্চল শিশুকে। ঝরণার ধারাটি চওড়ায় পাঁচ হাতের বেশি হবে না। ঝরণার পরেই অগভীর বন—একটি পায়ে-চলা পথের রেখা তার ভিতরে প্রবেশ করেছে। সেই পথ ধরে আমরা সাবধানে চারিদিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলুম।

অরণ্য অগভীর বটে, কিন্তু ছোট নয়। অনেক-রকম গাছ রয়েছে এবং এক-একটা উঁচু ডালে বসে আছে সারি সারি ছোট ছোট জাতের বানর। তারা আমাদের দেখে বিরক্ত হয়ে মুখ ভ্যাংচাতে ও কিচির-মিচির ভাষায় গালাগালি দিতে লাগল।

কিন্তু বনের ভিতর মিনিট-পাঁচ ধরে এগিয়েও সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না।

ফিলিপ বললেন, "যাদের খোঁজে আমরা এসেছি, তারা বোধহয় এ পথে আসে নি।"

বিমল হঠাৎ মাটির দিকে আঙুলি-নির্দেশ করে বললে, "দ্বিঃ

ফিলিপ, ওটা কি দেখুন দেখি !"

পথের উপরে পড়েছিল একখানা ভাঙা লাঠির আধখানা। অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে তাছাড়া আর কিছু মনে হল না।

ফিলিপ হেঁট হয়ে লাঠিগাছা তুলে নিলেন। তারপর সেটা ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "দেখছি এর ভেতরটা ফাঁপা। বিমলবাবু, এটা হচ্ছে একটা ভাঙা 'ব্লো-পাইপ' !"

বিমল দণ্ডটা ফিলিপের হাত থেকে নিয়ে বলল, "দেখেই বোঝা যায়, এটা হচ্ছে সদ্য-ভাঙা। কিন্তু এটা ভাঙল কেন ?"

ফিলিপ বললেন, "ব্লো-পাইপ ব্যবহার করে লাল-মানুষরা। হয়তো কাল আমাকে বধ করার জন্যে এই ব্লো-পাইপটাকেই ব্যবহার করা হয়েছিল !"

আমি বললুল, "কিন্তু এটুকু সহজেই আন্দাজ করা যায় যে, লাল-মানুষরা নিজেদের অস্ত্র নিজেরাই ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নি।"

ফিলিপ বললেন, "তাহলে বলতে হয় ব্লো-পাইপের এ দুর্দশা হয়েছে সেই অমানুষিক মূর্তিগুলোর হাতেই—যাদের দেখে কাল আমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল !"

হঠাৎ পথের আর এক জায়গায় আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, "বিমল, বিমল, রক্তের দাগ !"

বিমল সেইখানে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, "কুমার, এ খালি রক্তের দাগ নয়—এ হচ্ছে রক্ত-মাখা পায়ের দাগ !"

আমিও দাগগুলো ভালো করে দেখবার জন্যে সাগ্রহে সেইখানেই বসে পড়লুম।

হ্যাঁ পায়ের দাগ বটে, কিন্তু আশ্চর্য পায়ের দাগ ! মাটির পটে বিবর্ণ রক্ত-রেখায় আঁকা রয়েছে পায়ের পাঁচ-পাঁচটা আঙুলের ও পদতলের চিহ্ন—তা যে কোন চতুষ্পদ জন্তুর পদচিহ্ন নয়, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তা মানুষের পদচিহ্ন বলেও মনে হয় না।

ফিলিপ বললেন, "বিচিত্র ব্যাপার! যে পায়ের এই দাগ, তার বুড়ো আঙুলটা নিশ্চয়ই অন্য চারটে আঙুল থেকে অনেক তফাতে আছে।"

আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখানে দুই পাশেই বড় বড় গাছের তলায় রয়েছে অনেকগুলো ঝোপঝাপ। প্রত্যেক ঝোপ এত উঁচু যে, তার ভিতরে বেশ প্রকাণ্ড জানোয়ার পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারে।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হল, একটা ঝোপের ফাঁকে বিদ্যুতের মতন চমকে উঠেই মিলিয়ে গেল কৌতূহলে প্রদীপ্ত একজোড়া চক্ষু! ঝোপটাও যেন একবার দুলে উঠল।

সচমকে বললুম, "মিঃ ফিলিপ, দেখেছেন?"

—"কি?"

"ঐ ঝোপের মধ্যে মানুষের চোখ!"

ফিলিপ এক লাফ মেরে ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। আধ মিনিট পরে বেরিয়ে এসে বললেন, "আপনি ভুল দেখছেন। ঝোপে কেউ নেই।"

বিমল তখন মাটির উপরে হেঁট হয়ে পড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সে চেঁচিয়ে ডাক দিলে, "মিঃ ফিলিপ, এদিকে আসুন— এদিকে আসুন!"

—"আবার কি ব্যাপার?"

—"এখানে আরো অনেক পায়ের দাগ রয়েছে। দাগগুলোর জন্ম যাদের পায়ের তলায়, তারা ঝোপের ওপাশ থেকে বেঁকে এদিকে এসেছে।"

আমি বললুম, "দাগগুলো তো এক পায়ের নয়! বোধহয় পাঁচ ছয় জোড়া পা থেকে ওদের উৎপত্তি।"

বিমল বললে, "কাল আমরাও তো একটি মূর্তিকে দেখিনি কুমার! ...দেখ, প্রত্যেক পদচিহ্ন রক্তাক্ত, নইলে এখানে এদের অস্তিত্ব আমরা

জানতেই পারতুম না।”

আমি অভিভূত স্বরে বললুম, “এতগুলো রক্তমাখা পদচিহ্ন! না জানি বনের ভিতর কাল রাত্রে কী কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়ে গেছে!”

বিমল বললে, “মূর্তিগুলো যখন এখানে এসেছিল, তখনো তাদের পায়ের রক্ত শুকোয় নি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, আমরা ঘটনাস্থলের খুব কাছেই এসে পড়েছি।”

বিমলের অনুমান মিথ্যা নয়। পায়ের দাগ ধরে আমরা একটা বড় ঝোপের ওপাশে গিয়ে দাঁড়াতেই যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য জেগে উঠল চোখের সামনে, তা দেখবার জন্যে আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলুম না?

রক্ত, রক্ত—সবখানেই রক্ত। কাল এখানে প্রবাহিত হয়েছিল রক্তের ঢেউ, এখন পাথুরে মাটির উপরে তা শুকিয়ে রয়েছে ভীষণ পুরু প্রলেপের মতো! আর তারই উপরে আড়ষ্ট হয়ে এখানে ওখানে পড়ে আছে সাতটা মানুষের মৃতদেহ! কোন কোন দেহ একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে—যেন কোন মহাবলবান বিপুল বাহুর চাপে এক-একটা দেহ মানুষের আকার হারিয়ে পরিণত হয়েছে হাড়গোড়-ভাঙা রক্তরাঙা মাংসপিণ্ডে! কারুর দেহ থেকে মুণ্ড এবং কারুর দেহ থেকে হাত বা পা যেন কেবল গায়ের জোরেই ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। প্রত্যেক দেহই লাল-মানুষের।

ফিলিপ কম্পিতকণ্ঠে বললেন, “কোন দেহেই অস্ত্রের দাগ নেই! যারা এদের আক্রমণ করেছিল নিশ্চয়ই তারা অসুরের মতন শক্তিমান! তারা লড়েছে খালি হাতেই—এদের বধ করেছে বিনা অস্ত্রেই! অথচ এরা সকলেই ছিল সশস্ত্র!”

বিমল খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, “কুমার, ভাগ্যে মৃণু আমাদের সঙ্গে আসে নি! এ বীভৎস দৃশ্য সে কিছুতেই সহ্য করতে পারত না!”

আচম্বিতে প্রায় আমাদের কানের কাছেই গুড়ুম শব্দে একটা বন্দুক গর্জন করে উঠল!

বিষম চমকে চোখের নিমেষে ফিরে দাঁড়িয়েই দেখি, হাত পাঁচ-ছয় তফাতে একটা ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক ঝলক ধোঁয়ার রেখা!

সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনেই সেই ঝোপটা লক্ষ্য করে বন্দুক তুললুম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রেত-মানুষ ও লাল-মানুষ

যে-ঝোপটা ধোঁয়া উদ্গার করলে, বন্দুকের লক্ষ্য তার দিকে স্থির করে ঘোড়া টিপি আর কি, এমন সময়ে হঠাৎ নারী-কণ্ঠে চিৎকার শুনলুম, "বিমলদা! কুমারদা! বা-রে, তোমরা ভগ্নী-হত্যা করতে চাও নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ ভেদ করে দাঁড়িয়ে উঠল বন্দুকধারিণী মৃণু!

আমাদের হাতের বন্দুক রইল হাতে—সকলেই দারুণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি!

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন ফিলিপ। দু-পা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "একি কাণ্ড! আপনি এখানে?"

বিপুল কৌতুকে খিল খিল করে হেসে উঠে মৃণু নাচতে নাচতে ও লাফাতে লাফাতে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল এবং তারপর উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, "ওহো, কেমন জব্দ, কেমন মজা! কেমন জব্দ, কেমন মজা!"

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, তার মানে?"

"বন্দুক ছুঁড়ে কেমন ভয় দেখিয়েছি! তোমরা হচ্ছ মহা মহা বীরপুরুষ, তুচ্ছ একটা বন্দুকের শব্দেই এত ভয়!"

—"তাহলে ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে ছিলে তুমিই?"

—"তা নয় তো আবার কে? তোমরা ভেবেছিলে আমাকে ফাঁকি

দিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছ ? মোটেই নয় দাদা গো, মোটেই নয়—আমাকে এত কাঁচা মেয়ে পাও নি ! তোমরা যে আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে, সেটা আমি আগেই জানতুম ! তাঁবুর পর্দার ফাঁকে আমার একজোড়া চোখ ছিল দস্তুরমত সজাগ, তাইতো যথাসময়ে লুকিয়ে তোমাদের পিছু নিতে পেরেছি।"

—"তোমার বাবা বাধা দিলেন না ?"

—"নাক যখন ডাকে, মানুষ তখন কারুকেই বাধা দিতে পারে না ! বাবা বোধহয় এখনো জাগেন নি।"

বিমল বললে, "মৃণু, তুমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ !"

—"উঁহু, অন্যায় স্বীকার করতে আমি রাজি নই ! কেন তোমরা আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছ ? কেন তুমি বললে যে, এখানকার রক্তারক্তি কাণ্ড দেখে আমি সহ্য করতে পারতুম না ? তাইতো আমার রাগ হল আর তোমাদের সহ্যশক্তি পরীক্ষা করবার জন্যে তাইতো দিলুম দুম করে বন্দুকটা ছুঁড়ে !"

—"কিন্তু আমরাও যদি বন্দুক ছুঁড়তুম ?"

মৃণু হাত-মুখ নেড়ে ছড়ার সুরে বললে,

"আমি নইকো বোকা, নইকো বোকা,
নইকো বোকা মেয়ে,
মরতে হেথায় আসিনিকো
হঠাৎ গুলি খেয়ে !

বন্দুক ছোড়বার ফাঁক তোমাদের দেব কেন মশাই ?"

বিমল চটে গিয়ে বললে, "থামো থামো। তুমি যে কথায় কথায় ছড়া বাঁধতে পারো, তা আমরা জানি ! কিন্তু এটা ছড়া বাঁধবার আর মশকরা করবার জায়গা নয়—এ হচ্ছে মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র !"

বিমলকে আরো-বেশি চটাবার জন্যে মৃণু আরো-বেশি হাত-মুখ নেড়ে বললে,—

"মৃত্যু আমার ভৃত্য, দাদা !

নিত্য হুকুম মানে,
তাইতো গাঁথি ছড়ার মালা
ভয়-ডর নেই প্রাণে !”

বিমল বোধহয় তাকে ধমক দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই খুব কাছ থেকে ক্রন্দন-স্বরে অজ্ঞাত ভাষায় কে চেঁচিয়ে উঠল !

আমি চমকে বললুম, “কে ও কেঁদে কথা কয় ?”

ফিলিপ বললেন, “লাল-মানুষের ভাষায় কে বলছে—বাঁচাও, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও !”

বিমল এগুতে এগুতে বললে, “শব্দ আসছে ঐ ঝোপটার ভেতর থেকে !”

ঝোপের মধ্যে ঢুকে দেখি, আর একজন লাল-মানুষ সেখানে চিৎ হয়ে পড়ে আছে,—তার মাথায়, মুখে সর্বাঙ্গে রক্তের লেখা, তুই চক্ষু মুদে অত্যন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে সে কাতর স্বরে চিৎকার করছে ?

ফিলিপ তার দেহ স্পর্শ করবামাত্র সে শিউরে উঠে চোখ মেলে তাকালে—কী আতঙ্ক-মাখা তার সেই চাহনি ! কিন্তু আমাদের দেখে সে যেন কতকটা আশ্বস্ত হল, সকাতরে নিজের ভাষায় কি বললে, বুঝতে পারলুম না।

কিন্তু ফিলিপ এদেশী ভাষা জানতেন, তাই তার কথার উত্তর দিলেন। পরে শুনেছিলুম, তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হল এই ভাবে ঃ

ফিলিপ জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার নাম কি ?”

—“ইকটিনাইক।”

—“কে তোমার এ দশা করেছে ?”

ভীষণ ভয়ে লোকটা কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠলে, “প্রেত-মানুষ, প্রেত-মানুষ !”

—“প্রেত-মানুষ ! সে আবার কি ?”

—“তারা পাহাড়ের গুহায় থাকে। জন্ম তাদের রাতের অন্ধকারে তাদের চোখে আছে আগুন, হাতে আছে দানবের শক্তি, বুকে আছে

অমানুষী হিংসা। ছায়ার মতো নিঃশব্দে তারা কখন আসে আর কখন অদৃশ্য হয়, কেউ জানতে পারেনা। কাল আমরা তাদেরই কবলে পড়েছিলুম।"

—"তোমরা কাল এখানে কি করতে এসেছিলে?

ইকটিনাইক একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "ও কথার জবাব আমি দিতে পারব না।"

—"কেন?"

—"ইনকার হুকুম!"

—"ইনকা? ইনকা মানে তো রাজা! তোমাদের শেষ ইনকা আটাহুয়াপ্পা মারা পড়েছেন চারশো বছর আগে। তারপর আর কোন ইনকার নাম তো আমি শুনি নি!"

—"বিদেশী, তোমরা আমাদের কথা কতটুকু জানো? আমাদের ইনকার সিংহাসন কোনদিন খালি হয় নি। আজও ইনকার রাজধানী আছে সূর্যনগরে।"

—"তোমাদের ইনকার নাম কি?"

—"মহামহিমময় সিনচি রোক্কা।"

—"তিনিও কি কাল তোমাদের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন?"

—"না। সুর্যনগরের বাইরে তিনি কোনদিন আসেন না। আমরা এসেছি কালো বাজের সঙ্গে। কিন্তু এখন আর আমার কথা কইবার শক্তি নেই......তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, আগে আমায় জল দাও।"

ফিলিপের ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠল কঠিন হাসি। তিনি বললেন, "ইকটিনাইক, তুমি যে আমাদের পরম শত্রু, সে কথা আমরা জানি। আমাদেরই অনিষ্ট করবার জন্যে কাল তোমরা এখানে এসেছিলে, তাই ভগবান তোমাকে শাস্তি দিয়েছেন। আমাদের কাছে জল চাইতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না?"

ইকটিনাইক বললে, "বেশ বুঝতে পারছি, আমি আর বেশিক্ষণ

বাঁচব না। আমার মাথা ফেটে গেছে, বুকে বিষম চোট লেগেছে, হাত আর পা ভেঙ্গে গিয়েছে। আমি তোমাদের শত্রু হলেও এই শেষ মুহূর্তেও তোমরা কি আমাকে দয়া করবে না?"

ফিলিপ কোন জবাব না দিয়ে সেইখানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। তারপর কিছুক্ষণ ধরে আহত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে বললেন, "দেখ ইকটিনাইক, আমি হচ্ছি পাশ-করা ডাক্তার। আমি যদি তোমার ভার নি তাহলে তোমাকে বাঁচাতে পারব বলেই বিশ্বাস করি। কিন্তু তোমার মতো শত্রুকে বাঁচিয়ে আমার লাভ?"

ইকটিনাইক আর্তকণ্ঠে বললে, "বিদেশী, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি আমার প্রাণ রক্ষা করতে পারো, তাহলে চিরদিন আমি তোমাদের বন্ধু হয়ে থাকব। আমার এখন মরতে ইচ্ছা নেই—বাড়িতে আমার বুড়ো মা-বাবা আছেন, আর আছে আমার ছেলে-মেয়ে-বউ। আমাকে বাঁচাও বিদেশী, আমি তোমার বন্ধু হব।"

এমন করুণ সুরে সে এই কথাগুলি বললে যে, আমার মন দয়ায় ভরে গেল। কিন্তু ফিলিপ অবিচলিত ভাবেই বললেন, "আমাদের কাছে তোমার বন্ধুত্বের কোনই মূল্য নেই।"

মৃণু বললে, "মিঃ ফিলিপ, আপনি যে এত নিষ্ঠুর তা আমি জানতুম না।"

তার দিকে মুখ ফিরিয়ে ফিলিপ একটু হাসলেন মাত্র।

ইকটিনাইক বললে, "বিদেশী, যদি বলি আমার বন্ধুত্ব মূল্যবান?"

—"কেন?"

—"তোমরা সূর্যনগরে যেতে চাও?"

—"সেইরকম ইচ্ছাই তো করছি।"

—"কিন্তু তোমরা কি সেখানে যাবার পথ জানো?"

—"জানি।"

—"না আসল পথের সন্ধান তোমরা জানো না। তোমরা যে পথের খবর রাখো, সে পথ ধরে কেউ কোনদিন সূর্যনগর পর্যন্ত গিয়ে

পৌঁছতে পারবে না।”

—“কেন?”

—“সে পথের উপর লুকিয়ে পাহারা দেয় হাজার হাজার প্রহরী। এই পথের পথিক হয়ে আজ পর্যন্ত কত বিদেশী পরলোকে গিয়ে হাজির হয়েছে, তার হিসাব কেউ রাখে না। কাল যদি প্রেত-মানুষেরা এসে না পড়ত তাহলে তোমরাও কেউ প্রাণে বাঁচতে না!”

—“তাই নাকি? তারপর?”

—“সূর্যনগরে যাবার আর একটি গুপ্তপথ আছে, আজ পর্যন্ত কোন বিদেশী তার খবর পায় নি। সে পথ দুর্গম বটে, কিন্তু আর সব দিক দিয়েই নিরাপদ। তুমি যদি আমার প্রাণ বাঁচাও, আমি তোমার কাছে সেই পথের সন্ধান দিতে পারি।”

ফিলিপের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, “ইকটিনাইক, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি।”

ইকটিনাইক বললে, “তাহলে আগে আমাকে জল দাও।”

ফিলিপ বললেন, “বিমলবাবু, ঝরণা এখান থেকে বেশি দূর নয়, আপনারা কেউ গিয়ে জল নিয়ে আসুন!”

—“বেশ, আমিই যাচ্ছি” বলেই মৃণু দ্রুতপদে ছুটে চলে গেল।

ইকটিনাইক বললে, “বিদেশী, প্রাণের মায়া বড় মায়া। আমার এই অবস্থায় তোমরা যদি আমাকে এই বনের ভেতর ফেলে রেখে যাও তাহলে মৃত্যু আমার নিশ্চিত। কিন্তু এমন কুকুরের মতন মরতে আমি পারব না! তাই প্রাণের মায়ায় আমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে।”

ফিলিপ বললেন, “তুমি আবার কি বিশ্বাসঘাতকতা করবে?”

ইকটিনাইক উত্তেজিত স্বরে বললে, “বিশ্বাসঘাতকতা নয়? বিদেশী, তোমরা এসে আমাদের দেশ কেড়ে নিয়েছ, স্বাধীনতা হরণ করেছ—আমাদের করে রেখেছ ভেড়া-গরুর মতো। তোমাদের কাছ থেকে সরে এসে বিজন পর্বতের কোলে গহন-বনের ভিতরে আমরা একটি ছোট স্বপ্নপুরী রচনা করেছি, সেইখানে লুকিয়ে বসে মাঝে মাঝে আমরা

কল্পনায় ভবিষ্যতের স্বর্গকে দেখবার চেষ্টা করি, কিন্তু সে সুখেও তোমরা আমাদের বঞ্চিত করতে চাও। তোমরা আমার দেশের শত্রু, তোমাদের কাছে আমাদের স্বপ্ন-স্বর্গের পথের সন্ধান দেওয়া কি বিশ্বাসঘাতকতা নয়? কিন্তু কি করব, উপায় নেই—উপায় নেই—প্রাণের মায়া বড় মায়া! তাই প্রাণের মায়ায় আমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে।"

হঠাৎ দূর থেকে একটা বন্দুকের গর্জন শোনা গেল।

বিমল চমকে উঠে বললে, "আবার বন্দুক ছোঁড়ে কে?"

আমি বললুম "মৃণু বোধহয় পাখিদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে!"

তারপরেই শুনলুম মৃণুর চিৎকার!—"বিমলদা! কুমারদা!"

ফিলিপ লাফিয়ে উঠে বললেন, "ওকী ব্যাপার?"

ইকটিনাইট বিকৃত স্বরে বললে, "প্রেতমানুষ—প্রেতমানুষ!"

আমি ও বিমল প্রাণপণে ঝরণার দিকে ছুটে চললুম।

বিমল দৌড়তে দৌড়তে বললে, "মৃণুকে একলা ছেড়ে দিয়ে ভালো করি নি কুমার, ভালো করি নি!"

খানিক পরেই ঝরণার কাছে এসে পড়লুম। কিন্তু সেখানে মৃণু নেই—ঝরণার কাছে পড়ে আছে শুধু তার বন্দুকটা।

চিৎকার করে ডাকলুম, "মৃণু! মৃণু! মৃণু!"

কিন্তু মৃণুর কোন সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না। উদ্‌ভ্রান্তের মতন চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলুম—পাহাড়ের আনাচে-কানাচে, উপত্যকার এখানে-ওখানে, বনের ঝোপে-ঝোপে! তবুও মৃণুর দেখা নেই!

বিমল চেঁচিয়ে বললে, "মৃণু! তুমি কি আমাদের ভয় দেখাবার জন্য লুকিয়ে আছ? এখন দুষ্টুমি কোরো না মৃণু, সাড়া দাও—বেরিয়ে এস মৃণু! মৃণু!"

বিজন বন-পাহাড়ের ভিতর থেকে মৃণুর বদলে সাড়া দিলে কেবল প্রতিধ্বনি!

হতভম্বের মতন দুজনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে

পিছনে জাগল হা-হা রবে পৈশাচিক অট্টহাসি! সচমকে ফিরেই দেখলুম, কালো বাজের বিপুল মূর্তি। কেবল সে নয়, তার সঙ্গে রয়েছে আরো আট-দশটা মূর্তি—প্রত্যেকেরই হাতে এক একটা বন্দুক!

আমরাও চোখের পলক না ফেলতেই বন্দুক তুললুম।

কালো বাজ কর্কশ কণ্ঠে ইংরেজীতে বললে, "আমাদের সঙ্গে লড়বার চেষ্টা কোরো না। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখ!"

ইতিমধ্যে আমাদের পিছন দিকেও আবির্ভূত হয়েছে আর একদল বন্দুকধারী লাল-মানুষ!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বুড়ো ঠাকুরদা

আমাদের সামনে আট-দশটা বন্দুক—পিছনেও তাই। বাধা দেবার বা পালাবার কোন উপায়ই নেই। নিজের বন্দুকের মুখ নামিয়ে নীরবে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম।

বিমল বললে, "কালো বাজ, তোমার উদ্দেশ্য কি?"

কালো বাজ প্রথমটা জবাব দিলে না। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "বিদেশী, তোমরা, কোন দেশের লোক?"

—"ভারতবর্ষের।"

—"হ্যাঁ, তোমাদের দেখে আমারও সেই সন্দেহ হয়েছিল। শ্বেতাঙ্গরা আজ আমাদের 'লাল-মানুষ বলে ডাকে বটে, কিন্তু আমাদেরও পূর্ব-পুরুষরা এদেশে এসেছিলেন এশিয়া থেকেই। ভারতবর্ষ হচ্ছে এশিয়ার মুকুটমণি, ও-দেশের ওপরে আমার শ্রদ্ধা আছে।"

বিমল ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বললে, "সেই শ্রদ্ধার পরিচয় দেবার জন্যেই তোমরা বুঝি দল বেঁধে বন্দুক দিয়ে আমাদের বধ করতে এসেছ?"

কালো বাজের সুবিশাল দেহ বিপুল ক্রোধে ফুলে যেন আরো বড় হয়ে উঠল। কিন্তু কোন ক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ স্বরেই সে বললে, "আমি তোমাকে গোটাকয় প্রশ্ন করতে চাই,—জবাব দাও।"

—"কি প্রশ্ন বল।"

—"সুদূর ভারতবর্ষ থেকে তোমরা এদেশে এসেছ কেন ?"

—"আমরা নতুন নতুন দেশ দেখতে ভালোবাসি।"

—"কিন্তু ফিলিপ তোমাদের সঙ্গে এসেছে কেন ?"

—"মিঃ ফিলিপ আমাদের বন্ধু।"

—"জানো বিদেশী, ফিলিপের বন্ধুদের আমরা শত্রু বলে গণ্য করি।"

—"কেন ?"

—"ফিলিপ সূর্যনগরে যেতে চায়।"

—"সেটা এমন কিছু অন্যায় নয়। শুনেছি বাইরের কোন লোক আজ পর্যন্ত সূর্যনগরকে চোখে দেখে নি। এমন একটা অজানা দেশ দেখবার জন্যে কার মনে আগ্রহ জাগে না ?"

কালো বাজ অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে নিজের হাতের বর্শা-দণ্ডটা সজোরে মাটির উপরে ঠুকতে ঠুকতে চেঁচিয়ে বললে, "আগ্রহ, কিসের আগ্রহ ? সূর্যনগর হচ্ছে আমাদের স্বপ্ন-নগর—আমাদের সাধনার তীর্থভূমি—আমাদের কল্পনার আনন্দলোক! তার মধ্যে কোন বাইরের লোকের পদার্পণ করবার অধিকার নেই! সেখানে যে কোন বিদেশী আসবে মৃত্যু তার নিশ্চিত!"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম "আমাদের সঙ্গে যে মেয়েটি এসেছিল তাকেও কি তোমরা বন্দী করেছ ?"

কালো বাজ হা-হা করে হেসে উঠে বললে, "হ্যাঁ গো বিদেশী, হ্যাঁ! সেই দেবী এখন সূর্যনগরের পথে যাত্রা করেছেন।"

বিমল ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠল—আমি সবিস্ময়ে বললুম, "সূর্য-নগরের পথে!"

কালো বাজ বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ—সূর্যনগরের পবিত্র পথে। বিদেশী এই দেবী কি সূর্যনগরে যাবার জন্যেই তোমাদের সঙ্গে আসেন নি?"

আমরা জবাব দিলুম না।

কালো বাজ আমাদের মুখের সামনে হাতির শুঁড়ের মতন মোটা একখানা হাত নেড়ে বললে, "তোমরা স্বীকার কর আর না কর, কিন্তু আমরা জানি, দেবী এসেছেন আমাদের আকর্ষণেই। জানো বিদেশী দেবী যে এখানে আসবেন, বহুকাল আগেই সূর্যনগরের এক পুরোহিত সেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে স্বপ্নে তিনি দেখেছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের দেশ থেকে এসেছেন এক অপূর্ব সুন্দরী শ্যামলা দেবী, আর সূর্যনগরের তোরণে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাদরে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের ইনকা নিজে। তারপর ইনকার সঙ্গে হল দেবীর বিবাহ আর দেবীর বরে সূর্যনগর ফিরিয়ে পেলে তার সমস্ত হারানো গৌরব! এই দেবীর জন্যে আজ একশো বছর ধরে সূর্যনগর অপেক্ষা করে আছে—এতদিন পরে আমরা পেয়েছি তাঁর দেখা!"

এই আশ্চর্য কথার উত্তরে কি বলব আমরা তো ভেবেই পেলুম না—কালো বাজ কি পাগল? না সে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছে?

সে আবার বললে, "এতক্ষণে বুঝেছি, ফিলিপ আর তোমাদের প্রয়োজন হয়েছে দেবীকে এখানে এনে হাজির করবার জন্যেই।"

বিমল বললে, "বেশ তো সে প্রয়োজন যখন সিদ্ধ হয়েছে তখন আমাদের বিদায় করে দিলেই কি ভালো হয় না?"

কালো বাজ তার তীক্ষ্ণ অথচ কুৎকুতে চোখদুটো নাচাতে নাচাতে সকৌতুকে বললে, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে, তোমাদের মতন আপদকে ধরে রেখে আর কোন লাভ নেই!"

বিমল বললে, "তাহলে আমাদের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও।"

কালো বাজ বললে, "এত বেশি ব্যস্ত হচ্ছ কেন বল দেখি? বুড়ো ঠাকুরদার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে না?"

আমি বিস্মিত স্বরে বললুম, "বুড়ো ঠাকুরদা আবার কে?

হো-হো হা-হা রবে হাসতে হাসতে কালো বাজ একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়ল! তারপর পেটে ছুই হাত চেপে ধরে অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললে, "বটে, বটে, বটে! আমাদের বুড়ো ঠাকুরদাকে তোমরা চেনো না? অথচ ঠাকুরদা এই পৃথিবীতে লীলা-খেলা করছেন যুগ-যুগান্তর ধরে! ঠাকুরদার বয়স কেউ বলে একশো বছর, কেউ বলে ছুশো বছর—তবু এখনো তাঁকে দাঁত বাঁধাতে হয় নি, এখনো তিনি মাংসের ভক্ত, মোটা মোটা হাড় চিবোতে পারেন কড়্মড় করে! আমাদের এমন বুড়ো ঠাকুরদাকে তোমরা চেন না, আরে ছোঃ!"

বিমল বললে, "তোমাদের ঠাকুরদা চুলোয় যাক, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা আর তোমার প্রলাপ শুনতে চাই না, পথ ছাড়ো!

কালো বাজ হঠাৎ ক্ষাপ্পা হয়ে চিৎকার করে উঠল, ওরে কুকুর, ওরে শূকর, কি বললি তুই—"।

বিপদে বিমল সর্বদাই মাথা ঠাণ্ডা রাখত বটে, কিন্তু তার মুখের উপর তাকে গালাগালি দিয়ে কারুরই রক্ষা পাবার উপায় ছিল না—তখন সে একেবারে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। কালো বাজ তাকে গালাগালি দিয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মুখের বাকি কথা মুখেই রইল, বিমলের মুষ্টিযুদ্ধে সুপটু হস্তের প্রচণ্ড এক ঘুষি আচমকা গিয়ে পড়ল ঠিক তার চোয়ালের উপরে এবং পরমুহূর্তে তার বিরাট দেহ হাত পা ছড়িয়ে ভূতলশায়ী হল সশব্দে!

অতবড় একটা দানব দেহকে এত সহজে 'পপাত ধরণীতল' হতে দেখে লাল-মানুষেরদল বিপুল বিস্ময়ে কোলাহল করে উঠল। আমি ভাবলুম এই ফাঁকে গোলে-হরিবোলে হঠাৎ বন্দুক ছুঁড়ে চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ি! কিন্তু কী হুঁশিয়ার এই লাল-মানুষগুলো। আমরা বন্দুক তুলতে-না-তুলতেই তারা সবাই চারিদিক থেকে বাঘের মতন আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং চোখের নিমেষে আমাদের বন্দুকে ছুটো নিল কেড়ে! আমরা বারকয়েক ঘুষি চালিয়ে জন-চারেক লোককে কাবু করলুম বটে, কিন্তু তাদের কবল থেকে কিছুতেই ছাড়ান পেলুম

না—অনেকগুলো করে বলিষ্ঠ বাহু আমাদের দুজনকে যেন অক্টোপাসের মতন বেঁধে ফেলে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে এবং আমাদের প্রত্যেকের মাথার উপরে স্থির হয়ে রইল বন্দুকের পর বন্দুকের চকচকে কালো নল! এরা ইচ্ছা করলেই আমাদের বধ করতে পারত, কিন্তু কালো বাজের হুকুম পায় নি বলেই বোধহয় আমাদের উপরে গুলিবৃষ্টি করলে না!

এদিকে বিমলের বজ্র-মুষ্টির প্রভাব কতকটা সামলে নিয়ে কালো বাজ প্রথমে ধীরে ধীরে উঠে খানিকক্ষণ দুই পা জড়িয়ে চুপ করে বসে রইল। বোধহয় এতগুলো লাল-মানুষের সামনে এমনভাবে অপদস্থ হয়ে মুখ তুলে কথা কইতে তার লজ্জা করছিল।

কিন্তু তার এ ভাব বেশিক্ষণ রইল না। আচম্বিতে এক হুঙ্কার দিয়ে সে দাঁড়িয়ে উঠল এবং তারপর রাগে কাঁপতে কাঁপতে ভয়ানক চিৎকার করে বললে, "ওরে কুকুর, ওরে শেয়াল এইবার তোদের কী দশা করি ছাখ!"

বিমল বললে, "ওরে বাঁদরমুখো কালো বাজ, এই লোকগুলোকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে আমাকে আর একবার গালাগালি দিয়ে মজা ছাখ না!"

কালো বাজ গর্জন করে বললে, "কি বললি, আমি বাঁদরমুখো? আচ্ছা ছাখ তবে।"—এতক্ষণ সে আমাদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলছিল, এইবার নিজের ভাষায় সঙ্গীদের ডেকে সে যে কি হুকুম দিলে, বুঝতে পারলুম না।

কিন্তু লালমানুষেরা তার কথা শুনছিল না, তারা কালো বাজের পিছনকার বনের দিকে আড়ষ্ট ভাবে ভীত চোখে তাকিয়ে ছিল। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলুম।

যা দেখলুম, সেই অবস্থাতেও সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল! বনের তলায় একটা বড় ঝোপ—সূর্যের কিরণও সেখানকার অন্ধকারকে দূর করতে পারে নি, কতকটা উজ্জ্বল করে তুলেছে মাত্র। সেই তরল অন্ধকার বা অস্পষ্ট আলোকের মধ্যে জেগে উঠেছে ভয়ঙ্কর দেখতে একখানা কালো-

কুচকুচে মুখ! হয়তো সেখানা মানুষের মুখ—হয়তো সেখানা মানুষের মুখ নয়! সেই মস্ত কালো মুখখানা আবছায়ার সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়ে আছে যে, স্পষ্ট করে কিছুই বোঝবার যো নেই—কিন্তু তার দুই চোখে জ্বলছিল দু-দুটো আগুনের শিখা!

আমাদের সকলকে অমন ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে কালো বাজও ফিরে তাকালে সেই ঝোপের দিকে! তারপরেই বিকট আর্তনাদ করে মারলে সুদীর্ঘ এক লাফ!

ঠিক সেই সময়েই বনের ভিতর থেকে ভেসে এল পরে পরে একাধিক বন্দুকের আওয়াজ!

ঝোপের ভিতর চোখের আলো দপ্ করে নিভে গেল, সেই বীভৎস মুখখানাও মিলিয়ে গেল ছায়ার পটে যেন ছায়াছবির মতন!

কালো বাজ কিন্তু ঝোপের দিকে আর ফিরেও তাকালে না, স্বদেশী ভাষায় এক নিঃশ্বাসে কি হুকুম দিয়ে পাগলের মতন একদিকে ছুটে চলল!

অন্যান্য লালমানুষদেরও দেখে মনে হল সেখান থেকে পালাতে পারলে যেন তারা বাঁচে কিন্তু পালাবার সময়েও তারা আমাদের দেহ-দুটোকে শূন্যে তুলে প্রাণপণে চেপে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যেতে ভুললে না। আমরা মুক্তির চেষ্টায় ছট্‌ফট্ করতেই এমন লাঠি ও বন্দুকের খোঁচা খেলুম যে, মানে মানে চুপচাপ থাকাই শ্রেয় মনে করলুম।

কালো বাজ ও তার সঙ্গীরা ছুটতে ছুটতে উৎকণ্ঠিত ভাবে বারে বারে পিছন ফিরে তাকাতে লাগল—যেন তারা সকলেই প্রতি মুহূর্তেই সন্দেহ করছে, এখনি কোন মূর্তিমান বিভীষণ আত্মপ্রকাশ করতে পারে ওখানে!

এত বিপদের মধ্যেও না ভেবে পারলুম না যে, এরা এতগুলো জোয়ান লোক কার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে! এদের পিছনে পিছনে কে তেড়ে আসতে পারে? অন্ধকার ঝোপে আমরা কার মুখ দেখলুম? তাকেই কি এরা প্রেতমানুষ বলে ডাকে? কাল রাতে ঐ-রকম প্রেতমানুষের দলই কি এদের আক্রমণ করেছিল?

উঁচু-নিচু পাহাড়ে-পথ ভেঙে লালমানুষরা ছুটে চলেছে তো ছুটে চলেছেই—তাদের হাতের চাপে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হল।

হঠাৎ কালো বাজ কি হুকুম দিলে—সঙ্গে সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল।

কালো বাজ ইংরেজীতে বলল, "ওহে, এইবারে আমরা বুড়ো ঠাকুরদার বাসার কাছে এসেছি।"

বনের ভিতরে জাগল আবার একাধিক বন্দুকের গর্জন!

কালো বাজ নিজের ভাষায় তাড়াতাড়ি কি বললে, লালমানুষরা আমাদের নিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল একদিকে। এবং তারপরে আমরা কিছু দেখবার আগেই তারা হঠাৎ আমাদের সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে —সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম কালো বাজের পৈশাচিক অট্টহাস্য!

শূন্যপথে আমাদের দেহ বোঁ বোঁ করে নিচের দিকে নামতে লাগল —প্রথম মুহূর্তে ভাবলুম, দুরাত্মারা বোধহয় আমাদের হত্যা করবার জন্যে পাহাড়ের উপর থেকে নিচের খাদে ফেলে দিলে। কিন্তু দ্বিতীয় মুহূর্তে আমাদের চোখ অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে যেতেই বুঝলুম, আমরা নেমে যাচ্ছি পাহাড়ের কোন গভীর গহ্বরের মধ্যে। তারপরেই পেলুম চারিদিকে কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ এবং সঙ্গে সঙ্গে জল কেটে তলিয়ে যেতে লাগলুম পাতালের দিকে! জলের ভিতরে হাত-পায়ের চাপ দিতেই হুস্ করে আবার ভেসে উঠলুম।

চারিদিকে সমাধির মতো স্তব্ধপ্রায় অন্ধকারে থই থই করছে মৃত্যুর মতন শীতল কালো জল। মাথা তুলে দেখলুম, প্রায় সত্তর-আশী ফুট উপরে গহ্বরের ছিদ্রপথে দেখা যাচ্ছে নীলাম্বরের সূর্যকর-লেখা। পাহাড়ের গায়ে স্বাভাবিক ভাবে এই গহ্বরের উৎপত্তি, কিংবা মানুষের হাতে এর সৃষ্টি, সেটা বুঝতে পারলুম না, কিন্তু এর চারিদিকের দেওয়াল যেমন খাড়া তেমনি তেলা। এর কোন দিক দিয়েই উপরে ওঠবার উপায় নেই। এই অদ্ভুত গিরি-গহ্বরটা প্রায় ছোটখাটো একটা পুকুরেরই মতো।

বিমল সাঁতার দিয়ে আমার পাশে এল। তারপর চুপিচুপি ডাকলে, "কুমার!"

—"কি বিমল ?"

—"ওদের বুড়ো ঠাকুরদাকে তুমি দেখেছ ?"

—"না। দেখতে ইচ্ছেও নেই।"

—"কিন্তু তাকে দেখতে তুমি বাধ্য।"

—"তার মানে!"

—"ঐ কোণে চেয়ে দেখ।" সে একদিকে আঙুলনির্দেশ করলে।

দেখলুম, অন্ধকারের কালিমা-মাখা বিরাট ও সুদীর্ঘ একটা দেহ আমাদের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে আছে অত্যন্ত ক্ষুধিত ও নির্মম ছুটো অগ্নিময় দৃষ্টি!

নবম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-গুহায়

লিখতে লিখতে আজও সেই ভয়াবহ দৃশ্যের কথা মনে করে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে শিউরে উঠছে।

অতি-গভীর প্রায়-পুকুরের মতো শৈল গহ্বর!—এত নিচে জলের উপরে আমরা অসহায় ভাবে ভাসছি যে, রৌদ্রোজ্জ্বল পৃথিবীর আলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছতে পারছে না। সেখানে দিনের বেলাতেও বিরাজ করে সন্ধ্যার মলিন ছায়া এবং সেখান থেকে মুখ তুলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গুহামুখে ফ্রেমে আঁটা সমুজ্জ্বল নীলাকাশের ছবি—কিন্তু সে যেন নাগালের বাইরে অন্য কোন স্বপ্ন-জগতের আকাশ! এবং মুখ নামিয়ে দেখতে পাচ্ছি গুহার এক ঘুটঘুটে কালো কোণে জেগে উঠেছে যেন কোন ছুঃস্বপ্ন জগৎবাসীর বর্ণনাতীত বিভীষিকা।

সেই জড়ের মতন স্থির ও পাথরের মতন মৌন দীপ্তচক্ষু জীবটা যে কোন্ জাতীয়, প্রথমে তা আন্দাজ করতে পারলুম না, কিন্তু দৈর্ঘ্যে তার

আকার যে ষোল-সতেরো ফুটের কম নয়, এটুকু বেশ বুঝতে পারলুম।

বিমল আবার ফিস ফিস করে বললে, "কুমার, ঐ হচ্ছে কালো বাজের বুড়ো ঠাকুরদা! ভালো করে চেয়ে দেখ, ও হচ্ছে একটা প্রাচীন কুমীর!"

কুমীর? হ্যাঁ কুমীরই বটে! ঘুমন্ত অথচ ক্ষুধিত ও জ্বলন্ত চোখে স্থির-দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল, কিন্তু আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে কিছুমাত্র ব্যস্ততা প্রকাশ করলে না।

বিমল বললে, "এত উঁচু পাহাড়ের গর্তে নিশ্চয়ই কুমীর থাকে না, লালমানুষেরাই ওকে এখানে এনে রেখেছে। বুড়ো-ঠাকুরদার পেট ভরাবার জন্যে নিশ্চয়ই আমাদের মতন আরো অনেক অভাগা মানুষকে ওরা এই গর্তের ভিতরে ফেলে দিয়েছে!"

আমি ভয়ার্ত স্বরে বললুম, "বিমল, গর্তের চারিদিকেই যে খাড়া পাথরের দেওয়াল—আমাদের মুক্তি পাবার যে কোন উপায়ই নেই!"

বিমল আমার কথার জবাব না দিয়ে বললে, "কুমীরটা এখনো আমাদের আক্রমণ করছে না কেন বুঝেছ? সে জানে তাড়াতাড়ি করবার কোনই দরকার নেই—এখান থেকে আমাদের পালাবার সব পথই বন্ধ! সে যখন-খুশি ধীরে-সুস্থে এগিয়ে এসে গপ্ করে আমাদের গিলে খেয়ে ফেলতে পারবে!······কুমার, বার কর, তোমার রিভলভার!"

লালমানুষরা আমাদের তাড়াতাড়ি স্বর্গে পাঠাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে রিভলবার কেড়ে নেবার সময় যে পায় নি, এ খেয়াল আমারও ছিল। কিন্তু এই বিরাট কুমীরের বিরুদ্ধে তুচ্ছ-দুটো রিভলবারের কোন মূল্যই নেই! তাই আমি বিস্মিত কণ্ঠে বললুম, "রিভলবার নিয়ে তুমি কি করতে চাও বিমল?"

—"কুমার, আমাদের দুজনেরই হাতে টিপ্ অব্যর্থ। কুমীরটা বেশি দূরে নেই, আর এখনো স্থির হয়েই আছে। আমরা চেষ্টা করলে একসঙ্গে গুলি ছুঁড়ে ওর চোখদুটো কাণা করে দিতে পারি। অন্ধ কুমীরকে ফাঁকি দেওয়া খুব কঠিন না হতেও পারে!"

বিমলের কথায় যদিও বিশেষ আশ্বস্ত হলুম না, তবু রিভলবার বার করলুম।

বিমলও রিভলবার বার করে বললে, "সাঁতার কাটতে কাটতে লক্ষ্য স্থির করা সহজ নয় বটে, তবু মনে রেখো কুমার, প্রথম চেষ্টাতেই আমাদের লক্ষ্য ভেদ করতেই হবে! কারণ আমাদের জীবন নির্ভর করছে এই প্রথম গুলি দুটোর উপরেই! তুমি দৃষ্টি রাখো কুমীরটার বাঁ-চোখের দিকে, ডান চোখের ভার আমার। আমি তিন পর্যন্ত গুণলেই গুলি ছুঁড়বে!"

কুমীরটা তখনো স্থির জলে মড়ার মতন নিশ্চেষ্ট হয়ে ভাসছিল, আমাদের রিভলবার তুলতে দেখেও তার ঘুমন্ত চোখদুটোর অগ্নিময় দৃষ্টি অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠল না।

বিমল গুণলে—"এক, দুই, তিন!"

ঠিক একসঙ্গেই আমাদের রিভলবার দুটো গর্জন করে উঠল—সেই বদ্ধ ও স্তব্ধ পাতালের মধ্যে রিভলবারের আওয়াজকে মনে হল কামানের ভৈরব হুঙ্কারের মতো!

পর-মুহূর্তেই কুমীরটা যেন বিদ্যুৎ-বিদ্ধের মতো একদিকে ছিটকে গিয়ে প্রকাণ্ড লাঙুল তুলে জলের উপরে করলে প্রচণ্ড এক আঘাত এবং সঙ্গে সঙ্গে গহ্বরের সমস্ত জল উথলে উঠে ফেনিল তরঙ্গ সৃষ্টি করে যেন টগবগ করে ফুটতে লাগল!

তার লাঙুলের বাইরে থাকবার জন্যে আমরা একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে রইলুম। আরো বার-দুয়েক ল্যাজ আছড়েই কুমীরটা হঠাৎ জলের তলায় ডুব মারলে। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা দেখে নিয়েছিলুম যে, তার দুই চক্ষু দিয়েই হু-হু করে বেরুচ্ছে রক্তধারা। তারপর আমাদের চোখের আড়ালে জলের তলায় যে বিষম তোলপাড় শুরু হল, বর্ণনা করে তা বোঝানো সম্ভব নয়!

আমি বললুম, "কুমীরটা হয়তো এখন চোখে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু এই ছোট জায়গায় সে যদি আবার উপরে এসে এমন ছটফট করতে

থাকে, তাহলে তার ল্যাজ বা দেহের আঘাতেই আমাদের হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে যাবে যে।”

বিমল বললে, “কুমীরের কবল থেকে নিস্তার পেলেও আমাদের আর রক্ষা নেই কুমার! সাঁতার কেটে জলে ভেসে মানুষ কদিন বাঁচতে পারে?”

এমন সময় গহ্বরের উপর থেকে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

আমি বললুম, “বিমল, বন্দুকের এই শব্দ শোনা যাচ্ছে অনেকক্ষণ থেকেই! ফিলিপ বা আর কেউ পাহাড়ে পাহাড়ে বন্দুক ছুঁড়ে সঙ্কেত করে আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে নাকি?”

বিমল বললে, “খুব সম্ভব তাই। কিন্তু আমাদের উত্তর দেবার শক্তি নেই। সেই গভীর গর্তের ভিতরে রিভলবারের আওয়াজ যতই ভীষণ বলে মনে হোক, বাইরে দূর থেকে তা শোনাই যাবে না······কুমার, কুমার, সাবধান!”

বিমল চিৎকার করে উঠতেই চমকে পিছন ফিরে দেখি, আমার কাছ থেকে হাত পাঁচ-ছয় তফাতেই কুমীরটা আবার ভেসে উঠেছে। রক্ত-প্রলেপের তলায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে তার প্রজ্বলিত নিষ্ঠুর চক্ষুদুটো! প্রাণপণে সাঁতার কেটে আমি দূরে সরে এলুম। কুমীরটা জলের উপরে একবার ল্যাজ আছড়েই আবার ডুব দিয়ে নিচে নেমে গেল।

হঠাৎ উপরে খুব কাছেই শোনা গেল কুকুরের ঘন ঘন চিৎকার। আমি ও বিমল তৎক্ষণাৎ সে-চিৎকার চিনতে পারলুম। দুজনে একসঙ্গেই বিপুল আনন্দে বার বার চ্যাঁচাতে লাগলুম—“বাঘা, বাঘা, বাঘা, বাঘা!”

কয়েক সেকেণ্ড পরেই গহ্বরের উপরে দেখা গেল মহা-উত্তেজিত বাঘাকে। চিৎকার করতে করতে সে একবার গর্তের ধারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মুখ বাড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখে, তারপর আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়, তারপর আবার ফিরে এসে গর্তের মুখে লাফা-লাফি করে।

তারপরেই শুনলুম মানুষের কণ্ঠস্বর এবং গর্তের উপরে পরে পরে

দেখলুম বিনয়বাবু, ফিলিপ ও রামহরির মুখ।

বিমল উচ্চকণ্ঠে বললে, "বিনয়বাবু! রামহরি! দড়ি—একগাছা লম্বা দড়ি ফেলে দাও!"

সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যু-গহ্বর ছেড়ে উপরে উঠে, বাইরের উজ্জ্বল আলোকে ও স্নিগ্ধ বাতাসে বিশ্রাম করতে করতে বিনয়বাবুর কথা শুনতে লাগলুম :

"বিমল! কুমার! ঘুম ভাঙবার পর যখনি দেখলুম, তাঁবুর ভিতর মৃণু নেই, তখনি আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল! আমি আর কালবিলম্ব না করে রামহরি, বাঘা আর অন্যান্য লোকজন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

বনের ভিতরে খুঁজতে খুঁজতে মিঃ ফিলিপের সঙ্গে দেখা। তিনিও তখন ব্যস্ত হয়ে তোমাদের সন্ধান করছিলেন। তাঁর মুখে সমস্ত শুনে আমি তোমাদের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলুম। কিন্তু ভাগ্যে সঙ্গে ছিল বাঘা! মাটির উপরে শুঁকে শুঁকে সে-ই তোমাদের পায়ের গন্ধ আবিষ্কার করে ফেললে। বাঘা না থাকলে আজ তোমাদের কি দশা হত জানি না। আমরা তারই অনুসরণ করে বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘটনাস্থলে আসতে পেরেছি। তোমাদের ফিরিয়ে পেলুম বটে, কিন্তু আমার মৃণুর কি হল? পিশাচরা কি তাকে হত্যা করেছে?" বলতে বলতে বিনয়বাবুর মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে এল।

বিমল বললে, "মৃণুর কথা পরে সব শুনবেন। আপাতত এইটুকু খালি জেনে রাখুন যে, শত্রুরা মৃণুকে ধরে নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু তার প্রাণের কোন আশঙ্কা নেই।...মিঃ ফিলিপ, আমরা যে আহত লাল-মানুষটাকে বনের ভিতরে পেয়েছি সে এখন কোথায়?"

ফিলিপ বললেন, "ইকটিনাইকের কথা জিজ্ঞাসা করছেন? বিনয়-বাবু যে-কুলিদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, এতক্ষণে তারা তাকে আমাদের তাঁবুর ভিতরে নিয়ে গিয়েছে।"

বিমল বললে, "তাহলে শীঘ্র তাঁবুর দিকে ছুটে চলুন! ঐ ইকটিনাইকই

এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। কারণ মৃণু গেছে যেখানে, সেই সূর্যনগরে যাবার গুপ্তপথের সন্ধান সে ছাড়া আমাদের আর কেউ জানে না।”

আমরা সবাই তাঁবুর দিকে ফিরে চললুম। এবং পথে যেতে যেতে বিনয়বাবুর কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললুম।

বিনয়বাবু এবারে সত্য-সত্যই কেঁদে ফেললেন। সাশ্রুনেত্রে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, “মৃণু হবে সূর্যনগরে ইনকার রাণী? তাহলে আর কি তাকে ফিরে পাব? হা ভগবান!”

বিমল তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, “কিছু ভাববেন না বিনয়বাবু, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, মৃণু যেখানেই থাক তাকে আবার উদ্ধার করে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনব।”

তাঁবুতে এসে দেখি, ইকটিনাইক শয্যায় শুয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। আমাদের দেখে ক্ষীণ স্বরে বললে, “বিদেশী, আমি বোধহয় আর বাঁচব না।”

ফিলিপ বললেন, “তোমার কোন ভয় নেই। আমার চিকিৎসায় তুমি দুই হপ্তার মধ্যে উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবে। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, রক্তপাতের জন্যে তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ বটে, কিন্তু তোমার কোন আঘাতই গুরুতর নয়।”

ইকটিনাইক কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, “আমি যদি বাঁচি, তাহ'লে নিশ্চয়ই আপনাদের সূর্যনগরে নিয়ে যাব।”

ফিলিপ বললেন, “কিন্তু ইকটিনাইক, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। আমাদের সঙ্গে যে মেয়েটি এসেছিল, কালো বাজ কেন তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে?”

ইকটিনাইক ধীরে ধীরে বললে, “সেই মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্যেই আমরা এদিকে এসেছিলুম। আমাদের রাণী হবেন তিনিই। সূর্যমন্দিরের প্রধান পুরোহিত বলেছেন, আসছে মাসের প্রথম পূর্ণিমার পর প্রথম সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইনকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হবে!”

—"আসছে মাসের পূর্ণিমা? তার তো এখনো অনেক দেরি! ইতিমধ্যে মেয়েটির উপরে কোন নির্যাতন হবে না তো?"

ইকটিনাইক উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "সূর্যনগরের মহিষীর উপর নির্যাতন করবে এত-বড় বুকের পাটা আছে কার? জানো বিদেশী কত কাল-কালান্তর ধরে সূর্যনগর অপেক্ষা করে আছে এই সুলক্ষণা কন্যাটিকে লাভ করবার জন্যে? এতদিন পরে তিনি আমাদের দেখা দিয়ে ধন্য করেছেন, কে তাঁকে অপমান করতে সাহস করবে?"

ইকটিনাইকের কথা শুনে আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হলুম।

তারপর থেকে ফিলিপ পরম যত্নে ইকটিনাইকের পরিচর্যায় নিযুক্ত হলেন এবং তার চমৎকার চিকিৎসার গুণে রোগী দিনে দিনে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠতে লাগল।

কিন্তু বিনয়বাবুর আর শান্তি নাই—সর্বদাই হা-হুতাশ ও ছটফট করেন। আমরা তাকে ধৈর্য ধরতে বলি, কিন্তু বাপের প্রাণ কিছুতেই ধৈর্য মানতে চায় না।

ওদিকে দিনের আলো নিবিয়ে রাত্রির অন্ধকার জাগলেই তাঁবুর ভিতরে বাঘা হয়ে ওঠে বিষম অশান্ত! বারংবার কান পেতে কি শোনে এবং দারুণ ক্রোধে চিৎকার করতে থাকে।

সেই চিৎকারে ইকটিনাইকের ঘুম ভেঙে যায় এবং সেও ধড়মড় করে বিছানার উপরে উঠে বসে সভয়ে বলে, "প্রেতমানুষ! প্রেতমানুষ! আমি প্রেতমানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি!"

আমরাও শুনতে পাই, বাইরে কারা যেন ভারি ভারি পায়ের চাপে পাহাড়ের পাথর-বুক কাঁপিয়ে মত্তহস্তীর মতন চলা-ফেরা করছে! বন্দুক নিয়ে তাঁবুর দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারি, কিন্তু রাত্রির আঁধার-ঘোমটা ভেদ করে দেখতে পাই না কারুকেই! কোন কোন দিন আন্দাজে দুই-একবার বন্দুকও ছুঁড়ি—সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দ থেমে যায়! শব্দ থেমে যায় বটে, কিন্তু তবু মনে হয়, শত শত সতর্ক ও অমানুষিক দৃষ্টি আড়াল থেকে আমাদের উপর সজাগ পাহারা দিচ্ছে!

ফিলিপ শিউরে উঠে বলেন, "প্রেতমানুষের রহস্য কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না! সর্বদাই মনে হয়, যেন কোন অলৌকিক অভিশাপ আমাদের মাথার উপরে বিষম আক্রোশে জেগে আছে—যে-কোন মুহূর্তে সর্বনাশ হতে পারে!"

বিনয়বাবু খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে কি ভাবেন, তারপর বলেন, "প্রেত-মানুষ নামের কোন মানে হয় না। কিন্তু ইকটিনাইকের মুখে তাদের যে বর্ণনা শুনি, তাতে আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে।"

ফিলিপ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, "কি সন্দেহ?"

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বলেন, "এখন নয়। আগে তাদের স্বচক্ষে দেখি, তারপর বলব।"

দশম পরিচ্ছেদ

দামামা-বিভীষিকা

চলেছি আমরা সূর্যনগরীর পথে। কিন্তু এ কি পথ?

কখনো এমন জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে পড়ি যে মনে হয়, সূর্যহীন চিররাত্রির যাত্রী আমরা, অনন্ত অন্ধকারের গর্ভ ভেদ করে আর বুঝি বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবো না। কখনো ঢালু পাহাড়ের শিলাকণ্টকিত গা দিয়ে বলের মতন প্রায় গড়াতে গড়াতেই নিচের দিকে নামতে থাকি একান্ত অসহায়ের মতো। কখনো দুই হাতে বন্য লতাপাতা চেপে ধরে মাথার উপরে জলপ্রপাতের প্রবল ধারা ও পিচ্ছল পাষাণ-পথে পদে পদে মৃত্যুভয় নিয়ে পাহাড়ের খাড়া প্রাচীর বেয়ে উপরে উঠতে থাকি অতি কষ্টে, অতি সাবধানে।

ইকটিনাইক প্রায় আরোগ্য লাভ করেছে। ফিলিপ তাকে আরো দিন-তিনেক বিশ্রাম করতে বলেছিলেন, কিন্তু মৃগুর অদর্শনে বিনয়বাবুর

কাতরতা দেখে সে আর স্থির থাকতে রাজী হল না ; বললে, "বাড়িতে আমারও বুড়ো বাপ-মা আছেন, এতদিন আমাকে দেখতে না পেয়ে তাঁরাও এমনি কান্নাকাটি করছেন। বিদেশী, আমারও মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—তোমাদের তাড়াতাড়ি যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে আমিও নিজের ঘরে ফিরে যেতে চাই!"

ফিলিপ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়েছ শুনলে তোমার দেশের লোক রাগ করবে না?"

—"রাগ করবে না, বল কি বিদেশী? এ খবর প্রকাশ পেলে আমার জীবন যাবে।"

—"জীবন যাবে?"

—"নিশ্চয়! এদেশে বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। আমাকে বন্দী করে সূর্যমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর প্রধান পুরোহিত এসে জ্যান্তো অবস্থায় আমার বুক ছ্যাঁদা করে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে সূর্যদেবের সামনে উপহার দেবেন!"

ফিলিপ শিউরে উঠে বললেন, "কি সর্বনাশ! ইকটিনাইক, এই সব বর্বর প্রথা এখনো এদেশে আছে! আমি তো জানতুম বিংশ শতাব্দীর হাওয়া এসে তোমাদেরও সভ্য করে তুলেছে!"

ইকটিনাইক আহত স্বরে বললে, "তোমার কথার মানে কি বিদেশী? তুমি কি বলতে চাও, এদেশে সাদা মানুষরা আসবার আগে লাল-মানুষরা অসভ্য ছিল?"

ফিলিপ তাড়াতাড়ি বললেন, "না, না, ও-কথা বল ছিনা—আমি যে তোমাদের পুরানো ইতিহাসের খবর রাখি। আমি যে তোমাদের মায়া অ্যাজটেক আর ইনকা-সভ্যতার কথা জানি। যুগ-যুগান্তর আগে তোমাদের পূর্বপুরুষরা যে-সব বিরাট মন্দির, পিরামিড আর প্রাসাদ গড়েছিলেন, আজও যে তাদের বিস্ময়কর ধ্বংসাবশেষ দক্ষিণ আমেরিকার দিকে দিকে ছড়ানো রয়েছে! সুদূর অতীতে তোমাদের শিল্পীরা যে-সব অপূর্ব মূর্তি গঠন করেছিলেন, আজ তো তারা একেবারে রূপ হারিয়ে নষ্ট

হয়ে যায় নি! তবে কি করে তোমাদের আমি অসভ্য বলব? তোমাদের পূর্বপুরুষরা বড় বড় নগর বসিয়েছিলেন, তাঁদের সমাজ আর সভ্যতার রীতি-নীতি ছিল উন্নত, তাঁদের ধর্ম আর শিল্প-শাস্ত্রেরও অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁদের কোন কোন প্রথা যে নিষ্ঠুর ছিল, একথা মানতেই হবে।"

ইকটিনাইক বললে, "বিদেশী, তোমাদেরও কথা আমরা কিছু কিছু জানি। ইউরোপেও কি ধর্মের নামে রোম্যান ক্যাথলিক পুরোহিতরা অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন নি?"

ফিলিপ বললেন, "বুঝেছি, তুমি inquisition-এর কথা বলছ। কিন্তু সে প্রথা তো একালে আর নেই।"

ইকটিনাইক বললে, "তুমি ভুলে যাচ্ছ বিদেশী, সূর্যনগরেও আধুনিক কোন যুগধর্মই নেই! এ হচ্ছে বর্তমানের কোলে অতীতের স্বপনপুরী। আধুনিক যুগ আমাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে; আমাদের ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য কেড়ে নিয়েছে; তাই আমরা মহা পর্বতের অন্তরালে গহন-বনের অন্তঃপুরে গোপনে গড়ে তুলেছি এই অজানা সূর্যনগর—যেখানে এসে আমাদের গৌরবময় অতীত কালের পরিমাপ হারিয়ে স্তম্ভিত হয়ে আছে। প্রাচীন যুগ যেমন ছিল, আমরা তাকে ঠিক তেমনি ভাবেই রেখেছি—তার কোন ভাব, রূপ, রীতিনীতি, সংস্কার নিষ্ঠুর বা সেকেলে হলেও একটুও বদলাতে দিই নি। প্রতি বৎসরেই আমরা বাইরের ঘরবাড়ি দেশ ছেড়ে একবার করে কিছুদিনের জন্যে সূর্যনগরে পালিয়ে আসি কেন জানো? নিজেদের দীনতা, হীনতা, অধঃপতনের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্যে বর্তমান যুগকে ভুলে অতীতকে আলিঙ্গন করে আমরা খানিকক্ষণ হাঁপ ছাড়তে চাই বিদেশী, নিজেদের স্বরূপ দেখে আশ্বস্ত হতে চাই! দুর্দশাগ্রস্ত একালকে আমরা ব্যাধির মতো ঘৃণা করি—আমরা ভালোবাসি আমাদের মহিমময় সেকালকে, তাই তার দোষকেও সহ্য করতে নারাজ নই!

ফিলিপ বললে, "বুঝেছি ইকটিনাইক, বুঝেছি! কিন্তু আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে এত বড় বিপদ ঘাড়ে নিতে তোমার ভয় করছে না?"

—"ভয় করছে বৈকি, কিন্তু উপায় কি? আমার নিজের দলের লোকেরা আমাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়ে গেল, আর শত্রু হয়েও আমার প্রাণরক্ষা করলে তোমরা! এমন মহৎ উপকার ভুলব কেমন করে। তাই গোপনে তোমাদের সাহায্য করে কেউ কিছু জানতে পারবার আগেই আবার বাড়ির পথ ধরব!"

ইকটিনাইক আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু কি করে যে নিয়ে যাচ্ছে, তা কেবল সে-ই জানে! আমরা তো কোথাও পথের রেখাটুকুও দেখতে পাচ্ছি না! কেবল পাহাড়, বন, উপত্যকা, খাদ, নদী আর জলপ্রপাত! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েও আমরা মানুষ তো দূরের কথা, একটা স্থলচর জীবেরও সাড়া পেলুম না। এ যেন এক অভিশপ্ত পরিত্যক্ত প্রদেশ, এখানে পদার্পণ করতে সকলেই ভয় পায়! কেবল আকাশ-পথে পৃথিবীর মাটির নাগালের বাইরে মাঝে মাঝে দেখা যায় উড়ন্ত পাখির ঝাঁক, আর লতা-জড়ানো বড় বড় বনস্পতির পত্র-ব্যূহের আড়াল থেকে ভেসে আসে বিহঙ্গদের কল-সঙ্গীত—পথ-ভোলা মাধুর্যের ঝঙ্কারের মতো।

ইকটিনাইক বললে, "এখন পর্যন্ত তো ভালোয় ভালোয় কাটল; কিন্তু তবু আমার ভয় করছে!"

ফিলিপ বললেন, "কিসের ভয়! তুমি তো বললে এই দুর্গম গুপ্তপথের সন্ধান কেউ জানে না বলে এ-অঞ্চলে কোন প্রহরীও নেই।"

—হ্যাঁ, বলেছি বটে, তবু আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে! বিদেশী, কালো বাজ তোমাকে ভয় করে!"

—"আমাকে ভয় করবার কারণ আর নেই। আমি এখন সহায়হীন, কালো বাজ জানে যে আমার প্রধান দুই সঙ্গীকে এখন বুড়ো ঠাকুরদা গিলে হজম করে ফেলেছে!"

—"বিদেশী, কালো বাজ বেশি ভয় করে তোমাকেই। তুমি বেঁচে থাকতে সে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। তোমার পিছনে নিশ্চয়ই সে চর রেখেছে—আর আমার কথাও হয়তো জানতে পেরেছে!"

ফিলিপ বললে, "এতখানি পথ পার হয়ে এলুম, কিন্তু আমাদের উপরে কারুর দৃষ্টি আছে বলে তো মনে হচ্ছে না!"

ইকটিনাইক শুকনো হাসি হেসে বললে, "ভুল বিদেশী, ভুল! তুমি বাহির থেকে এখানে কোন জীবকে দেখতে পাচ্ছ না বটে, কিন্তু এ মারাত্মক পথের গুপ্তকথা আমি জানি। কত জাগুয়ার বাঘ, কত অজগর সাপ যে নীরবে আমাদের পথ-চলা লক্ষ্য করেছে, সেটা আমি বেশ অনুভব করতে পেরেছি! একে দিনের বেলা, তায় আমরা দলে হালকা নই, এই জন্যেই তারা নির্বিবাদে আমাদের পথ ছেড়ে দিয়েছে!"

ফিলিপ বললেন, "জাগুয়ার কি অজগরকে আমরা শত্রু বলেই গণ্য করি না। আমাদের সামনে পড়লে তাদেরই বিপদ বেশি।"

ইকটিনাইক বললে, "কিন্তু বনের ভিতরে আরো কত বিভীষিকা আছে, কে তার খবর রাখে?"

ফিলিপ হেসে ফেলে বললেন, "এখনো তুমি বুঝি প্রেতমানুষদের ভুলতে পারো নি?"

বিস্ফারিত চক্ষে প্রায় আর্তনাদের স্বরে ইকটিনাইক বললে, "দোহাই বিদেশী, ও অমঙ্গলে নাম এখন মুখে এনো না! সন্ধ্যা হল এখনি চারিদিক ছেয়ে যাবে রাতের অন্ধকারে—আর তুমি যাদের নাম করলে, তারা হচ্ছে রাত্রিচর! ও নাম স্মরণ করলে এখনি সর্বনাশ হতে পারে!"

ইকটিনাইকের কথা শেষ হতে না হতেই দূর থেকে শোনা গেল ঘন ঘন দামামার আওয়াজ! এখানে মানুষের সাড়া নেই, দামামা বাজায় কে?

আমি জিজ্ঞাসু চোখে ইকটিনাইকের দিকে তাকালুম। সে বিবর্ণ মুখে উৎকর্ণ হয়ে দামামা-ধ্বনি শুনছিল।

ফিলিপ বললেন, "বিনয়বাবু, এই ঢাকের আওয়াজ শুভলক্ষণ নয়।"

বিনয়বাবু বললেন, "কেন?"

ফিলিপ বললেন, "আমি আমেরিকা, আফ্রিকা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশের বনে বনে অনেক ঘুরেছি। সব জায়গাতেই দেখেছি,

বনবাসী আদিম বাসিন্দাদের কাছে ঢাকের আওয়াজ বেতার টেলিগ্রামের কাজ করে। ও-ঢাকের আওয়াজ অর্থহীন নয়—ওর মধ্যে আছে সাঙ্কেতিক ভাষা, আমরা যা বুঝি না। ঢাক বাজিয়ে ওরা দূর-দূরান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে খবর পাঠিয়ে দেয়! ইকটিনাইককে দেখুন, ওর মুখ মড়ার মতন সাদা হয়ে গেছে, নিশ্চয় ও ঢাকের ভাষা বুঝতে পেরেছে।"

ইকটিনাইককে তখন দেখাচ্ছিল নিশ্চল জড় মূর্তির মতন—আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত সে যেন ভুলে গিয়েছে! ফিলিপ এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধের উপরে একখানি হাত রাখলেন। সে চমকে উঠে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বললে, "আমরা ধরা প'ড়ে গিয়েছি।"

—"কি ক'রে জানলে তুমি?"

—"ঐ ঢাকের আওয়াজ শুনে।"

—"ও ঢাক কি বলছে?"

—"ও বলছে—'জাগো, জাগো, শত্রু মারো'!"

তখন বনভূমি সমাধির মতন। পাখিরাও বাসায় ফিরে গান ভুলে গিয়েছে। আলোর আসরে কালোর প্রলেপ পুরু হয়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। দূরের দৃশ্য দেখাই যায় না, কাছের গাছপালাও ঝাপসা। সব যেন রহস্যময়।

গভীর অরণ্যের মৌনব্রত ভঙ্গ করেছে কেবল ঐ সুদূরের সুগম্ভীর দামামা! সে নাকি বলতে চায়—'জাগো, জাগো, শত্রু মারো!' অসম্ভব নয়, ইকটিনাইক ভুল বলবে কেন, সে যে স্বদেশী দামামার সাঙ্কেতিক ভাষা জানে!

আচম্বিতে দূর থেকে আর একটা দামামার ধ্বনি জাগল। তারপর তৃতীয়, তারপর চতুর্থ দামামাও কথা কইতে লাগল! তারপর আমাদের পিছনে, আমাদের সামনে, আমাদের ডাইনে ও বাঁয়ে একই ভাষায় বেজে উঠল আরো কত যে দামামা, আন্দাজে তা হিসাব করা অসম্ভব! সবাই একস্বরে এক কথাই বলছে—"জাগো, জাগো, শত্রু মারো! জাগো, জাগো, শত্রু মারো!"

আকাশ, বাতাস, পৃথিবী হয়ে উঠল শব্দে-শব্দে শব্দময়! সেই ভয়াবহ সাংঘাতিক ঐকতানে বনস্পতিরা যেন থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে আর্তনাদ করতে লাগল। অন্ধকার যত নিবিড় হয়, দামামার হুঙ্কার ততই বেড়ে ওঠে। পর্বত-অরণ্যের উপরে তিমিরের আবরণ ফেলে অন্ধ নিশীথিনী যেন স্তম্ভিত হয়ে সেই অভিশাপ-বাণী শুনতে লাগল—'মারো, মারো, শত্রু মারো! মারো, মারো, শত্রু মারো। মারো, মারো, শত্রু মারো!' একটানা দ্রিমি-দ্রিমি দ্রিমি-দ্রিমি দ্রিমি-দ্রিমি বোলে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমাদের কান ও প্রাণ!

ফিলিপ ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ঢাকগুলোর শব্দ যে ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে!"

সত্যই তাই! চতুর্দিক থেকে শব্দময় মৃত্যুর অদৃশ্য বেড়াজাল ক্রমেই এগিয়ে ছোট হয়ে আসছে। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ—সব দিক থেকে আসছে শব্দতরঙ্গের পর শব্দতরঙ্গ! মন যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

বিনয়বাবু বললেন, "কোন্ দিকে যাব? শত্রু যে সব দিকেই!"

বিমল বললে, "শত্রুরা সংখ্যায় বোধহয় অগণ্য। বন্দুক ছুঁড়েও আমাদের বাঁচবার সম্ভাবনা নেই!"

ফিলিপ বললেন, "ইকটিনাইক, আমাদের কি শেষটা কলে-পড়া ইঁদুরের মতন মরতে হবে? পালাবার কোন পথই কি আর খোলা নেই?"

ইকটিনাইক বাধো-বাধো গলায় বললে, "এক উপায় আছে। কিন্তু—"

—"কিন্তু ব'লে থামলে কেন? জীবন যখন বিপন্ন, তখন আবার 'কিন্তু' কি?"

—"কিন্তু সে যে মহাপবিত্র স্থান। বিধর্মী বিদেশীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ!"

—"এই কি তোমার কৃতজ্ঞতা, ইকটিনাইক! আমরা মরব, আর তুমি দাঁড়িয়ে দেখবে?"

—"ভুলে যেও না বিদেশী, যারা ঢাক বাজিয়ে ছুটে আসছে তারা

আমাকেও দয়া করবে না। আমি বিশ্বাসঘাতক। আমারও মৃত্যু অনিবার্য।

—"তাহলে আর ইতস্তত করছ কেন? আমাদেরও বাঁচাও, নিজেরও প্রাণরক্ষা কর।"

—"বিদেশী, একজায়গায় আশ্রয় নিলে আমরা বাঁচতে পারি বটে। কিন্তু সেখানে তোমাদের নিয়ে গেলে আমার ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট হবে।...আচ্ছা বিদেশী, তাই-ই হোক! এক পাপ ডেকে আনে অন্য পাপকে। নিজের কথা আর ভাবব না—এস তোমরা আমার সঙ্গে।"

'টর্চের আলো ফেলে দেখলুম, সামনেই একটা উঁচু পাহাড়। অত্যন্ত সংকীর্ণ এক শুঁড়ি পথ ধরে ইকটিনাইক উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। সে পথে পাশাপাশি দুজনের ঠাঁই হয় না।

পরে পরে আমরাও উঠতে লাগলুম। চল্লিশ-পঞ্চাশটা দামামা তখনও প্রচণ্ড চিৎকার করতে করতে এগিয়ে—আরো এগিয়ে—আরো এগিয়ে আসছে—'মারো, মারো, শত্রু মারো! মারো, মারো, শত্রু মারো!'

মিনিট-দশেক ধরে উপরে উঠে একজায়গায় দাঁড়িয়ে ইকটিনাইক বললে, "এইখানে আছে আমাদের আশ্রয়"—বলেই পাহাড়ের গায়ের উপর একখানা হাত রাখলে।

চারিদিকে ভালো করে 'টর্চে'র আলো ফেলেও সেখানে অটল পাহাড়ের মসৃণ ও নিরেট প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না।

ফিলিপ বললেন, "কোথায় আশ্রয়? এখানে তো মাথা গোঁজবারও জায়গা নেই! ওদিকে শত্রুরা যে পাহাড়ের তলায় এসে পড়ল।"

নিশ্চয়ই সেখানে কোন গুপ্তযন্ত্র ছিল। পাহাড়ের গায়ে হাত দিয়ে ইকটিনাইক কি করলে জানি না, কিন্তু হঠাৎ দুখানা বড় বড় পাথর দুদিকে সরে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা দ্বারপথের সৃষ্টি করলে।

ইকটিনাইক গম্ভীর স্বরে বললে, "বিদেশী, ভিতরে ঢুকে দেখ।"

টর্চের আলো জ্বেলে সর্বাগ্রে ভিতরে ঢুকেই আমি স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে পড়লুম। সবিস্ময়ে রোমাঞ্চিত দেহে দেখলুম, সর্বাগ্রে কাপড়

মুড়ি দিয়ে অত্যন্ত স্থির ভাবে বসে আছে আট দশটা লাল-মানুষের মূর্তি এবং তাদের ভয়ঙ্কর বিকটদন্ত হাঁ-করা মুখে অত্যন্ত স্থির হয়ে আছে বিস্ফারিত চক্ষের এমন ভীষণ ও বীভৎস দৃষ্টি যে, দেখলেই বুকের কাছটা ভয়ে ধড়ফড় করে ওঠে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গুহার রহস্য

সেই অতি-ভয়ানক ও পাথরের মূর্তির মতন স্থির মানুষগুলোকে দেখেই আমার সর্বাঙ্গ এমন আড়ষ্ট হয়ে গেল যে, একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারলাম না।

তারপরেই পিছন থেকে রামহরি চিৎকার ক'রে বললে, "ওরে বাবারে, ভূতের খপ্পরে এসে পড়েছি রে—ও খোকাবাবু গো ও কুমারবাবু ও—"ভয়ে তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না।

রামহরির সেই ভীষণ চিৎকারে আমার আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেল।

ফিলিপ সক্রোধে বললেন, "ইকটিনাইক, তুমি কি ভুলিয়ে আমাদের শত্রুদের ফাঁদে এনে ফেললে?"

আমি তাড়াতাড়ি বন্দুক তুললুম।

ইকটিনাইক আমার হাত চেপে ধরে বন্দুক ছুঁড়তে মানা করলে। তারপর ফিলিপের দিকে ফিরে বললে, "বিদেশী, এরা আমাদের শত্রু নয়। এরা জ্যান্তো মানুষও নয়।"

—"তার মানে?"

—"ওগুলো হ'চ্ছে মামি।"

—"মামি।"

—"কেন বিদেশী, তুমি কি জানো না, মিশরের মতো এদেশেও

মৃতদেহকে শুকিয়ে রক্ষা করবার প্রথা ছিল ? এগুলো হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষদের মৃতদেহ। এ গুহা হচ্ছে প্রাচীন সমাধি-গুহা ! খানিক-দূর এগিয়ে এই বিপুল গুহার গভীর অন্ধকার হাতড়ালে এমন হাজার হাজার অটুট মৃতদেহ পাওয়া যাবে। এই মৃতদেহের জনতার মধ্যে প্রত্যেকেই আগে ছিলেন দেশের প্রধান ব্যক্তি—কেউ বা ইনকা; কেউ বা প্রধান মন্ত্রী, কেউ বা প্রধান সেনাপতি, কেউ বা প্রধান পুরোহিত। সাধারণ মৃতদেহের ঠাঁই এখানে নেই।"

ইতিমধ্যে বাঘা অতিশয় সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে সেই শুকনো মড়া-গুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দেহগুলো ভালো করে শুঁকে, দেখে, নির্ভয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ফিরে এল এমন একটা ভাব নিয়ে যেন সে বলতে চায়—"ওগো, তোমাদের কোন ভয় নেই ! এগুলো হচ্ছে মানুষের মতন দেখতে বাজে পুতুল !"

বিমল বললে, "কুমার, আফ্রিকায় আমরা যখন আবার যকের ধনের খোঁজে গিয়েছিলুম, তখন রত্ন-গুহার ভেতরে যোদ্ধাদের 'মামি' দেখে কি-রকম আশ্চর্য হয়েছিলুম মনে আছে ?"

আমি বললুম, "মনে আছে বৈকি ! আমি তো সেই কথাই ভাব-ছিলুম !"

ওদিকে বাইরে দামামাগুলো এখনো শ্রান্ত হয়ে পড়ে নি, তারা বেজে চলেছে সমান জোরে, সমান তালে ! তাদের মুখে এখনো সেই একই সাঙ্কেতিক বাণী—'জাগো, জাগো, শত্রু মারো ! জাগো, জাগো, শত্রু মারো' শব্দ ক্রমেই কাছে আসছে, ক্রমে আরো আরো কাছে।

গুহামুখ থেকে উঁকি মেরে দেখলুম, পাহাড়ের নিচে নিকটে, দূরে সুবৃহৎ অরণ্যব্যাপী অন্ধকারকে যেন শতছিদ্র করে দিয়েছে শত শত জ্বলন্ত মশালের চলন্ত আলো।

ইকটিনাইক রীতিমত বিস্মিত ভাবে বললে, "বনে বনে এত মশালের আলো ! বিদেশী, তোমাদের ধরবার জন্যে আজ বোধ হয় সূর্যনগরের সমস্ত যোদ্ধাই এখানে ছুটে এসেছে।"

ফিলিপ বললেন, "এ যেন মশা মারতে কামান পাতা। তুচ্ছ এই ক'জন লোককে মারবার জন্য—"

ইকটিনাইক বাধা দিয়ে বললে, "তোমরা আর তুচ্ছ নও বিদেশী, তুচ্ছ নও! তোমরা আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছ, আজ পর্যন্ত আর কোন বিদেশী সূর্যনগরের এত কাছে আসতে পারে নি। যদি কোন ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে তোমরা সূর্যনগরে ঢুকে পড়, সেই ভয়েই ওরা চারিদিক আগ্‌লে মানুষের বেড়াজাল ফেলে এগিয়ে আসছে! এ জাল ভেদ করে একটা নেংটি ইঁদুর পর্যন্ত এখন আর বাইরে যেতে পারবে না!"

দেখতে দেখতে অনেকগুলো মশাল একেবারে পাহাড়ের নিচে এসে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে দামামার শব্দকেও ছাপিয়ে জেগে উঠল জনসমুদ্রের কল-কোলাহল!

ইকটিনাইক পাহাড়ের গায়ে হাত বুলিয়ে আবার কোন কল টিপলে, গুহামুখের পাথর-কপাট বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে!

ফিলিপ বললেন, "ইকটিনাইক গুহামুখ বন্ধ করে কোনই লাভ নেই। গুহার ভেতরে আসবার কৌশল ওরাও তো জানে!"

—"হ্যাঁ জানে। কিন্তু তবু ওরা ভেতরে আসতে পারবে না। এ কবাট এমন ভাবে তৈরি যে, ভেতর থেকে বন্ধ করলে বাহির থেকে কেউ আর খুলতে পারবে না! তাই তো আমি এখানে এসেছি!"

সমাধি-গুহার ভূতুড়ে অন্ধকার বোধকরি রামহরির ধাতস্থ হল না, সে বিনা বিলম্বে পেট্রলের একটা লণ্ঠন জ্বেলে ফেললে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, দীর্ঘতায় এ গুহা কী বিপুল! পেট্রলের অমন যে তীব্র আলো, তাও গুহার দূরবর্তী অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে হারিয়ে গেল একেবারে! গুহামুখের দেওয়ালের দিকে আমরা পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলুম। বাঁয়ে আর ডাইনেও দুদিকে দূরে দূরে দেওয়াল দেখতে পেলুম বটে, কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে মনে হল, গুহার যেন আর শেষ নেই!

গুহার দুদিকেই চোখে পড়ল আর এক অপূর্ব-ভীষণ দৃশ্য!

দেওয়ালের দিকে পিঠ রেখে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি সুরক্ষিত মৃতদেহ! সংখ্যায় যে তারা কত, গুণে বলা অসম্ভব! দুদিকেই তাদের শ্রেণী আলোক-সীমানার বাইরে গিয়ে ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে নিবিড় তিমিরের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। তাদের কেউ যুবা, কেউ প্রৌঢ়, কেউ বৃদ্ধ! তাদের কারুর মাথায় মুকুট, কারুর মাথায় পালকের টুপি, কেউ বা মুণ্ডিতমুণ্ড! তাদের কারুর হাতে রাজদণ্ড, কারুর হাতে তরবারী, ধনুক বা বর্শা, কেউ বা যুক্তকরে যেন উপাসনায় নিযুক্ত। প্রত্যেকের নিষ্পলক চক্ষে স্তম্ভিত পাথুরের দৃষ্টি,—দেখলেই বুক শিউরে ওঠে, গায়ে দেয় কাঁটা। মৃত্যুর সময়ে মুখের উপরে যে বীভৎস ভাব নিয়ে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল, অনেকের মুখমণ্ডলে আজও তার চিহ্ন লেখা রয়েছে!

রামহরি কাঁপতে কাঁপতে বললে, "তোমরা মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে এলে কিনা গোরস্থানের বাসি মড়ার মুল্লুকে! আজ রাতদুপুরে এরা যখন জাগবে, আমাদের দশা কি হবে গো!"

হঠাৎ খুব কাছেই আমাদের পিছন থেকে বজ্রগম্ভীর স্বরে চিৎকার করে কে বললে, "হত্যা, হত্যা! আজ তোদের হত্যা করব!"

এক এক লাফে আমরা চমকে ফিরে দাঁড়ালুম—কিন্তু কেউ নেই কোথাও!

ইকটিনাইক মৃদু হেসে বললে, "ভয় নেই, এ হচ্ছে কালো বাজের গলা!"

ফিলিপ বললেন, "কোথায় সে?"

—"বাইরে! গুহার দরজার পাশে দেওয়ালে একটা ফুটো আছে। কালো বাজ কথা কইছে সেই ফুটোয় মুখ দিয়ে।"

কালো বাজ আবার হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, "ইকটিনাইক, তুমিই যে সমস্ত অনিষ্টের মূল, তা আমাদের জানতে বাকি নেই। ভালো চাও তো এখুনি দরজা খুলে দাও।"

ফুটোর কাছে গিয়ে ইকটিনাইক বললে, "কেন বল দেখি? নিজের হাতে দরজা খুলে নিজের মৃত্যুকে যেচে ডেকে আনব?"

কালো বাজ বললে, "ভালোমানুষের মতন এখনি যদি দরজা খুলে দাও, তাহলে তোমার সকল অপরাধ আমরা মার্জনা করব।"

ইকটিনাইক বললে, "তুমি কত বড় দয়ালু তা আমার জানতে বাকি নেই। দরজা আমি কিছুতেই খুলব না।"

—"ওরে নির্বোধ, দরজা বন্ধ করেই তুই কি বাঁচবি বলে মনে করিস? জানিস, এ গুহা থেকে বাইরে বেরুবার আর দ্বিতীয় পথ নেই?"

—"জানি।"

—"এইখানে বসে আমরা দিনের পর দিন পাহারা দেব। তার ফল কি হবে জানিস্!"

—"পানীয় আর খাদ্যের অভাবে আমরা মারা পড়ব।"

—"সে মৃত্যু কি খুব সুখের?"

—"কালো বাজ, কোন মৃত্যুই সুখের নয়। কিন্তু তোমার মতন নর-দানবের হাতে পড়ে শত অপমান আর নির্যাতন সয়ে মরার চেয়ে ভয়ানক আর কিছুই নেই।"

কালো বাজ বিকট স্বরে হা-হা করে হাসতে হাসতে বললে, "ওরে ইকটিনাইক, ওরে টিকটিকি! বেশ, বেশ, তবে তাই হোক রে, তাই হোক!" সে আরো জোরে হা-হা করে হাসতে লাগল। সে যত হাসে বাঘা রেগে ততই গালাগালি দেয়!

তার হাসি আরো কতক্ষণ চলত জানি না, কিন্তু বিমল হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে ফুটোর ভিতরে বন্দুকের নলটা ঢুকিয়ে ঘোড়া টিপে দিলে এবং তারপরেই বন্দুকের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে জাগল একটা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ!

বিমল ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "আমাদের কপালে যা আছে তাই হবে, কিন্তু কালো বাজের অট্টহাসি পৃথিবী আর বোধহয় শুনতে পাবে না!"

আচম্বিতে গুহার ভিতরে রামহরি ও বাঘা একসঙ্গে বিষম জোরে চেঁচিয়ে উঠল।

আমি বললুম, "কি হল রামহরি, ব্যাপার কি?"

রামহরি খালি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে, কোন কথাই বলতে পারে না।

বাঘার চিৎকার আরো বেড়ে ওঠে। আশ্চর্য!

বিনয়বাবু দুই হাতে রামহরির দুই কাঁধ ধরে জোরে নাড়া দিতে দিতে বললেন, "শোনো রামহরি, শোনো! তুমি অমন করছ কেন?"

রামহরি মাটির উপর ধপাস করে দুই পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বললে, "ভূত, ভূত!"

বিমল বিরক্ত স্বরে বললে, "মাথার উপরে ঝুলছে বিপদের খাঁড়া, এ-সময় ভূত-ভূত করে তোমার খোকামি আর ভালো লাগে না। উঠে দাঁড়াও! ভালো করে তাকিয়ে দেখ, এখানে খালি আমরা আছি। আমরা ভূত নই।"

রামহরি কিছুমাত্র শান্ত হল না, তার দুই বিস্ফারিত চক্ষু যেন ঠিকরে পড়ছে! সে শিউরোতে শিউরোতে বললে, "ভগবান, আমাকে অজ্ঞান করে দাও, এ দৃশ্য আর দেখতে পারছি না।"

আমি বললুম, "কি দৃশ্য রামহরি? কোথায়? কোন্ দিকে?"

রামহরি একদিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "ঐ! ঐ দেখ!"

ডানদিকের দেওয়ালের সামনে দুটো শুষ্ক মৃতদেহের মাঝখানে মানুষের চেয়ে বড় একখানা কিম্ভূতকিমাকার কালো মুখ দেখা যাচ্ছে! কোন মৃতদেহের মুখের সঙ্গে সে মুখ মেলে না—না রঙে, না ভাবে, না আকারে! সে মুখ জীবন্ত, তার চোখেও নেই মরা চাহনি! মিথ্যা বলব না, আমারও বুকটা ঢিপ করে উঠল!

রামহরি বললে, "বাসি মরা জ্যান্তো হয়ে উঠল গো, আর আমাদের রক্ষা নেই!"

ইকটিনাইক ক্ষীণ স্বরে বললে, "প্রেতমানুষ। প্রেতমানুষ।"

একসঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে উঠল বিমল ও ফিলিপের বন্দুক,—পরমুহূর্তেই মুখখানা সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল। একটা ভয়াবহ গর্জন শুনলুম এবং সঙ্গে-সঙ্গেই একটা মৃতদেহ হঠাৎ জীবন্ত হয়ে দুলতে লাগল!

খানিক আলো আর খানিক কালোর সেই লীলাখেলার মধ্যে

বিভাষণ এক মূর্তির আবির্ভাব ও অন্তর্ধান এবং তারপরেই সেই গর্জন আর এই দোদুল্যমান মৃতদেহ রহস্যময় সমাধি-গুহার চারিদিকে যে রোমাঞ্চকর অপার্থিবতা সৃষ্টি করলে, বর্ণনায় আমি তা বোঝাতে পারব না। বলতে লজ্জা হয়, আমিও হতবুদ্ধির মতন হয়ে গেলুম!

রামহরি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, "ঐগো। আরও একটা মড়া বেঁচে উঠল!"

বিমল বললে, "মড়া বেঁচে উঠল, না ছাই। ও মূর্তিটা নড়ছে কেন জানো? ওটা আমাদের কারুর—"

বিমলের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই মৃতদেহটা হুড়মুড় করে সশব্দে মাটির উপরে পড়ে গেল!

রামহরি দুইহাতে চোখ চাপা দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "খোকাবাবু, এর পরেও কি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করবে না?"

বিমল বললে, "না। হয় আমাদের কারুর বন্দুকের গুলি ঐ মড়াটার গায়ে লেগেছে, নয় ওর পিছন থেকে যে-মূর্তিটা সরে গেল, তারই ধাক্কায় ওটা দুলে নিচে পড়ে গিয়েছে।"

আমি বললুম, "কিন্তু অমন ভীষণ গর্জন করলে কে?"

—"সেই মূর্তিটা বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েছে।"

বিমলের কথা হয়তো যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তবু আমার মন খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগল।

ফিলিপ বললেন, "কিন্তু এইমাত্র যে অদৃশ্য হল, কে সে?"

ইকটিনাইক বললে, "প্রেতমানুষ।"

ফিলিপ বললেন, "ইকটিনাইক, তোমাকে আগেও বলেছি, এখনো বলছি, প্রেতমানুষ কথার কোন অর্থ হয় না! প্রেতও বুঝি মানুষও বুঝি, কিন্তু প্রেতমানুষ আবার কি?"

ইকটিনাইক জবাব না দিয়ে ফ্যালফেলে চোখে চারিদিকে আনাচে-কানাচে তাকাতে লাগল।

বিনয়বাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, "যে-মূর্তিটা এইমাত্র দেখা

দিয়ে অদৃশ্য হল, তাকে তোমরা চিনতে না পারলেও আমি চিনতে পেরেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য। কি আশ্চর্য।”

ফিলিপ বললেন, “যদি চিনতে পেরে থাকেন—”

কথা শেষ না করেই তিনি চমকে উঠে থেমে গেলেন। গুহার ভিতরে হঠাৎ শব্দ জাগল ধুপ, ধুপ, ধুপ! কে যেন ভারি ভারি পা ফেলে গুহাতল কাঁপিয়ে তাড়াতাড়ি দূরে—আরো দূরে চলে যাচ্ছে! আমরা সকলেই সবিস্ময়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলুম। পায়ের শব্দ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে শেষটা একেবারেই মিলিয়ে গেল।

বিনয়বাবু আবার বললেন, “বড়ই আশ্চর্য, বড়ই আশ্চর্য।”

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “আপনি বার বার আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?”

—“আশ্চর্য হব না বল কি? ইকটিনাইক আর কালো বাজের মুখে শুনলে তো, এই গুহার ভেতরে ঢোকবার আর এখান থেকে বেরুবার পথ আছে একটিমাত্র—অর্থাৎ যে-পথ দিয়ে আমরা এখানে এসেছি আর সে-পথ আমরা নিজেরাই খুলে আবার বন্ধ করেছি! কিন্তু—”

বিমল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, “বিনয়বাবু, বিনয়বাবু, আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছি! ঐ মানুষ বা অমানুষ বা জন্তুটা এই গুহার ভেতরে ঢুকল কেমন করে? তবে কি এখানে অন্য কোন পথ আছে? জানবার চেষ্টা করলে হয়তো সে রহস্য জানতে পারাও যাবে! কুমার, পেট্রোলের লণ্ঠনটা নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে এস তো! মিঃ ফিলিপ! বিনয়বাবু! বন্দুক বাগিয়ে ধরে আর সবাইকে নিয়ে আপনারাও আসুন!” বলেই সে দ্রুতপদে অগ্রসর হল।

এইমাত্র যেখান থেকে সেই কিম্ভূতকিমাকার দানব-মূর্তিটা অদৃশ্য হয়েছিল, বিমল একেবারে সেইখানে গিয়ে হাজির হল।

আমি লণ্ঠনটা উঁচু করে তুলে ধরতেই বিমল বলে উঠল, “যা ভেবেছি তাই! দেখ কুমার দেখ।”

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলুম গুহাতলে টাটকা রক্তের ছড়াছড়ি!

ফিলিপ বললেন, “বেশ বোঝা যাচ্ছে, সেই মূর্তিটা আহত হয়েই

এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে !"

বিমল বললে, "হ্যাঁ। দেওয়াল আর মড়াগুলোর মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁক আছে। মূর্তিটা এইখান দিয়েই পালিয়ে গিয়েছে। দেখুন, দেখুন, রক্তের দাগও একটানা গিয়েছে ঐদিকেই ! আমাদেরও তাহলে আর বাজে ঘুরে মরতে হবে না—ঐ পথই হচ্ছে আমাদের গন্তব্য পথ !"

রক্তরেখা ধরে বিমল আবার অগ্রসর হল—সঙ্গে সঙ্গে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জাগ্রত ও হাতের বন্দুক উদ্যত হয়েই রইল। বামহাতে লণ্ঠন ধরে আমিও রিভলবারটা নিলুম ডানহাতে—কি জানি, কখন, কোথায়, কোন্ ভয়ঙ্করের সঙ্গে আচমকা চোখাচোখি হয়ে যায়, বলা তো যায় না!

মিনিট-দশেক এইভাবে এগিয়ে গিয়ে দেখি, মড়ার সারি শেষ হয়ে গিয়েছে এবং গুহার দেওয়ালটাও মোড় ফিরে গেছে ডানদিকে। কিন্তু মোড় ফিরেই আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা আতঙ্কের বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল।

পায়ের তলায় দেয়ালের গায়ে সুদীর্ঘ কার্ণিসের মতন হাত-দেড়েক চওড়া জায়গা, তার উপর দিয়েই আমাদের রক্ত-ছড়ানো পথ এবং তার নিচেই রয়েছে এক ভয়াল বিরাট ও অদ্ভুত গহ্বর—অন্ধকারে তার ওপরেও নজর চলে না এবং তার অদৃশ্য তলদেশ খুঁজতে গেলেও বোধ হয় পাতাল-প্রবেশ ছাড়া উপায় নেই।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দেওয়াল ঘেঁষে অতি সাবধানে অগ্রসর হতে লাগলুম—একবার পা ফশকালেই নিশ্চিত মৃত্যু !

আরো খানিকটা এগুবার পর অকস্মাৎ এক নতুন ও বিস্ময়কর অনুভূতি আমাকে যেন চাঙ্গা করে তুললে! এতক্ষণ গুহার বদ্ধ আবহের মধ্যে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে উঠছিল, হঠাৎ গায়ে এসে লাগল কনকনে ঠাণ্ডা মুক্ত বাতাসের আনন্দময় উচ্ছ্বাস !

বিমল অনুভব করেছিল ! পুলকিত কণ্ঠে বললে, "কুমার, কুমার ! এ যে বাইরের হাওয়া !"

আমি জবাব দেওয়ার আগেই শুনতে পেলুম, অমানুষিক কণ্ঠের এক

ভৈরব হুঙ্কার। পর-মুহূর্তেই ঠিক যেন দেওয়াল ফুঁড়ে বেরুলো একখানা প্রকাণ্ড, রক্তাক্ত ও হিংস্র দানবের মতন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মুখ—তার দুই নিষ্ঠুর চক্ষু দিয়ে ঠিকরে পড়ছে যেন আগুনের ফুলকি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সূর্যনগর

সেই মহা-ভয়ঙ্কর ও আশ্চর্য মুখখানা আমাদের স্তম্ভিত চক্ষের সামনে জেগেছিল মাত্র দুই-তিন সেকেণ্ড!

আচম্বিতে অমানুষিক কণ্ঠের ভৈরব হুঙ্কার শুনে আর ততোধিক অমানুষিক মুখখানা দেখে আমি এমন চমকে উঠলুম যে, আমার হাত থেকে লণ্ঠনটা আর-একটু হলেই ফসকে পড়ে যাচ্ছিল আর কি!

কিন্তু কী সতর্ক আমার বন্ধু বিমল! সে যেন যে-কোন মুহূর্তেই এই রকম বিপদের জন্যেই প্রস্তুত ছিল, কারণ মুখখানাকে আমরা ভালো করে দেখবার আগেই গর্জন করে উঠল তার হাতের বন্দুক—একবার নয়, দু'বার!

প্রচণ্ড একটা দানব-দেহ বিষম এক ডিগবাজি খেয়ে পড়ল গিয়ে একেবারে পাশের বিরাট ও গভীর গহ্বরের মধ্যে—মনে হল, অতল গহ্বরের নিরন্ধ্র অন্ধকারের ভিতরে ঢুকে মিলিয়ে গেল যেন আর একটা জ্যান্তো, মূর্তিমান অন্ধকার!

ভগবান জানেন, সেই বিরাট গহ্বরের গভীরতা কত! কারণ প্রায় পনেরো-বিশ সেকেণ্ড কাটাবার পরে অনেক—অনেক নিচু থেকে উঠে এল একটা মস্ত দেহপতনের শব্দ।

ফিলিপ বললেন, "বাহাদুর বিমলবাবু, আশ্চর্য আপনার লক্ষ্য! রাক্ষসটার দেহের এমন জায়গায় গুলি লেগেছে যে, মরবার আগে ও

একটা আর্তনাদ করবারও সময় পেল না!”

আমি বললুম, “রাক্ষসটা নিশ্চয়ই এইখানে এসে আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে অপেক্ষা করছিল!”

বিনয়বাবু বললেন, “তোমরা রাক্ষস-রাক্ষস করছ কেন? ও রাক্ষস নয়!”

রামহরি বললে, “ভূত! পিশাচ! দৈত্য!”

ইকটিনাইক বললে, “প্রেতমানুষ।”

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, “রাক্ষসও নয়, ভূত-পিশাচও নয়, প্রেতমানুষও নয়!”

ফিলিপ বললেন, “তবে?”

বিনয়বাবু মুখ খোলবার আগেই বিমল বলে উঠল, “চুলোয় যাক ও সব বাজে কথা। কোথা থেকে বাইরের হাওয়া আসছে, আগে সেইটেই দেখা দরকার!”

এমন সময়ে আমরা সবিস্ময়ে শুনলুম, বাঘার উচ্চ কণ্ঠের উত্তেজিত চিৎকার! এ ভয়ের বা রাগের নয়, পরিপূর্ণ আনন্দের চিৎকার এবং এ চিৎকার আসছে গুহার বাহির থেকেই!

তারপরেই যেখানে দানব-মূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল ঠিক সেইখানেই যেন পাথরের দেওয়াল ফুঁড়ে দেখা দিলে আমাদের বাঘা!

আমাদের দিকে চেয়ে সে দুই-তিনবার ঘেউ-ঘেউ করে ডাকলে এবং তারপরেই প্রবলভাবে লাঙুল দোলাতে দোলাতে একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তারপর তার ঘেউ ঘেউ রব আসতে লাগল আবার বাহির থেকে! যেন সে জানাতে চায়, “কর্তা, আমি বাইরে বেরুবার পথ খুঁজে পেয়েছি—তোমরা শীগগির আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে এস।”

যদি আবার কোন দানব-শত্রু আমাদের অপেক্ষায় দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, সেই ভয়ে এতক্ষণ আমরা ইতস্ততঃ করছিলুম, কিন্তু বাঘার ব্যবহার দেখে আমাদের আর কোন ভাবনাই রইল না—আবার এগিয়ে চললুম সামনের দিকে।

বেশিদূর নয়, মাত্র দশ-বারো পদ অগ্রসর হয়েই সানন্দে দেখলুম, পাশের দিকে পাহাড়ের দেওয়ালে মস্ত একটা ফাটল এবং তারই মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে লক্ষ তারকার চকমকি-জ্বালানো কালো আকাশের খানিকটা! সেই ফাটল দিয়েই গুহার ভিতরে হু-হু করে প্রবেশ করছে শীতল বাতাসের উচ্ছ্বাস।

ইকটিনাইক বললে, "এ ফাটলের কথা আমরা কেউ জানতুম না। এই সেদিন এখানে ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে, হয়তো এটা তারই কীর্তি।"

ফাটলের জন্ম-বিবরণ নিয়ে আমরা কেউ আর মাথা ঘামালুম না, ফাটলটা যে এখন এখানে আছে আমাদের পক্ষে তাইই যথেষ্ট! সকলে একে একে সেই বিচিত্র সমাধি-গুহার বিপুল গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালুম মুক্ত-বাতাসের এলাকায়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাদর সম্ভাষণ করবার জন্যেই যেন চারিদিক থেকে ছুটে এল অরণ্যের মর্মর-কলরব! একটা ঝরণার ঝর্ঝর-তানও শুনতে পেলুম—কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না, সবদিকেই ঘুট্‌ঘুট্ করছে দারুণ অন্ধকার।

ইকটিনাইক বললে, "আমরা কোথায় এসেছি, আমি সেটা আন্দাজ করতে পারছি। বিদেশী, পাহাড়ের গা এখান থেকে সমান ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে। অন্ধকারে আর পথ-চলা নয়—এইখানে বসেই বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিতে হবে।"

ঊষার আলোকোৎসবে গান গাইতে লাগল পাখির দল, পুলক-রোমাঞ্চ জাগিয়ে বনে বনে দুলতে লাগল সরস শ্যামলতা এবং আকাশ তার কালো শাড়ি বদলে পরলে আবার উজ্জ্বল নীলাম্বরীখানি।

আর আমাদের পায়ের তলায় এ কি অভাবিত অদ্ভুত দৃশ্য! আমরা সবাই তাকিয়ে রইলুম, অভিভূতের মতো।

কেমন করে সে দৃশ্য বর্ণনা করব, বুঝতে পারছি না। সার্কাসের গ্যালারি যেমন মণ্ডলাকারে চারিদিক জুড়ে নেমে আসে, এখানেও তেমনি মাইল তিন-চার জায়গা জুড়ে চতুর্দিক থেকেই পর্বতের প্রাচীর

ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে একটি চক্রাকার সমতল জমির দিকে। সেই গোল জমির আয়তন দেড় কি দুই মাইলের মধ্যেই এবং সেইখানেই রয়েছে ছবির মতন চমৎকার শহর! উচ্চ মন্দির ও প্রাসাদ, সিংহদ্বার, ছোট-বড়-মাঝারি সারি সারি বাড়ি ও রাজপথ এবং এখানে-ওখানে নীল সরোবর ও ফুলে ফুলে রঙিন উদ্যান—কিছুই আমাদের নজর এড়ালো না।

ইকটিনাইক হঠাৎ ভাবাভিভূত কণ্ঠে বলে উঠল, "বিদেশী, পৃথিবীর বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখা এই আমাদের আদরের সূর্যনগরী! পূর্ব-পর্বতের উপরে ঐ দেখ গিরি-সঙ্কট! ওরই মধ্য দিয়ে সূর্যনগরে যাতায়াত করবার জন্যে আছে একটিমাত্র পথ, আর ওরই মধ্য দিয়ে প্রভাতের প্রথম সূর্যের সোনালী কিরণ এসে নগরের সূর্য দেউলের সোনার গম্বুজে জ্বেলে দেয় বিদ্যুৎ-আগুনের পতাকা! তারপর দুপুরে সূর্য যখন পূর্ণ-মহিমায় জাগেন মাঝ-গগনে, তখন চারিদিকের এই ঢালু পাহাড়ের গা বয়ে নগরের উপরে গড়িয়ে পড়তে থাকে আলোক-দেবতার আশীর্বাদের মতন প্রখর রৌদ্রের প্রবল বন্যা—সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে মন্দিরে জেগে ওঠে স্বর্ণ-ঘণ্টার ছন্দে ছন্দে দামামার পর দামামা আর পুরোহিতের গম্ভীর কণ্ঠের স্তোত্রগান! সেই সময়েই সূর্যনগরীর সমস্ত সন্তান প্রধান মন্দিরের প্রাঙ্গণে একত্রে নতজানু হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে প্রার্থনা করে—'হে দিবাকর! হে সৃষ্টির প্রথম অগ্নিপুঞ্জ! হে চিরজাগ্রত জ্যোতির্ময় মহাদেবতা! আমাদের অন্ধকার বর্তমানকে আবার তুমি আলোকিত কর—ফিরিয়ে আনো, ফিরিয়ে আনো, ফিরিয়ে আনো আবার আমাদের অতুলনীয় অতীতের নিখিল গরিমা, বিপুল মহিমা!' হায় বিদেশী, এ উপাসনায় যোগ দেবার সৌভাগ্য আর আমার হবে না!"

ফিলিপ বললেন, "কেন ইকটিনাইক, তোমার এতটা হতাশ হবার তো কোন কারণ নেই!"

গলদাশ্রুলোচনে দুঃখের হাসি হেসে ইকটিনাইক বললে, "বিদেশী,

তুমি কি বুঝতে পারছ না, সূর্যনগর আর আমার মতন বিশ্বাসঘাতককে আশ্রয় দেবে না? এখন থেকে আমাকে নির্বাসিতের জীবনযাপন করতে হবে?"

সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে রইলুম।

ইকটিনাইক চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, "কিন্তু তোমাদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা আমি পালন করব। চল, তোমাদের সূর্যনগরে নিয়ে যাই!"

ফিলিপ বললেন, "কিন্তু সেটা কি নিরাপদ হবে?"

—"হ্যাঁ, আপাততঃ বিশেষ ভয়ের কারণ নেই। শহরে লোক থাকে মোটে তিন হাজার। তার মধ্যে যারা যোদ্ধা আর সক্ষম, তারা সবাই গিয়েছে তোমাদের খোঁজে। তারা এখনো বসে আছে সমাধি-গুহার পথ আগলে। তারা গুহা থেকে বেরুবার নতুন পথের খবর জানে না। শহরের ভিতরে আছে খালি বৃদ্ধ, শিশু, বালক আর নারীর দল। জনকয় প্রহরীও আছে, কিন্তু তাদের তোমরা নিরস্ত্র বলে মনে করতে পারো।"

—"কেন?"

—"তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। যা-কিছু নতুন বা আধুনিক, যা-কিছু বিদেশী, তা নিয়ে কেউ সূর্যনগরে ঢুকতে পারে না। তোমাদের ঐ অটোমেটিক বন্দুক আর রিভলবার দেখলে প্রহরীরা নিশ্চয়ই বাধা দিতে সাহস করবে না।...এস, আর দেরি কোরো না, পাহাড়ের আনাচে-কানাচে গুপ্তচর আছে, যোদ্ধারা খবর পেলে আর রক্ষে নেই!"

সকলের সঙ্গে নিচের দিকে নামতে নামতে ফিলিপ বললেন, "যোদ্ধারাও কি বন্দুক নিয়ে নগরের ভিতরে ঢুকতে পারে না?"

ইকটিনাইক বললে, "না। শহরের বাইরে আছে অস্ত্রশালা। সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র সেইখানে জমা রাখা হয়। শহরের ভিতরে যোদ্ধাদের হাতে থাকে কেবল বর্শা, কুঠার, তরবারি আর ধনুকবাণ। সংখ্যায় তারা দেড় হাজারের কাছাকাছি। সুতরাং তারা যদি দল বেঁধে আক্রমণ করে,

তোমাদের চার-পাঁচটা বন্দুক তাদের ঠেকাতে পারবে না। আশার কথা এই যে, সেই যোদ্ধার দল এখন শহরের ভিতরে নেই।"

প্রায় দুই হাজার ফুট নিচে রয়েছে সূর্যনগর। নামতে নামতে প্রধান সূর্যমন্দিরের রৌদ্রোজ্জ্বল গুম্বজ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল বারংবার। যে দেবতার মন্দিরের এত-বড় গুম্বজ সোনায় মোড়া, না জানি তাঁর ভাণ্ডারে জমা আছে কত আশ্চর্য! স্পেনীয় দস্যুদের হাত-ছাড়া হয়ে ইনকাদের গুপ্তধনও নিশ্চয় ঐ মন্দিরের ভিতরেই প্রবেশ করেছে।...এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে আমরা যখন পাহাড়ের প্রায় পাদদেশে গিয়ে পড়েছি, তখন হঠাৎ তীব্র এক তূর্যধ্বনিতে চারিদিক যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল!

সচমকে অত্যন্ত বিবর্ণ মুখে ইকটিনাইক বললে, "সর্বনাশ!"

—"কি ইকটিনাইক?"

—"তূর্যধ্বনি করে যোদ্ধাদের কাছে খবর পাঠানো হল শত্রু এসেছে নগর-দ্বারে!"

আবার তূর্যধ্বনি হল—আবার, আবার! তারপরেই দূরে জাগল কালকের মতন সেই দামামা-ধ্বনি—শত শত দামামা একই স্বরে সেই একই কথা বলছে—"মারো মারো, শত্রু মারো। মারো মারো, শত্রু মারো!"

ফিলিপ বললেন, "ইকটিনাইক, এখন আমরা কি করব?"

—"এক উপায় আছে, উপরে উঠে আবার সেই গুহার ভিতরে গিয়ে ঢোকা। কিন্তু তার আগেই হয়তো যোদ্ধারা এসে আমাদের দেখে ফেলবে। এখানে তারাও বন্দুক ব্যবহার করবে, আমরা তাদের বাধা দিতে পারব না।"

ইকটিনাইক স্তব্ধ হয়ে কি ভাবতে লাগল। ইতিমধ্যে আমরা বেশ বুঝতে পারলুম যে, দামামাগুলোর ঐকতান খুব তাড়াতাড়ি আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে! বলতে বাধা নেই, প্রাণের আশা আমি এক-রকম ছেড়েই দিলুম!

ইকটিনাইক হঠাৎ বলে উঠল, "বিদেশী, চল চল—শহরের দিকে চল!"

—"শহরের দিকে!"

—"হ্যাঁ, শহরের ভেতরে ওরা বন্দুক ব্যবহার করতে পারবে না। সেটা তবু মন্দের ভালো!"

—"কিন্তু তারপর?"

—"তার পরের কথা তার পরেই ভাবলে চলবে। এখানে দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নেই। ঐ দেখ!"

পাহাড়ের শিখরের উপরে এর মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছে একদল যোদ্ধা! অত উঁচু থেকে তাদের দেখাচ্ছে কতকগুলো ছোট ছোট অতি-ব্যস্ত চলন্ত পুতুলের মতো! প্রথম দল বেগে আমাদের দিকেই নামতে লাগল এবং তারপরেই পাহাড়ের টঙে দেখা দিলে নতুন আর একদল যোদ্ধা! বার-কয়েক বন্দুকের গর্জনও শুনলুম, কিন্তু গুলিগুলো আমাদের কাছ পর্যন্ত এল না—বোধ হয় ওরা এখনো আমাদের দেখতে পায়নি!

ইকটিনাইক বললে, "এস আমার সঙ্গে। কিন্তু, তার আগে এক কথা।"

—"কি?"

—"আমি বিশ্বাসঘাতক হতে পারি, কিন্তু আমি বিধর্মী নই। সূর্যনগরে যাবার আগে তোমাদের এক প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

—"কি প্রতিজ্ঞা?"

—"সূর্যনগরে গিয়ে তোমরা যদি রক্ষা পাও, তাহলে তার গুপ্তধনে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।"

ফিলিপ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

—"শীঘ্র প্রতিজ্ঞা কর। ঐ দেখ, শত্রুরা ক্রমেই কাছে এসে পড়ছে!"

ফিলিপ আমাদের দিকে ফিরে সব কথা বুঝিয়ে দিলেন।

বিমল বললে, "মিঃ ফিলিপ, আসবার আগেই তো আপনাকে বলেছিলুম, আমরা গুপ্তধনের খোঁজে বিপদকে বরণ করিনি। আমরা চেয়েছিলুম নতুন অভিযানে বেরুতে, জীবনের নিশ্চেষ্টতা দূর করতে, নতুন বিস্ময়ের সঙ্গে পরিচিত হতে। আমাদের সেই ইচ্ছা সফল হয়েছে। কেন আমরা এদের গুপ্তধন হরণ করব? আমরা কি দস্যু?"

ফিলিপ বললেন, "সাধু বিমলবাবু, সাধু! তাহলে আমারও ঐ কথা!"

ইকটিনাইক অধীর ভাবে বললে, "বল বিদেশী, বল! তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করবে না?"

ফিলিপ বললেন, "ইকটিনাইক, প্রতিজ্ঞা করছি আমরা, গুপ্তধনের দিকে দৃষ্টিপাত করব না!"

ইকটিনাইক নিচের দিকে নামতে নামতে বললে, "চল তবে সূর্যনগরে!"

আরো শ-ছুয়েক ফুট নিচে নেমেই সমতল জমির উপরে এসে পড়লুম।

সামনেই নগর-তোরণ! সেখানে ছুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের মুখের ভাব দেখেই বুঝলুম, আমাদের এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আবির্ভাবে তারা একেবারেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছে।

প্রহরীদের হতভম্ব-ভাবটা কাটতে-না-কাটতেই আমরা বাঘের মতন তাদের উপরে লাফিয়ে পড়লুম—বন্দুকের কুঁদোর ছুই-এক ঘা খেয়েই তারা আর্তনাদ করতে করতে পালিয়ে গেল।

ওদিকে এতক্ষণ পরে পাহাড়ের উপর থেকে যোদ্ধারাও আমাদের আবিষ্কার করে ফেলেছে। তারা ঘন ঘন বন্দুক ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু অত উঁচু থেকে দ্রুতপদে নামতে নামতে তারা বোধহয় লক্ষ্য স্থির করতে পারলে না—নগর-প্রান্তের রাজপথের উপরে এসে জড়ো হয়েছিল যে কৌতূহলী ও বিস্মিত জনতা, গুলিগুলো সোজা গিয়ে পড়ল তার ভিতরেই! স্বপক্ষের গুলিতেই হত বা আহত হয়ে পাঁচ-ছয়জন লোক মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল। তাদের কৌতূহল তখনি ঠাণ্ডা হয়ে গেল—দেখতে দেখতে সেই বিপুল জনতা অদৃশ্য! ইকটিনাইক ঠিক বলেছে, এ হচ্ছে বৃদ্ধ, বালক, শিশু আর নারীর জনতা—এর মধ্যে একজনও যুবক নেই।

নগর-তোরণের আড়াল থেকে উঁকি মেরে আমরা দেখলুম, পূর্ব দিকের পর্বত-পৃষ্ঠের যেখানেই তাকানো যায়, সেইখানেই চোখে পড়ে দলে দলে সশস্ত্র যোদ্ধার মূর্তি—নানারকম অস্ত্র আস্ফালন ও বিকটস্বরে চিৎকার করতে করতে তারা নিচের দিকে নেমে আসছে ঝড়ের মতো!

ফিলিপ ব্যগ্রস্বরে বললেন, "ইকটিনাইক, ওরা যে এসে পড়ল!"

কিন্তু কোনো জবাব না দিয়ে ইকটিনাইক পাথরের মুর্তির মতন সেইখানে দাঁড়িয়ে মগ্ন হল আবার গভীর চিন্তায়।

ফিলিপ বললেন, "কি বিপদ! তাহলে কি আমাদের এখানেই দাঁড়িয়ে দেড় হাজার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে?"

বিমল পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বিস্মিত স্বরে বললে,—"চেয়ে দেখ কুমার, চেয়ে দেখ!"

—"কি?"

—"কালো বাজ!"

তাই তো, কালো বাজই তো! সে তাহলে মরেনি! পাহাড়ের সবচেয়ে নিচে এসে পড়েছে যে যোদ্ধার দল তারই সামনে সকলকার মাথার উপরে মাথা জাগিয়ে কালো বাজের দানবের মতন বিপুল দেহ লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে। তার মুখের একপাশে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—বিমলের বন্দুকের কীর্তি!

তারপর ইকটিনাইকের ধ্যানভঙ্গ হল। অত্যন্ত কাতর ও শ্রান্ত স্বরে সে বললে, "বিদেশী, নরপিশাচ কালো বাজ এখনো যখন বেঁচে আছে, তখন আমাদের বাধ্য হয়েই চরম উপায় অবলম্বন করতে হবে।"

—"চরম উপায়?"

—"হ্যাঁ, চরম উপায়। সামনেই ঐ দেখ পবিত্র সূর্যমন্দির। একমাত্র বাঁচবার উপায় আছে ওর মধ্যেই। ভেবেছিলুম বিদেশীদের স্পর্শে ও-মন্দির কলঙ্কিত করব না।—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই-ই করতে হল"—বলতে বলতে ইকটিনাইক ছুটে চলল। আমরাও তার অনুসরণ করলুম।

নীলাকাশে সোনার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট সূর্যমন্দির—চারিদিকে তার প্রকাণ্ড পাথরের দেওয়াল। ইকটিনাইকের সঙ্গে সঙ্গে তোরণ পেরিয়ে শত্রুদের ভয় দেখাবার জন্যে বার বার বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমরা মন্দিরের অঙ্গনে গিয়ে পড়লুম। ঝড়ের মুখে উড়ে যায় যেমন শুকনো পাতার রাশি,—বিস্মিত, চমকিত ও ভীত পুরোহিত ও অন্যান্য লোকরাও তেমনি আমাদের সুমুখ থেকে প্রাণপণে

পালিয়ে কে যে কোথায় অদৃশ্য হল, বোঝা গেল না!

মস্ত অঙ্গনের পর প্রধান মন্দিরের বিস্তৃত সোপানশ্রেণী। দ্রুতপদে তার উপর দিয়ে উঠছি, হঠাৎ অভাবিত কণ্ঠের এক সঙ্গীত-ধ্বনি শুনে আমরা সবাই চমৎকৃত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম!

উচ্চস্বরে গান হচ্ছে ঃ

"জয়যাত্রার রথ ছুটেছে
দূর অজানার মন্তরে!
যা তুই ভীতু, আতুর মুখে
করিস নে হা-হন্ত রে!
রথ ছুঠেছে উল্কাবেগে,
স্থবির জীবন উঠছে জেগে,
কালবোশেখীর তুফানে মোর
চিত্ত যে তাই সন্তরে!"

বিনয়বাবু চিৎকার করে বললেন, "মৃণু, মৃণু, আমার মৃণু!"

গান থামল না, সমান চলল—

"রথ ছুটেছে—রথ ছুটেছে! শব্দে কাঁপে শৈলচূড়ো,
রথ ছুটেছে—চাকার তলায় ভয় ভীরুতা ধূলোয় গুঁড়ো!
রক্তে ফোটে রক্তজবা,
দেখছে চেয়ে বিশ্বসভা,
সারথি হয় বিপদ-রথের
কে সে ভাগ্যবন্ত রে—
জয়যাত্রার রথ ছুটেছে
দূর অজানার মন্তরে!

"মৃণু, মৃণু" বলে পাগলের মতো চ্যাচাতে চ্যাচাতে বিনয়বাবু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময়ে পিছনে জাগল ভীষণ কোলাহল।

ফিরে দেখি, মন্দিরের তোরণ পেরিয়ে অঙ্গনের ভিতরে বেগে প্রবেশ

করলে মূর্তিমান মৃত্যুর মতো কালো বাজ এবং তার পিছনে পিছনে যোদ্ধার পর যোদ্ধার দল!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রেতমানুষ কারা

—"মৃণু, আমার মৃণু!"

মৃণুর গান থেমে গেল।

ইকটিনাইক বললে, "বিদেশী, শীগগির সামনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়!"

আমরা যখন সবাই ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম, ইকটিনাইক বললে, "এখন এই দরজাটা বন্ধ করতে হবে।"

মস্তবড় দরজা—প্রায় যোলো ফুট উঁচু ও আট ফুট চওড়া। লোহার পুরু পাল্লা—যেমন ভারি, তেমনি দুর্ভেদ্য! এ দরজা বন্ধ করতে হলে অন্ততঃ কয়েকজন লোকের দরকার।

ইতিমধ্যে সামনে এসে আবির্ভূত হল কালো বাজের বিভীষণ মূর্তি! কিন্তু বিমল তাকে এক মুহূর্ত দাঁড়াতেও দিলে না, হঠাৎ বিদ্যুৎ-বেগে এগিয়ে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার মাথায় করলে এমন প্রচণ্ড আঘাত, যে মূল-কাটা কলাগাছের মতো তখনি দড়াম করে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল, আর নড়ল না—একটা টুঁ-শব্দও করলে না।

পিছনে পিছনে ছুটে আসছিল যে যোদ্ধার দল, আমরা বারকয়েক, 'অটোমেটিক রাইফেল' ছুঁড়তেই তারা আবার চোখের আড়ালে সরে পড়ল কে কোথায়! অঙ্গনে পড়ে ছটফট করতে লাগল কেবল কয়েক-জন আহত।

তারপর আমরা সবাই মিলে মন্দিরের সেই প্রকাণ্ড দরজা ভিতর

থেকে বন্ধ করে দিলুম।

বন্ধ দরজার উপরে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ইকটিনাইক হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "আর আমাদের ভয় নেই। মূল মন্দিরে ঢোকবার এই একটিমাত্র দরজা।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা একটা প্রকাণ্ড ছাদ-ঢাকা সুদীর্ঘ পথের মতো—চারিদিকেই তার উঁচু পাথরের দেওয়াল। তার ভিতরে সর্বত্রই আলো-আঁধারির লীলা!

বিনয়বাবু আবার চিৎকার করলেন—"মৃণু, মৃণু! তুমি কোথায় আছ? সাড়া দাও!"

পথের অপর প্রান্ত দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে মৃণু! মুখে তার মধুর হাসি; পরনে তার রেড-ইণ্ডিয়ান নারীদের মতন বর্ণোজ্জ্বল পোশাক; গলায়, হাতে জ্বলছে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার!

বিনয়বাবু ছুটে গিয়ে মেয়েকে বুকের ভিতরে টেনে নিলেন। তারপর কেঁদে ফেললেন আনন্দের আবেগে।

মৃণু আদর করে বাপের চোখের জল মুছে দিতে দিতে বললে, "বাবা, তুমি কাঁদছ কেন, আমি তো কোন বিপদেই পড়িনি—এরা আমাকে খুব সুখেই রেখেছিল! এ অ্যাডভেঞ্চার আমার ভারি ভালো লেগেছে!

বিনয়বাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "তুই জানিস না মা, কত-বড় দুর্ভাগ্য ঝুলছিল তোর মাথর উপরে।"

—"দুর্ভাগ্য! কি দুর্ভাগ্য?"

—"এরা এখানকার ইনকার সঙ্গে জোর করে তোর বিয়ে দিত!"

—"তাই নাকি বাবা, তাই নাকি? আমি হতুম ইনকার ইনকী? আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, আমি একবার প্রাণ ভরে হেসে নি! হাসতে হাসতে মাটির ওপরে গড়িয়ে পড়ি।"

এমন সময়ে বাহির থেকে মন্দিরের লোহার দরজার উপরে দুম দুম করে আঘাতের শব্দ শোনা গেল।

ইকটিনাইক বললে, "ওরা যতই ধাক্কা মারুক আর যতই চেষ্টা করুক,

এ দরজা খুলবে না। এ হচ্ছে পাহাড়ের মতন অটল!"

ফিলিপ বললেন, "সবই তো বুঝলুম। কিন্তু আমরা তো চিরদিন এই মন্দিরের ভিতরে বন্দী হয়ে থাকতে পারব না!"

ইকটিনাইক এতক্ষণ পরে হেসে বললে, "বিদেশী, বন্দী হব বলে তো এ মন্দিরের ভিতরে আসিনি!"

—"তোমার কথার মানে কি ইকটিনাইক?"

—"মন্দির থেকে বেরুবার জন্যে একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ আছে!"

—"সুড়ঙ্গ পথ!"

—"হ্যাঁ! সে পথের সন্ধান জানে কেবল পুরোহিতরা। এতক্ষণ তোমাকে বলিনি, আমিও এ মন্দিরের এক পুরোহিতের ছেলে। যদি কখনো অর্থলোভী শ্বেতাঙ্গরা সন্ধান পেয়ে এই মন্দির আক্রমণ করে, তাহলে গুপ্তধন নিয়ে পালাবার জন্যে এই সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে।"

—"তুমি এই সুড়ঙ্গের সন্ধান জানো?"

"জানি। মাটির ভিতর দিয়ে এই সুড়ঙ্গ এক মাইল গিয়ে এক পাহাড়ের গুহার সামনে শেষ হয়েছে।"

"তাহলে চল ইকটিনাইক, এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।"

—"কিন্তু বিদেশী—"

—"বল, থামলে কেন?"

—"সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে, যে পথ দিয়ে এসেছি আবার আমাদের সেই পথেই ফিরতে হবে।"

—"বেশ তো, তাই ফিরব।"

—"কিন্তু দলে আমরা হালকা। লাল মানুষদের ফাঁকি দিলেও প্রেতমানুষদের আবার ফাঁকি দিতে পারব কি?"

—"তোমার ঐ প্রেতমানুষদের আমরা ভয় করি না।"

—"তোমরা কর না, কিন্তু তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আমাকে তো আবার এই পথ দিয়েই একলা ফিরতে হবে?

—"ইকটিনাইক, অবোধের মতন কথা বোলো না। বুঝে দেখ,

এদেশে আর তোমার ফেরবার উপায় নেই!"

—"তবে আমি কি করব?"

—"তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। আমরা চিরদিন তোমাকে বন্ধুর মতন দেখব। নতুন দেশে গিয়ে তুমি নতুন ভাবে জীবন আরম্ভ করবে।"

ইকটিনাইক মাথা হেঁট করে স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল।

ফিলিপ সাহেব তখন আমাদের দিকে ফিরে সব কথা বুঝিয়ে দিলেন।

সব শুনে বিনয়বাবু বললেন, "মিঃ ফিলিপ, ইকটিনাইককে প্রেত-মানুষ নিয়ে মাথা ঘামাতে বারণ করে দিন। ওকে বলুন, প্রেতমানুষরা প্রেতও নয়, মানুষও নয়।"

ফিলিপ বললেন, "কি আশ্চর্য, তবে তারা কি?

—"বনমানুষ।"

আমি বললুম, "বনমানুষ বলতে আমরা বুঝি কেবল ওরাংওটান কি গরিলা। কিন্তু ওরাঙের স্বদেশ মালয় দ্বীপে আর গরিলার স্বদেশ হচ্ছে আফ্রিকায়। দক্ষিণ আমেরিকায় গরিলা কি ওরাঙের জন্ম অসম্ভব।"

বিনয়বাবু বললেন, "ঠিক। কিন্তু এখানে অন্য জাতের এক বৃহৎ বনমানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে তাদের নামকরণ হয় নি—তবে তারা গরিলাও নয়, ওরাঙও নয়।"

—"আপনার কাছে কোন প্রমাণ আছে?"

—"আছে বৈকি! **Hammerton** সাহেবের "**Wonders of Animal Life**" নামে বইয়ের চতুর্থ খণ্ডে ১৫০৩ পৃষ্ঠায় এই জাতের বনমানুষের ছবি আমি তোমায় দেখাতে পারি। কিছুদিন আগে একদল জীবতত্ত্ববিদ দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে অভিযানে বেরিয়ে টারা নদীর ধারে এই জাতের দুটি বনমানুষের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাদের একটিকে তাঁরা গুলি করে মারতে পেরেছিলেন। লালমানুষরা নিশ্চয়ই তাদেরই প্রেতমানুষ বলে ভ্রম করে!"

ফিলিপ সাহেব বললেন, "যাক, প্রেতমানুষের দুঃস্বপ্ন তাহলে ছুটে গেল। এখন তবে উদ্ধারলাভের চেষ্টা দেখা যাক!"

মৃণু বললে, "সে কি! বিমলদা, তোমরা ইনকাদের গুপ্তধন দেখবে না? চল, আমি তোমাদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। সে ঘর আমি সচক্ষে দেখেছি। একদিকে তার কড়িকাঠ-সমান উঁচু সোনার তালের স্তূপ, আর-একদিকে চারটে মস্ত মস্ত সিন্দুক ভরা হীরে পান্না চুনী মুক্তো! আলিবাবার রত্নগুহাও তার কাছে হার মানে!"

বিমল মাথা নেড়ে বললে, "না মৃণু, আমরা ইকটিনাইকের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, ইনকাদের গুপ্তধনের দিকে দৃষ্টিপাতও করব না। কি ছার সোনা-রূপো, কি ছার মণি-মুক্তো! আজ তুমি বিপুল বিশ্বে বেরিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে, এর সঙ্গে কি সোনাদানা মণি মুক্তোর তুলনা হয় মৃণু?"

ফিলিপ বললেন, "ইকটিনাইক, আমরা প্রস্তুত! এখন পথ দেখাও।"

ইকটিনাইক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চলুন তবে!"

আমরা সবাই একদিকে অগ্রসর হলুম। মৃণু গান ধরলো—

"ইনকা যদি করত আমায় ইনকী রে!
চক্ষে তবে জ্বলত আমার
অগ্নিরাগের ফিনকি রে!
এক চড়ে তার ঘুরত মাথা,
কুঁচকে যেত বুকের ছাতা,
ভাবত বোকা—'এমনি ভাবেই
কাটবে আমার দিন কি রে,—
এ যে বিষম ইনকী রে!"

মৃণুর গান শুনেই বাঘা উপরদিকে মুখ তুলে শেয়ালের মতন স্বরে চিৎকার শুরু করলে—"ঔ, ঔ, ঔ—উ-উ-উ-উ!" আমাদের বাঘা মোটেই সঙ্গীত কলার ভক্ত নয়। গান কি বাজনা শুনলেই তার মনে করুণ রসের সঞ্চার হয়!

●

প্রশান্তের আগ্নেয়-দ্বীপ

বিমল ও কুমার তো তোমাদের অনেকদিনের বন্ধু ; কিন্তু তোমরা বোধহয় এটা জানো না, তারা দুজনেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এক তিথিতে এবং একই দিনে।

আজ মাসের পয়লা। এই মাসের আটাশ তারিখে তাদের দুজনের জন্মতিথি। তাদের প্রত্যেক জন্মতিথিতেই বিশেষ একটি অনুষ্ঠান হয়। এবারকার উৎসবে কি করা কর্তব্য, সেদিন সকালের চায়ের আসরে বসে গভীরভাবে চলছিল তারই আলোচনা।

জয়ন্ত এবং মানিক বোধহয় তোমাদের কাছে অচেনা নয়। মাঝে মাঝে তারা বিমলদের সঙ্গে দেখা করতে আসতো, সেদিনও এসেছিল। আর সুন্দরবাবুর কথা তো বলাই বাহুল্য ; কারণ, এখানকার প্রভাতী চায়ের বৈঠকে কোনদিনই তাঁকে অনুপস্থিত দেখা যায় না। সুতরাং বলতে হবে আজকের চায়ের আসরটি জমে উঠেছিল রীতিমত।

এমনকি বাঘা কুকুরও হাজিরা দিতে ভোলে নি। সেও সামনের দুই পায়ে ভর দিয়ে বসে দুই কান তুলে ঊর্ধ্বমুখে অত্যন্ত উৎসুক ভাবে তাকিয়ে ছিল চায়ের টেবিলের দিকে। সে বেশ জানে, টেবিলের উপর থেকে এটা-ওটা-সেটা কিছু কিছু অংশ তারও দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।

মাঝে মাঝে রামহরি খাবারের ট্রে হাতে করে ঘরের ভিতরে ঢুকে সকলকে পরিবেশন করে আবার বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

সুন্দরবাবু একখানা গোটা স্যাণ্ডউইচ নিজের মস্ত মুখ-বিবরে ছেড়ে দিয়ে চর্বণ করতে করতে অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "বিমল ভায়া, তোমাদের প্রতি জন্মতিথিতেই তো আমরা এসে নিমন্ত্রণ খেয়ে যাই ; কিন্তু এবারকার খাদ্যতালিকার ভিতরে আমার একটি বিনীত প্রার্থনা ঠাঁই পাবে কি ?"

সুন্দরবাবুকে জ্বালাবার কোন সুযোগই মানিক ত্যাগ করে না। সে বললে, "আপনার বিনীত প্রার্থনাটি নিশ্চয়ই খুব অসাধারণ ? হয়তো বলে বসবেন, আমি কাঁঠালের আমসত্ত্ব খাবো।"

সুন্দরবাবু স-টাক মাথা নেড়ে বললেন, "না কখখনো নয়, অমন অসম্ভব আবদার আমি করবো না। ফাজিল ছোকরা কোথাকার,

আমায় কি কচি খোকা পেয়েছ ?"

কুমার হাসতে হাসতে বললে, "আমাদের জন্মদিন আসতে না আসতেই চায়ের পেয়ালায় তুমুল তরঙ্গ তোলা কেন ? মানিকবাবু, আপনি সুন্দরবাবুকে আর বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না, ওঁর যা বলবার আছে উনি বলুন।"

সুন্দরবাবু মানিকের দুষ্টুমি-ভরা হাসির দিকে একবার সন্দেহপূর্ণ নেত্রে তাকিয়ে বললেন, "আমার কথাটা কি জানেন কুমারবাবু? এবারে আপনাদের জন্মতিথির খাদ্য-তালিকায় কিঞ্চিৎ নতুনত্ব সৃষ্টি করলে কেমন হয় ?"

"কি রকম নতুনত্ব সুন্দরবাবু !"

—"দেখুন কুমারবাবু, চিরদিনই শুনে আসছি বন-মুরগির মাংস নাকি একটি উপাদেয় খাদ্য ; কিন্তু এমনি আমার দুর্ভাগ্য যে, আজ পর্যন্ত আমার খাবারের থালায় বন-মুরগির আবির্ভাব হল না কখনও। আপনাদের জন্মতিথির দৌলতে যদি সেই সৌভাগ্যটা লাভ করতে পারি, তা হলে আমার একটি অনেক দিনের বাসনা চরিতার্থ হয়।"

মানিক বললে, "দেখছো তো জয়ন্ত, সুন্দরবাবুর আবদারটি কতদূর অসংগত।"

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত স্বরে বললেন, "কেন, অসংগত কেন? আমি কি কাঁঠালের আমসত্ত্ব খেতে চাইছি ? বন-মুরগি কি দুনিয়ায় পাওয়া যায় না ?"

মানিক বলেলে, "দুনিয়ায় অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু কলকাতার শহরে পাওয়া যায় না। আপনার বন-মুরগির জন্যে বিমলবাবুরা বনবাস করবেন নাকি ?"

জয়ন্ত বললে, "অভাবে কলকাতার ফাউল হলে কি চলবে না? সুন্দরবাবু কি বলেন ?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমার আর কিছুই বক্তব্য নেই। আরজি পেশ করলুম এখন বিমলবাবুদের যা মর্জি হয়।"

কুমার চোঁ করে শেষ চাটুকু পান করে উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, "তথাস্তু, সুন্দরবাবু, তথাস্তু! আমাদের আসছে জন্মবারে আপনাকে বন-মুরগির মাংস খাওয়াবোই, খাওয়াবো!"

বিমল একটু বিস্মিত স্বরে বললে, "কুমার, তুমি যে একেবারে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসলে হে! কলকাতার কোনো বাজারে বন-মুরগি বিক্রি হয় নাকি?"

কুমার বললে, "মোটেই না!"

—"তবে?"

—"আমার বন্ধু বিনোদলাল রায় চৌধুরী হচ্ছেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের জমিদার। তিনি প্রায়ই আমাকে ওখানে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেন। তুমি জানো বোধহয়, চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনে ঝাঁকে ঝাঁকে বন-মুরগি পাওয়া যায়! মনে করছি, কালই আমি দিন-কয়েকের জন্য চট্টগ্রাম যাত্রা করবো।"

মানিক বললে, "সে কি কুমারবাবু, সুন্দরবাবুর একটা আবদার রক্ষা করবার জন্যে আপনি এতটা কষ্ট স্বীকার করবেন?"

—"না মানিকবাবু, কেবল সুন্দরবাবু কেন, আমি আপনাদের সকলেরই তৃপ্তি সাধনের জন্যে চট্টগ্রামে যেতে চাই। জন্মতিথিতে বন্ধুদের যদি একটি নতুন জিনিস খাওয়াতে না পারি, তা হলে জন্মতিথির আর সার্থকতা রইল কোথায়? আমি কালই চট্টগ্রামের দিকে ধাবমান হবো। তারপর সেখানকার বন থেকে ডজন-খানেক জাত বন-মুরগি সংগ্রহ করে আবার ফিরে আসবো আমাদের কলকাতায়।"

মানিক বললে, "সুন্দরবাবু, আপনার 'বিনীত প্রার্থনা' তা হলে পূর্ণ হল। এইবারে আপনি পরমানন্দে অট্টহাস্য করতে পারেন।"

সুন্দরবাবু অত্যন্ত খাপপা হয়ে কেবল বললেন, "হুম্।"

চট্টগ্রাম থেকে কুমারের ফেরবার কথা ছিল বিশ তারিখে।

কিন্তু ঠিক তার আগের দিনে কুমারের কাছ থেকে বিমল এই

টেলিগ্রাম পেলে, "বন-মুরগি পেয়েছি ; কিন্তু আসছে কাল কলকাতায় পৌঁছুতে পারব না। বিশেষ কারণে আমাকে আরও দিন-কয়েক এখানে থেকে যেতে হবে। এ জন্যে যদি আমাদের জন্মতিথি-উৎসব মাটি হয়, উপায় নেই।"

টেলিগ্রামখানি হাতে করে বিমল বিস্মিত মনে ভাবতে লাগল, কুমারের বিশেষ কারণটা কী হতে পারে? নিশ্চয়ই কোনও সাধারণ কারণ নয় যার জন্যে বন-মুরগি পেয়েও সে যথাসময়ে এখানে আসতে নারাজ!

তেইশ তারিখে কুমারের আর একখানা টেলিগ্রাম এলো। সেখানি পড়ে বিমল জানতে পারলে, চব্বিশ তারিখের সকালে সে কলকাতা এসে পৌঁছবে।

কুমার একটি রীতিমত রহস্যপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তুলেছিল। সেই জন্য বৈঠকখানায় তার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল বিমল, জয়ন্ত ও মানিক।

খানিক পরে রাস্তায় দরজার কাছে একখানা গাড়ি আসবার শব্দ হল। অনতিবিলম্বেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে কুমার। জয়ন্ত বললে, "কুমারবাবু, আপনার টেলিগ্রামে যা দেখেছি, আপনার মুখেও দেখছি তাই।"

—"আমার মুখে কি দেখছেন জয়ন্তবাবু?"

—"রহস্যের আভাস।"

হাতের বন্দুকটা একটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে কুমার বললে, "হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, আপনি ভুল দেখেন নি। যা-তা রহস্য নয়—যাকে বলে একেবারে গভীর রহস্য ; কিন্তু সে কথা পরে বলছি, আগে বন-মুরগি-গুলোর একটা ব্যবস্থা করি।...রামহরি, ও রামহরি!"

পাশের ঘর থেকে সাড়া এলো, "কি বলছো গো কুমারবাবু?"

—"গাড়ির চালে এক ঝাঁকা জ্যান্ত রামপাখি আছে। তুমি সেগুলোকে বাগানে মুরগি-ঘরে রেখে এসো। তারপর তাড়াতাড়ি

আমার জন্যে খুব গরম এক পেয়ালা চা বানিয়ে দাও।”

কুমার নিজের কোটটা খুলে একখানা সোফার উপরে নিক্ষেপ করলে। তারপর নিজেও সেখানে বসে পড়ে বলল, “বিমল, অদ্ভুত ব্যাপার—একেবারে অভাবিত!”

বিমল বললে, “তোমার মুখ থেকে শুনছি বলেই ব্যাপারটা অদ্ভুত বলে বিশ্বাস করছি। পৃথিবীর সাড়ে পনেরো আনা লোকই যে-সব ব্যাপারকে অদ্ভুত বলে মনে করে, তার মধ্যে আমি কিছু মাত্র অদ্ভুতত্ব খুঁজে পাই না। কিন্তু তোমার-আমার কথা স্বতন্ত্র। এই জীবনেই আমরা এমন সব অসাধারণ ব্যাপার দেখেছি যে, আমাদের কাছে বোধহয় অদ্ভুত বলে আর কিছুই থাকতে পারে না। কাজেই তুমি যা অদ্ভুত আর অভাবিত বলে বর্ণনা করবে, নিশ্চয়ই তার মধ্যে দস্তুরমতো অসাধারণত্ব আছে। আমরা প্রস্তুত, আরম্ভ করো তোমার অদ্ভুত কাহিনী।”

বিমল সোফার উপর একটু সোজা হয়ে বসলো। গল্প শুনবার জন্য উন্মুখ হয়ে সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

বিশাল হলঘর একেবারে নিস্তব্ধ!

দুই

জন্তু না মানুষ

কুমার শুরু করলে: “কেমন করে আমি জ্যান্ত বন-মুরগি সংগ্রহ করলুম সে কথা শোনবার জন্যে নিশ্চয়ই তোমাদের আগ্রহ নেই। সুতরাং এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, চট্টগ্রাম-বিভাগে একটা পাহাড় অঞ্চলের বনের ভিতরে গিয়ে এই পক্ষীগুলোকে আমি বন্দী করেছি। অবশ্য এই কাজে আমার জমিদার বন্ধু বিনোদলাল আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

ফেরবার সময় সমুদ্রের ধার দিয়ে আসছিলুম। সমুদ্র থেকে মাইল-দশেক তফাতে চাকারিয়া নামে একটি জায়গা আছে। সেখানে বিনোদের কয়েক ঘর প্রজা ছিল। তাদের কয়েকজন বিনোদের সঙ্গে দেখা করতে এলো। লক্ষ্য করে দেখলুম, তাদের প্রত্যেকেরই মুখে চোখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন। তারা জানালে, একটা নর খাদক জন্তু এসে তাদের উপরে ভীষণ অত্যাচার করছে। ইতিমধ্যেই অনেকের গরু ও ছাগল তো অদৃশ্য হয়েছেই, তার উপরে জন পাঁচেক মানুষকেও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিনোদ জিজ্ঞাসা করলে, "জন্তুটা কি? বাঘ, না অন্য কোন জানোয়ার?"

উত্তরে জানা গেল, জানোয়ারটাকে কেউই স্বচক্ষে দেখে নি। গফুর আলীর বাড়ি থেকে জানোয়ারটা যেদিন একটা বাছুর নিয়ে যায়, সে রাত্রে বৃষ্টি পড়ে পথ ঘাট হয়েছিল কর্দমাক্ত। সকালবেলায় খোঁজাখুঁজির পর বাছুরের আধ-খাওয়া দেহটা পাওয়া যায় মাঠের একটা ঝোপের ভিতরে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই, সেখানে কাদার উপরে কোন জন্তুরই পায়ের দাগ পাওয়া যায় নি। কেবল এটা বেশ বোঝা গিয়েছে যে, রাত্রে একজন মানুষ ওই ঝোপের ভিতরে ঢুকে আবার বাইরে এসেছিল। কাদার উপরে স্পষ্ট ভাবেই দেখা গিয়েছিল একটা মানুষের পদচিহ্ন।

এইখানেই জেগে উঠল আমার আগ্রহ। জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমরা কি বলতে চাও, মানুষ ছাড়া কোন জন্তুই মাটির উপরে পদচিহ্ন ফেলে সেই ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করে নি?'

একজন বললে, 'প্রবেশ করে নি এ কথা কেমন করে বলব! ঝোপের ভিতরে বাছুরটার আধ-খাওয়া দেহ যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন বুঝতে হবে যে, এ কাজ কোন মানুষের নয়। মানুষ কখনও গরু-বাছুরের কাঁচা মাংস খেতে পারে না। বাছুরটা যে কোন হিংস্র জন্তুর কবলে পড়েছিল, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই জন্তুটা যে কেমন করে ঝোপের ভিতরে ঢুকে আবার বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে, কাদার উপরে তার কোন চিহ্নই আমরা আবিষ্কার করতে পারি নি!'

বিনোদ বললে, 'তাহলে কি তোমরা বলতে চাও জন্তুটা আকাশপথ দিয়ে আনাগোনা করেছে ? তোমাদের কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

লোকটি বললে, 'হুজুর আমাদের কথায় বিশ্বাস না করলে আমরা মারা পড়ব। এ অঞ্চলে রোজ রাত্রেই, হয় মানুষ নয় গরু-ছাগল অদৃশ্য হচ্ছে। চারিদিকে এমন বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে যে, সন্ধ্যার পরে পথে ঘাটে কেউ পা বাড়াতে ভরসা করে না। এমনকি রাত্রেও আমরা ভয়ে ঘুমুতে পারি না। হুজুর হচ্ছেন জমিদার, আপনি আমাদের রক্ষা না করলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো বলুন ?'

বিনোদ বললে, 'এ ব্যাপারে আমি তোমাদের কি সাহায্য করতে পারি কিছুই তো বুঝতে পারছি না !'

—'হুজুর, আপনাদের দুজনেরই কাছে বন্দুক রয়েছে। আপনারা ইচ্ছে করলেই জন্তুটাকে বধ করতে পারেন।'

বিনোদ বললে, 'তোমরা বাজে কথা বলছ। তোমরাও জন্তুটাকে দেখতে পাওনি, আবার বলছ মাটির উপরে পায়ের দাগ ফেলে সে চলাফেরা করে না। ঝোপের কাছে পেয়েছো মানুষের কতকগুলো পদ-চিহ্ন। মানুষ গরু-বাছুরের কাঁচা মাংস খায় না, এ কথা সত্য ; কিন্তু কোন মানুষ রাত্রে সেই ঝোপের ভিতরে যাবেই বা কেন ? তোমাদের কোন কথারই মানে আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

লোকটি কাঁদো কাঁদো মুখে আবার বললে, 'হুজুর, রক্ষা করুন, আমাদের রক্ষা করুন।'

বিনোদ অধীর স্বরে বললে, 'আরে, আমরা তোমাদের কেমন করে রক্ষা করবো ? তোমাদের জন্যে কি আমরা বন্দুক ঘাড়ে করে রাত্রে হাটে-মাঠে-ঘাটে পাহারা দিয়ে বেড়াব ?'

বিমল, আগেই বলেছি ততক্ষণে আমার কৌতূহল রীতিমত জেগে উঠেছে। ঘটনার মধ্যে আমি পেলুম যেন রহস্যের গন্ধ ! আমি বললুম, 'বিনোদ আমরা ইচ্ছে করলে হয়তো এদের কিছু সাহায্য করতে পারি।'

—'কি রকম ? তুমি তো কালকেই কলকাতার দিকে রওনা হতে

চাও।'

—'তুমি যদি রাজী হও, তাহলে আমি আরও তিন-চার দিন এখানে থেকে যেতে পারি।'

বিনোদ হেসে ফেলে বললে, 'বুঝেছি। চড়ুকে পিঠ সড়সড় করে আর ধুনোর গন্ধ পেলেই মনসা নাচেন! বেশ, যা ভালো বোঝো কর।'

বিমল, তার পরেই তোমার কাছে আসে আমার প্রথম টেলিগ্রাম।

লোকে যেমন করে বাঘ শিকার করে, আমিও অবলম্বন করলুম সেই পদ্ধতি।

পরদিনেই খবর এলো, কুতুবদিয়া প্রণালী সৃষ্টি করে পৃথিবীর একটা বাহু যেখানে বঙ্গোপসাগরের ভিতরে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, সেই নর-খাদক জন্তুটার শেষ আবির্ভাব হয়েছে সেখানেই। ঝোপের ভিতরে সেখানেও পাওয়া গিয়েছে একটা গরুর খানিকটা-খাওয়া দেহ।

হিংস্র জন্তুদের স্বভাবই হচ্ছে, উদর পূর্ণ হবার পর কোন দেহের খানিকটা বাকী থাকলে তারা সেটা ঝোপ-ঝাপের ভিতরে লুকিয়ে রেখে যায়! পরদিন রাত্রে আবার তারা ফিরে এসে দেহের বাকী অংশটাকে গ্রহণ করে।

আমরা ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে দেখলুম, যে ঝোপের ভিতরে গরুর দেহটা আছে, তার খুব কাছেই রয়েছে একটা মস্ত-বড় গাছ। লোক-জনের সাহায্যে সেই গাছের উপরে বাঁধলুম একটা মাচা। তারপর সন্ধ্যার আগেই বিনোদকে নিয়ে আমি সেই গাছে উঠে মাচার উপরে গিয়ে বসলুম।

রাত্রের প্রথম দিকে আকাশে ছিল অষ্টমীর চাঁদ। আলো খুব স্পষ্ট না হলেও চারিদিকে বেশ নজর চলছিল। যে ঝোপটার দিকে আমাদের লক্ষ্য, তার দুই পাশেই ছিল খানিকটা করে খোলা জমি। তারপর দুই দিকেই দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের প্রাচীর। ওই ঝোপটার ভিতরে ঢুকতে হলে খোলা জমিটা পার না হলে আর উপায় নেই। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই আমার চোখে পড়ল না।

তারপর চাঁদ গেল অস্তে। চারিদিকে অন্ধকার, আমাদের চোখও অন্ধ। বিনোদ একে রাত জাগতে অভ্যস্ত নয়, তার উপরে এই অন্ধকারের জন্যে বিরক্ত হয়ে সে আরম্ভ করলে নিদ্রাদেবীর আরাধনা। আমি কিন্তু ঠায় জেগেই বসে রইলুম। কোন দিকে চোখ চলছিল না বটে, কিন্তু আমার দুই কান হয়ে রইল অত্যন্ত সজাগ। সে রাত্রে বাতাস পর্যন্ত ছিল না, বনের গাছপালা একেবারে নীরব; কিন্তু এই স্তব্ধতাকে ভাঙতে পারে এমন কোন শব্দই আমার কানে প্রবেশ করলে না।

পূর্ব আকাশে ফুটে উঠল ভোরের আলোর প্রথম আভাসটুকু। দু-একটা পাখিও ডাকতে আরম্ভ করলে।

আমার রাত জাগা ব্যর্থ হল ভেবে বিনোদকে জাগিয়ে দেবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় সচকিতে দেখলুম হঠাৎ এক দৃশ্য!

ডান দিকের জঙ্গলের ভিতর থেকে জানোয়ারের মত দেখতে কি একটা বেরিয়ে এলো। অত্যন্ত ঝাপসা আলোতে জানোয়ারটা যে কি, তা বুঝতে পারলুম না; কিন্তু সে যে চার পায়ে ভর দিয়ে হাঁটছে এটুকু আমি লক্ষ্য করলুম। চলতে চলতে একবার সে সন্দিগ্ধ ভাবে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের গাছের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। অন্ধকারে বিড়ালের চোখ যেমন জ্বলে, তারও দুই চক্ষে রয়েছে তেমনি জ্বলন্ত নীলাভ আলো।

নিশ্চয়ই সে আমাকে দেখতে পায়নি, কারণ আবার সে অগ্রসর হল সেই ঝোপটার দিকে—যার ভিতরে ছিল গরুটার অর্ধভুক্ত দেহ।

আমি বুঝলুম এই আমার সুযোগ। বন্দুক তুলে তখনই ঘোড়া টিপে দিলুম।

বন্দুকের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই শুনলুম একটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত চিৎকার! যাকে মনে করছিলুম হিংস্র জন্তু, হঠাৎ সে দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বিষম যন্ত্রণায় ইংরেজী ভাষায় আর্তনাদ করে উঠল, **'Oh my God! My God!'**

দ্বিতীয়বার বন্দুক ছোঁড়বার জন্যে আমার হাতের আঙুল তখন আবার ঘোড়ার উপরে গিয়ে পড়েছিল, কিন্তু মনুষ্য-কণ্ঠের সেই আর্তনাদ শুনে আমি এমন হতভম্ব হয়ে গেলুম যে, আর বন্দুক ছুঁড়তে পারলুম না।

মানুষই হোক আর জানোয়ারই হোক, সেই জীবটা আবার মাটির উপরে পড়ে চতুষ্পদ জন্তুর মতই বেগে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ডানদিকের জঙ্গলের মধ্যে।

ইতিমধ্যে কানের কাছে বন্দুকের শব্দ শুনেই বিনোদলালের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তার উপরে আবার মানুষের আর্তনাদে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে!

প্রায় এক মিনিটকাল আমরা দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

তারপর বিনোদ জিজ্ঞাসা করলে, 'ব্যাপার কি কুমার? বন্দুক ছুঁড়লে কেন? মানুষই বা আর্তনাদ করলে কেন? জানোয়ার ভেবে তুমি মানুষ খুন করলে নাকি?'

আমি বললুম, 'আপাতত তোমার কোন প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারব না। তবে চতুষ্পদ জন্তুর মতো একটা কিছু দেখেছিলুম নিশ্চয়ই, নইলে খামোকা বন্দুক ছুঁড়তে যাব কেন? কিন্তু বন্দুক ছোঁড়বার ঠিক পরেই একটা মানুষের আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গেই মূর্তিটা দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো; তারপর সে পালিয়ে গেল আবার চতুষ্পদ জন্তুর মতই চার পায়ে ভর দিয়ে।'

বিনোদলাল আমার কথা বিশ্বাস করলে না। মাথা নেড়ে বললে, 'তুমি নিশ্চয় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন চোখে রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছ! চতুষ্পদ জানোয়ার কখনও মানুষের ভাষায় চিৎকার করে না। আর মানুষও কখনও চতুষ্পদ জন্তুর মতো চার পায়ে ভর দিয়ে ছুটে পালায় না।'

আমি বললুম, 'বেশ, তাহলে গাছ থেকে নেমে পড়। যে জীবটাকে দেখেছি, নিশ্চয় সে আমার গুলিতে জখম হয়েছে। জঙ্গলের ভেতর থেকে তাকে খুঁজে বার করা খুব কঠিন হবে না।'

সমস্ত বনভূমি তখন সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল জ্যোতির্ময়ী ঊষার শান্ত

আশীর্বাদে। আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে পাখির প্রভাতী সংগীতে। মাথার ওপরে আকাশ-পথ দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে বালি-হাঁস, বন-মুরগি এবং অন্যান্য পাখি। চোখের সামনে নেই আর অন্ধকার বা আবছায়ার বাধা।

মাটিতে নেমে আমরা দুজনে বন্দুক প্রস্তুত রেখে অগ্রসর হলুম। জঙ্গলের যেখানে গিয়ে জীবটা অদৃশ্য হয়েছিল, সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলুম, মাটির ওপরে রয়েছে টাটকা রক্তের দাগ। সেই রক্তের দাগ ধরে আমরা এগিয়ে চললুম।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বেশ খানিকটা এগুবার পর আমরা গিয়ে পড়লুম ফরসা জায়গায়। সেই খোলা জমির ওপরে গাছপালা নেই, মাঝে মাঝে আছে কেবল ঝোপঝাপ বা ছোট ছোট আগাছার জঙ্গল। তারপর দেখা যাচ্ছে বঙ্গোপসাগরের সীমাহারা নীল জলের বিস্তার। রক্তের চিহ্ন চলে গিয়েছে সমুদ্রের দিকে।

বিনোদলাল বললে, 'কুমার তুমি যে জীবটাকে আহত করেছ, নিশ্চই সেটা জানোয়ার নয়। এখানে রক্তের দাগের সঙ্গে যে পায়ের চিহ্ন-গুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো মানুষের পায়ের ছাপ না হয়ে যায় না।'

বিনোদলাল ভুল বলেনি। সত্যি, এগুলো মানুষের পায়ের দাগই বটে।

বিনোদের কথার কোন জবাব না দিয়ে পদচিহ্নের অনুসরণ করে আমি দৌড়তে আরম্ভ করলুম। খানিকটা অগ্রসর হবার পরেই হঠাৎ দেখতে পেলুম, একখানা নৌকো তট ছেড়ে সমুদ্রের ভেতর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে এবং সেখানা চালনা করছে একটিমাত্র মানুষ।

আচম্বিতে সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে এলো একটা বিশ্রী অট্টহাসি। তোমরা শুনলে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সেই অদ্ভুত অট্টহাসির মধ্যে আমি পেলুম যেন একসঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বর এবং ব্যাঘ্রের হুঙ্কার!

খালি চোখে নৌকাবাহী মূর্তিটাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। আমার সঙ্গে ছিল দূরবীন, তাড়াতাড়ি সেটা বার করে চোখের সামনে ধরলুম।

যা দেখলুম তা কেবল আশ্চর্য নয়, উদ্ভটও বটে! নৌকোর ভেতরে বসে আছে একটা সম্পূর্ণ নগ্ন মনুষ্য-মূর্তি। কিন্তু তার গায়ের রঙ অনেকটা চিতাবাঘের মতো! হলদের উপর গোল গোল কাল ছাপ। কোনো কথা না বলে দূরবীনটা বিনোদলালের হাতে দিলুম! সেও মূর্তিটাকে দেখে প্রথমটা চমকে উঠল, তারপর দূরবীন নামিয়ে আমার দিকে ফিরে বললে, 'কুমার, আমার কি সন্দেহ হচ্ছে জানো? ও লোকটা বোধহয় নিজের দেহের ওপরে তুলি বুলিয়ে চিতাবাঘের রঙ ফলিয়েছে!'

—'কিন্তু কেন?'

—'কেন আর, ও লোকটা বোধহয় ছদ্মবেশে এখানকার সকলকে ভয় দেখাতে চায়!'

—'তাহলে তুমি ওকে মানুষ বলে মনে কর?'

—'নিশ্চয়ই! রঙ ছাড়া ওর দেহের সমস্তটাই প্রমাণ দিচ্ছে যে ও হচ্ছে মানুষ! আর মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবকে কখনও তুমি কি নৌকো চালাতে দেখেছো?'

—'কিন্তু তুমি কি এ-কথাও কখনও শুনেছ যে, মানুষ কখনও নরখাদক বাঘের মতো কাঁচা মাংস খাবার জন্যে গো-হত্যা আর নর-হত্যা করেছে? ও মূর্তিটা আবার ইংরেজি ভাষায় কথা কয়। অথচ ও যে-ভাবে অট্টহাসি হাসলে, তার ভেতরেও পাওয়া গেল হিংস্র বাঘের গর্জন! কোন মানুষ ও-রকম গর্জন করতে পারে এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আসলে কথা কি জানো বিনোদলাল? এ এক অদ্ভুত প্রহেলিকা! নইলে স্বচক্ষে যা দেখছি, স্বকর্ণে যা শুনছি, তাও সত্য বলে ভাবতে পারছি না কেন?'

বিমল, এই হচ্ছে আমার কাহিনী। এইসঙ্গে এটুকু আমি বলে রাখি, এই ঘটনার পরে আরও দুদিন আমি চট্টগ্রামে ছিলুম। কিন্তু ও-অঞ্চলে আর কোন নৈশ উপদ্রবের কথা আমরা শুনতে পাইনি।

তিন

কুমারের কাহিনী শেষ হবার পর সকলে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বিমলের কপালের চর্ম কুঞ্চিত হয়ে উঠল, তার মুখে ফুটল গভীর চিন্তার লক্ষণ।

সর্বপ্রথমে কথা কইলে জয়ন্ত। সে ধীরে ধীরে বললে, "নেকড়ে বাঘ আর ভাল্লুকেরা যে মাঝে মাঝে মানুষের শিশু ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা না করে পালন করে, এর কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য নজির আছে। কুমারবাবু যে কাহিনী শোনালেন, তাও কি সেইরকম কোন ব্যাপার হতে পারে না? হয়তো কোন মানুষ শিশু-বয়স থেকে চিতাবাঘিনীর বাসায় পালিত হয়েছিল! তাই সেও পেয়েছে বাঘের স্বভাব, জীব-জন্তুর কাঁচা মাংস না হলে তার চলে না।"

বিমল বললে, "চিতা আর ভাল্লুকের বাসায় পালিত মানুষের কাহিনী যে সত্যি, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ঐ শ্রেণীর মানুষের স্বভাব জন্তুর মতো হয় বটে, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি কথা জানা গিয়েছে। প্রথমত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, তারা পনেরো-বিশ বছরের বেশি বাঁচে না। অনেকে তারও আগে মারা যায়। দ্বিতীয়ত জঙ্গল থেকে মানুষের আশ্রয়ে এসেও তারা মানুষের ভাষায় দু'চারটের বেশি কথা কইতে শেখে না; তৃতীয়ত, নেকড়ে বা ভাল্লুকের দ্বারা পালিত মানুষের গায়ের রঙ নেকড়ে বা ভাল্লুকের মতো হয় না; কিন্তু কুমারের কাহিনীতে আমরা যে মানুষটির কথা শুনলুম, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আহত হলে সে পরিষ্কার ইংরেজী ভাষায় আর্তনাদ করে। এই ভাষা সে কোথায় কার কাছে শিখলে? ভারতবর্ষের কোথাও চিতা-বাঘের দ্বারা পালিত মানুষ সাহেবের আশ্রয়ে এসে ইংরেজী ভাষা

শিখলে, সে কথা আজ দেশে দেশে বিখ্যাত হয়ে উঠত। কিন্তু এমন কোন চিতা-মানুষের কাহিনী কোন দিনই আমাদের কানে ওঠে নি।

তারপর কুমার বলছে, তার গায়ের রঙ নাকি চিতা-বাঘের মতো। চিতার বাসায় পালিত হলেও সে হচ্ছে মানুষ। সুতরাং প্রকৃতি বন্য হলেও তার গায়ের রঙ কখনও চিতার মতো হতে পারে না। তার ওপরে সে নাকি শিকার করে মানুষ ও জন্তুর কাঁচা মাংস খায়। জন্তুর দ্বারা পালিত যে মনুষ্য-শিশু লোকালয়ে ফিরে এসেছে' তাদেরও এরকম স্বভাবের কথা শোনা যায় নি। যদি তর্কের অনুরোধে ধরে নেওয়া যায় যে, এই চিতা-মানুষটা বরাবর বনে থেকে নরখাদক বাঘের মতই হিংস্র হয়ে উঠেছে, তাহলেও এখানে প্রশ্ন উঠবে, তবে সে ইংরেজী ভাষা শিখলে কার কাছ থেকে? আর লোকালয়ে না এসেও সে নৌকো চালনা করবার ক্ষমতা অর্জন করলে কেমন করে?—না জয়ন্তবাবু, এই ঘটনার ভেতরে আছে গভীরতর রহস্য!"

মানিক বললে, "কিন্তু সে রহস্যের চাবিকাঠি যখন আমাদের কাছে নেই, তখন ওকথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আপাতত কোনই লাভ হবে না। তার চেয়ে এখন উচিত হচ্ছে, কুমারবাবুর প্রসাদে যে বন্য রামপক্ষীগুলি আত্মদান করবার জন্যে আমাদের দ্বারস্থ হয়েছে, সকলে মিলে তাদের পরিদর্শন করে আসা।"

কুমার উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে, "বেশ তো, চলুন না। আসুন জয়ন্তবাবু, এসো বিমল।"

বিমল বললে, "আপাতত মুরগি দেখবার ইচ্ছে আমার নেই। তোমরা যাও।"

জয়ন্ত ও মানিককে নিয়ে কুমার ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল। মিনিট পনেরো পরে তারা যখন আবার ফিরে এল তখন দেখলে, বিমল একখানা বই হাতে নিয়ে চুপ করে বসে আছে।

মানিক সুধোলো, "ওখানা কি বই, বিমল?"

বিমল বললে, "এখানি এইচ. জি. ওয়েলসের বই। তুমিও পড়েছো,

এর নাম হচ্ছে The Island of Dr. Moreau, মনে আছে, এই বইখানা নিয়ে আমরা দুজনে মিলেই অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছিলুম ?”

কুমারের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। অল্পক্ষণ নীরব থেকে সে বললে, “বিমল! তুমি কি বলতে চাও ? না না, তা হচ্ছে অসম্ভব!”

বিমল মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, “কি অসম্ভব, কুমার ?”

—“ডাক্তার মোরের দ্বীপের সঙ্গে নিশ্চয়ই চাটগাঁয়ের ওই আশ্চর্য মানুষটার কোন সম্পর্ক নেই।”

—“কেন ?”

—“প্রশান্ত মহাসাগরে দক্ষিণ-আমেরিকার পাশে কোথায় সেই ডাক্তার মোরের আজব দ্বীপ, আর কোথায় এই ভারতবর্ষের চট্টগ্রাম। ও দ্বীপের কোন জীব কেমন করে এখানে এসে হাজির হবে ? এটা কি অসম্ভব নয় ?”

—“কুমার, তোমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমিও তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ওখান থেকে কোন জীবের ভারতবর্ষে আসাটা কি ডাক্তার মোরের দ্বীপের চেয়েও বেশি অসম্ভব ?”

—“তুমি কি বলতে চাও, বিমল ?”

বিমল বললে, “ভূ-পর্যটক ফিলিপ সাহেবের কথা তোমার মনে আছে।”

কুমার বললে, “ফিলিপ ? যার সঙ্গে আমরা দক্ষিণ-আমেরিকার ইকুয়াডর রাজ্যে সূর্যনগরীর গুপ্তধন দেখতে গিয়েছিলুম ? নিশ্চয়ই। তাঁর কথা কি এত শিগগিরই ভুলতে পারি ?”

বিমল বললে, “হ্যাঁ, আমি সেই ফিলিপ সাহেবের কথাই বলছি। এটাও তুমি ভোলোনি বোধহয়, মিস্টার ফিলিপ তাঁর ভূ-পর্যটনের গল্প বলতে বলতে কত দেশের বিচিত্র সব রহস্যের কথা শুনিয়েছিলেন! তাঁরই মুখে ডাক্তার মোরের দ্বীপের কথা আমি প্রথম শুনি। প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক যেখানে সেই দ্বীপটি আছে, মিঃ ফিলিপ একখানা নকশা এঁকে তাও আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা যদি একখানা জাহাজ ভাড়া করে সমুদ্রপথে বেরিয়ে পড়ি, তাহলে সেই নকশা অনুসারে

অনায়াসেই মোরের দ্বীপে গিয়ে হাজির হতে পারব।"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু বিমলবাবু, কুমারবাবুর মুখে যে অদ্ভুত মানুষটার গল্প শুনে আপনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন, আমিও সেই মানুষটার সঙ্গে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের কোন অদ্ভুত দ্বীপের কিছুমাত্র সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারছি না! আমারও প্রশ্ন হচ্ছে, একখানা ছোটো বোটে চড়ে অত দূর থেকে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে কেউ কি ভারতবর্ষে এসে উঠতে পারে!"

বিমল ধীরে ধীরে বললে, "জয়ন্তবাবু, মাঝে মাঝে আপনি কি খবরের কাগজে পড়েন নি যে, ছোট ছোট তুচ্ছ নৌকোয় চড়ে একাধিক সাহেব সমুদ্রপথে পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন? মাঝে মাঝে এ কথাও শোনা যায়, চীনা ও জাপানীরা ওই রকম ছোটো নৌকোয় চেপে অতবড় প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে আমেরিকা পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে! কিন্তু এখানে ওই নৌকোর কথা না তুললেও চলে। কারণ, কুমারের দেখা ওই অদ্ভুত জীবটা যে নৌকোয় চড়েই ভারতবর্ষে এসে পড়েছে, তারও কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। হয়তো সে অন্য কোনও উপায়ে এখানে এসে হাজির হয়েছে, তারপর যেভাবেই হোক, একখানা নৌকো সংগ্রহ করেছে। সেই উপায়টা যে কি, তা নিয়ে আপাতত আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আর ওই জীবটা যে মোরোর দ্বীপেরই বাসিন্দা, তাও আমি জোর করে বলতে চাই না; কিন্তু কুমারের মুখে দ্বীপটার বর্ণনা শুনে আমার মনে প্রথমেই অনেক দিন পরে জেগে উঠেছে ডাক্তার মোরোর দ্বীপের কাহিনী। বহুকাল থেকেই আমার বাসনা ছিল আমরাও একবার ওই দ্বীপে গিয়ে দেখে আসব ভূ-পর্যটক ফিলিপ সাহেবের আর এইচ. জি. ওয়েল্‌সের কথা সত্যি কিনা! যদি আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হতে পারি, তাহলে চট্টগ্রামের এই আজব জীবটার সঙ্গে কেন যে আমি ওই দ্বীপটার সম্পর্ক নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছি সেকথা আপনাদের কাছে খুলে বলব।"

মানিক বললে, "বিমলবাবু, ডাক্তার মোরোর দ্বীপের রহস্য আমরা

কোনদিনই শুনি নি। আপনি দুচার কথায় খুলে বলবেন কি?"

এইচ. জি. ওয়েল্‌সের বইখানা এগিয়ে দিয়ে বিমল বললে, "আমার মুখে কিছুই শোনবার দরকার নেই। এই বইখানা নিয়ে যান, এর পাতাগুলোর উপরে চোখ বুলোলেই সব কথা জানতে পারবেন; কিন্তু তার আগে বলুন দেখি, আমি আর কুমার যদি সেই দ্বীপের দিকে যাত্রা করি, তাহলে এই অ্যাডভেঞ্চারে আপনারাও কি যোগ দিতে রাজি হবেন?"

জয়ন্ত ও মানিক সমস্বরে বলে উঠল, "নিশ্চয়ই।"

কুমার বললে, বিমলের অনুমান, ফিলিপ সাহেবের গল্প আর এইচ. জি. ওয়েল্‌সের রচনা সত্য না হলেও আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হব না; জীবনে বড়ই ঘটনার অভাব হয়েছে, কলকাতা শহরকে মনে হচ্ছে ছোট খাঁচার মতো, এখানে আর বেশি দিন আবদ্ধ হয়ে থাকলে বেতো রুগীর মতো শয্যাগত হয়ে পড়ব। অন্য কোন ঘটনা ঘটুক বা নাই ঘটুক, অন্তত বঙ্গোপসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ছুটোছুটি করে আসা যাবে তো? আমার পক্ষে তাও হবে একটা বিপুল মুক্তির মতো!"

বিমল বললে, "কিন্তু সাবধান, রামহরি যেন আপাতত ঘুণাক্ষরেও মোরোর দ্বীপের কথা জানতে না পারে। তাহলে সে এখান থেকে কিছুতেই নড়তে রাজী হবে না। আমাদের রন্ধনশালার হর্তাকর্তা সে, তাকে সঙ্গে না রাখলে কি চলে? কি বল, কুমার!"

কুমার বললে, "সে কথা আর বলতে? যখনই একলা বিদেশে গিয়েছি, রামহরির শ্রীহস্তের রান্না খেতে না পেয়ে রীতিমত রোগা হয়ে পড়েছি!"

বিমল হঠাৎ চাপা গলায় বললে, "সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনেই বুঝছি ঘরের ভেতরে এখনি সুন্দরবাবুর আবির্ভাব হবে। দলে ভারী হবার জন্যে তাঁকেও ভুলিয়ে-ভালিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই, তাঁকেও আসল রহস্যের কথা বলবার দরকার নেই।"

ব্যস্তভাবে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন সুন্দরবাবু। কুমারের দিকে তাকিয়ে উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "হুম! এই যে কুমারবাবু, আমার বন-মুরগিদের খবর কি?' নিশ্চয়ই তাদের চাটগাঁয়ে ফেলে আসেন নি?"

কুমার হাসতে হাসতে বললে, "না, আপাতত তারা বাস করছে এই বাড়িতেই।"

পেটের ওপরে ডান হাত বুলোতে বুলোতে এক গাল হেসে সুন্দরবাবু বললেন, "চমৎকার! চমৎকার!"

চার

সিন্ধুর মুখে বিন্দুর মতো অনেক দূরে দেখা গেল ছোট্ট একটি দ্বীপ। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ থেকে আমরা জাহাজে উঠেছি, এবং জাহাজ এখন এসে পড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের ভেতরে এবং এখন যেখান দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তার একদিকে আছে ওই ছোট্ট দ্বীপটি, আর একদিকে আছে দক্ষিণ আমেরিকার তটভূমি। এখানটা সাধারণ জাহাজ চলাচলের পথ নয়, আর সেই কারণেই ভাড়া করে একখানি নিজস্ব জাহাজ নিয়ে আমাদের এখানে আসতে হয়েছে।

ভূ-পর্যটক ফিলিপ সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া 'চার্টের' উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তারপর আবার দ্বীপের দিকে দৃষ্টিপাত করে বিমল উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, "ওইটেই যে ডাঃ মোরোর দ্বীপ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই! ওই ছোট্ট জায়গাটুকুর ভেতরে কোন বৃহৎ রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে, দূর থেকে দ্বীপটিকে দেখলে মোটেই সে সন্দেহ হয় না।"

হঠাৎ পেছন থেকে সুন্দরবাবুর কণ্ঠে শোনা গেল, "হুম্! আপনার এ কথার অর্থ কি বিমলবাবু!"

বিমল তাড়াতাড়ি চার্টখানা মুড়ে ফেলে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "এই যে সুন্দরবাবু! আপনি যে কখন চুপি চুপি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমরা কিছুই টের পাই নি!"

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ, টের পাননি বলেই তো পেছন থেকে আমি আপনাদের সব কথা শুনতে পেয়েছি!"

—"কি, শুনেছেন সুন্দরবাবু?"

—"আরে, শুধু কি শুনেছি, আসল ব্যাপারটা বুঝতেও পেরেছি।"

—"কি বুঝেছেন সুন্দরবাবু?"

—"সাগর-ভ্রমণে বেরুবেন, স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, এমনি সব আরও নানা লোভ দেখিয়ে আপনারা আমাকে কলকাতা থেকে এখানে টেনে এনেছেন। তারপর অকুল পাথারে ভেসে রোজ আপনাদের হাবভাব ব্যবহার দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, আপনাদের এই সাগরযাত্রার পেছনে কোন গভীর রহস্য আছে। মাঝে মাঝে সেই সন্দেহ আপনাদের কাছে প্রকাশও করেছিলুম; কিন্তু আমার কথা আপনারা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। মশাই, গোয়েন্দাগিরি করে আমি চুল পাকিয়ে ফেললুম, আমার সন্দেহকে আপনারা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে পারবেন কেন? তবে ফাঁদে যখন পা দিয়েছি, ফলভোগ করতেই হবে, কাজেই মুখে কিছু আর বলিনি; কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি, কলকাতা থেকেই আপনাদের লক্ষ্য ছিলে ওই অজানা দ্বীপটার উপরে।"

মানিক মুখে কপট ভয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে বললে, "বলেন কি সুন্দরবাবু! কোথায় কলকাতা আর কোথায় এই ছোট্ট দ্বীপটা! মাঝখানে আছে প্রায় সাড়ে এগারো হাজার মাইল ব্যাপী জলপথ। আমাদের লক্ষ্য করবার শক্তি কি এতই অসাধারণ যে কলকাতায় বসেই এই দ্বীপটা চোখে দেখতে পেয়েছি? না সুন্দরবাবু, না, আপনার এই অত্যুক্তির অত্যাচার আমরা সহ্য করতে রাজী নই!"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, তোমার ঠাট্টা থামাও মানিক! অসময়ে ঠাট্টা ভালো লাগে না। আমার বিরুদ্ধে একটা মস্ত ষড়যন্ত্র হয়েছে! নইলে তোমরা যে এই বিশেষ দ্বীপটাতেই আসতে চাও, একথা আগে আমাকে বলনি কেন?"

—"বললে কি করতেন?"

—"করতুম আর কি, তোমাদের সঙ্গে আসতুম না।"

—"কেন আসতেন না?"

—"হুম্! এর আগে, বোকার মতো তোমাদের পাল্লায় পড়ে যত বারই দেশের বাইরে এসেছি, তত বারই পড়েছি সাংঘাতিক সব বিপদে। তবু বেশির ভাগ বিপদের ধাক্কা কোনরকমে সামলাতে পেরেছি ভারত-বর্ষের মাটিতেই ছিলুম বলে। কিন্তু এবার তোমাদের সঙ্গে এসে পড়েছি এমন এক জায়গায় যেখানে মা-বাপ বলতে কেউ থাকবে না। চারদিকে কেবল থইথই করছে জল, তার মাঝখানে একরত্তি একটা সরষের মতো রয়েছে ওই বাজে দ্বীপটা! হায় রে, আর কি আমি দেশে ফিরতে পারব ?"

কুমার সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বললে, "সুন্দরবাবু, একটা ছোট্ট দ্বীপ দেখে এতটা ভড়কে যাচ্ছেন কেন ?"

সুন্দরবাবু আরও রেগে উঠে বললেন, "ভড়কে যাব না কি-রকম ? বলেন কি মশাই ? আপনাদের আমি কি চিনি না ? আমি কি জানি না পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যেখানে অপেক্ষা করে আছে মারাত্মক সব আপদ-বিপদ, একটু খবর পেলেই সেই সব জায়গায় আপনারা ছুটে যান বদ্ধ পাগলের মতো! আপনারা যে ওই বিশেষ দ্বীপটাতে সুমুদ্দুরের হাওয়া ভক্ষণ করতে আসেন নি, এটুকু বুঝতে পারব না এমন কচি খোকা আমি নই। আপনাদের ধাপ্পায় ভোলবার কথা আমার নয়; কিন্তু কি জানেন কুমারবাবু, মুনিরও মতিভ্রম হয়, আমারও মতিভ্রম হয়ে-ছিল। নইলে কি আপনাদের সঙ্গে আবার দেশের বাইরে পা বাড়াতুম? কখনও না!"

এমন সময় রামহরি সেখানে দাঁড়াল। সকলকার মুখের দিকে এক-বার তাকিয়ে নিয়ে বললে, "কী হয়েছে সুন্দরবাবু, আপনি এত খাপ্পা হয়ে উঠেছেন কেন ?"

সুন্দরবাবু, বললেন, "খাপ্পা না হয়ে উপায় কি রামহরি ? এই বাবুগুলি ধাপ্পা দিয়ে আমাদের দুজনকে এখানে কেন টেনে এনেছেন জানো ?"

—"কেন সুন্দরবাবু ?"

—"আমরা জবাই হব বলে।"

রামহরি তুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

সুন্দরবাবু বললেন, "এরা সাত সুমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে এত দূর এসেছে কেন জানো ? ওই একফোঁটা দ্বীপে গিয়ে নামবে বলে।"

রামহরি ফিরে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে বললে, "বাবুরা ওই দ্বীপে গিয়ে নামবে নাকি ? ওটা কী দ্বীপ ?"

—"ভগবান জানেন ! দ্বীপটার যা চেহারা দেখছি, পৃথিবীর কোন মানুষই বোধহয় ওর নাম কখনো শোনে নি !"

—"ওই দ্বীপে কি আছে ?"

—"ওখানে নিশ্চয়ই আছে মূর্তিমান বিভীষিকার দল। তা নইলে এমন ডাহা ডানপিটে ছোকরার দল এতদূর কখনো ছুটে আসে ? দ্বীপটাকে দেখেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ! ঘাড়ে ভূত না চাপলে অমন দ্বীপে কেউ বেড়াতে আসে না।"

রামহরি সায় দিয়ে বললে, "তা যা বলেছেন ! এই বাবুগুলির প্রত্যেকেরই ঘাড়ে চেপে আছে একটা করে ভূত !"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু আমাদের ঘাড়ে তো ভূত নেই, আমরা কেন এদের সঙ্গে বেঘোরে ছুটোছুটি করে মরি !"

রামহরি দার্শনিকের মতো গম্ভীর ভাবে বললে, "সঙ্গ-দোষে সব হয় সুন্দরবাবু, সঙ্গদোষে সব হয়।"

সুন্দরবাবু অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "দেখ রামহরি, এসে যখন পড়েইছি তখন উপায় নেই। কিন্তু আমার একটা কথা সর্বদাই মনে রেখো। জেনো, এই দলে মানুষের মতো মানুষ বলতে আছি কেবল আমরা দুজন। আমরা ওদের দলে কোন দিনই যোগ দেব না। ভবিষ্যতে আমরা যা করব, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেই করব, ওদের কারুর পরামর্শ আমরা শুনব না। চল, চুপি চুপি তোমাকে গোটাকয়েক কথা বলতে চাই।"

বিমলের দিকে একবার উত্তপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রামহরির হাত ধরে

প্রস্থান করলেন সুন্দরবাবু।

জাহাজ তখন দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়েছে। এখান থেকে দ্বীপের সবটা দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু তার আয়তন সাত-আট বর্গমাইলের বেশি হবে না। এ অঞ্চলে অধিকাংশ দ্বীপেরই উৎপত্তি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে। এই দ্বীপটির উৎপত্তির মূলেও সেই কারণই অনুমান করা যায়।

দ্বীপের একদিকে রয়েছে নতোন্নত মুক্তভূমি, বাকী সবখানেই দেখা যাচ্ছে ঘন সবুজ রঙের ছবি, লতা-গুল্ম-পাতায় ঢাকা গাছের পর গাছের দল। সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে তালজাতীয় একরকম গাছ। একদিকে সমুদ্রের নীল জলের ওপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে খুব উঁচু ও সুদীর্ঘ কালো পাথুরে পাড়। তার ওপরে একটানা চলে গিয়েছে বড় বড় ঝোপের পর ঝোপ। সেখানকার নিবিড় শ্যামলতার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল প্রভাত-সূর্যের সোনালী জলের ঢেউ।

বিমলের দৃষ্টি হঠাৎ চমকে উঠল। এক দিকে আঙুল নির্দেশ করে সে বললে, "দেখুন জয়ন্তবাবু দেখুন!"

সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, ঝোপগুলোর তলায় সরাসরি বসে কতকগুলো নিশ্চল পাথরের মূর্তি! কিন্তু সেগুলো যে জীবন্ত মূর্তি, তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে। স্পষ্ট করে দেখা না গেলেও তাদের মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রত্যেক মূর্তির গায়ের ওপরই দেখা যাচ্ছে নানান-রকম রঙের খেলা—হলদে, কালো, সাদা ও লালচে প্রভৃতি।

কুমার বললে, "বিমল, ওরা যদি মানুষ হয় তাহলে ওদের গায়ের রঙ ওরকম কেন? ওরা কি গায়ের সঙ্গে মিলানো কোন রঙীন পোশাক পরে আছে?"

বিমল বললে, "কিছুই তো বলতে পারছি না। ডাঃ মোরোর দ্বীপে যে ওরকম রঙীন পোশাক-পরা মানুষ আছে, এ খবর তো আমিও পাইনি।"

জাহাজের সাইরেন হঠাৎ তীব্র স্বরে বেজে উঠে আকাশ-বাতাস চারদিক যেন বিদীর্ণ করে দিলে! সঙ্গে সঙ্গে ঝোপগুলোর সুমুখ থেকে

প্রত্যেক মূর্তিই এক এক লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল!

জয়ন্ত বললে, "ওগুলো নিশ্চয়ই মানুষের মূর্তি নয়।"

বিমল বললে, "কেন?"

—"মানুষ কখনও বসে বসেই অত উঁচু লাফ মেরে ঝোপের ভেতরে গিয়ে পড়তে পারে?"

বিমল কোন উত্তর দিলে না। কিন্তু সুন্দরবাবুর টনক নড়ল। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে তিনি মত প্রকাশ করলেন, "ওগুলো মানুষ, নয়, হুম্!"

মানিক বললে, "আপনি কি বলতে চান সুন্দরবাবু?"

দুই ভুরু সংকুচিত করে সুন্দরবাবু বললেন, "আমার কথার অর্থ হচ্ছে, তুমি একটি পাজীর পা-ঝাড়া!...রামহরি! অ রামহরি! শুনেছ? যা ভেবেছি তাই, আমরা এসেছি একটা ভূতুড়ে দ্বীপে!

জাহাজ আর অগ্রসর হতে পারলে না। সেইখানেই নোঙর ফেললে। বিমলের আদেশে খালাসীরা দ্বীপে যাবার জন্যে বোট নামাবার আয়োজনে নিযুক্ত হল।

রামহরির কানে কানে সুন্দরবাবু বললেন, "আমাদের দুজনের কি উচিত জানো রামহরি? ওই দ্বীপে না উঠে এই জাহাজের ভেতরেই বাস করা।"

রামহরি মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "তা, হয় না বাবুমশাই! খোকাবাবু যমালয়ে যেতে চাইলে আমাকেও তার সঙ্গে সঙ্গেই যেতে হবে।"

সুন্দরবাবু এমন একটা মুখভঙ্গী করলেন যার দ্বারা বোঝা গেল, রামহরির উত্তর শুনে তিনি মোটেই প্রীত হন নি।

পাঁচ

একদিকে অরণ্য ও ছোট ছোট পাহাড়ের শিখর, একদিকে একটি ছোট্ট নদী এবং আর দুই দিকে পনেরো-ষোল হাত প্রবাল-প্রাচীর, তারই মাঝখানে ফেলা হয়েছে কয়েকটা তাঁবু।

জয়ন্ত বললে, "বিমলবাবু আপনি চমৎকার স্থান নির্বাচন করেছেন। ওই দুদিকে প্রবাল-প্রাচীর আছে বলে শত্রু আসবার ভয় নেই। কেবল ওই বন আর নদীর দিকে সাবধানী দৃষ্টি রাখলেই আমরা নিরাপদে থাকতে পারব।"

হঠাৎ সুন্দরবাবু একটা সুউচ্চ লম্ফ ত্যাগ করে বলে উঠলেন, "বাপ রে, ভূমিকম্প হচ্ছে!"

বিমল সহজ স্বরেই বললে, "ভয় নেই সুন্দরবাবু, ভয় নেই। এখানে পায়ের তলায় মাঝে মাঝে মাটি এমনি কাঁপবে!"

সুন্দরবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, "বটে! এখানকার মাটির এমন বেয়াড়া স্বভাবের কারণটা কি শুনি?"

—"এটা সাধারণ দ্বীপ নয়, এখানে সমুদ্রের তলায় যে আগ্নেয়-পর্বত আছে, এই দ্বীপটিকে তারই চূড়া বলে বর্ণনা করা যায়। আমি আর কুমার দ্বীপের খানিকটা পরিদর্শন করে এসেছি। চারিদিকেই দেখেছি পাথরের গায়ে রয়েছে গর্তের পর গর্ত। সেই সব গর্ত আর কিছুই নয়, আগ্নেয়-পর্বতের ধোঁয়া বেরুবার পথ। ওই দেখুন, খানিক দূরে একটা ধোঁয়ার রেখা দেখতে পাচ্ছেন? ওখানেও গর্তের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগ্নেয়-পর্বতেরই ধোঁয়া।"

সুন্দরবাবু সভয়ে বললেন, "বিমলবাবু, আপনি যে আমার আক্কেল গুড়ুম করে দিলেন! পায়ের তলায় ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরি নিয়ে মানুষ কখনও বাস করতে পারে? কোনদিন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে

আগুন, আর আমাদের দেহের বদলে এখানে পড়ে থাকবে খালি মুঠো-কয়েক ছাই।"

বিমল বললে, "অতটা দুর্ভাবনার দরকার নেই। এইচ. জি. ওয়েলস্ সাহেবের গল্পের নায়ক এই দ্বীপে এসেছিল ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে। তারও দশ-পনেরো বছর আগে যে এই দ্বীপটার অস্তিত্ব ছিল এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। এত দিনের মধ্যেও আগ্নেয়গিরি যখন উৎপাত করে নি তখন আরও গোটাকয়েক দিন আমরা বোধহয় নিরাপদেই কাটিয়ে দিতে পারব।"

বিমলদের সঙ্গে এসেছিল বারো জন গুর্খা। তারা সকলেই আগে ফৌজে কাজ করত। বিমল তাদের ডেকে হুকুম দিলে যে, যে দুদিকে প্রবাল-প্রাচীর নেই সেইখানে সর্বদাই বন্দুক নিয়ে পাহারা দিতে। তারপর ফিরে বললে, "আমাদের সবাইকে এখানে সর্বদাই সশস্ত্র হয়ে থাকতে হবে। কারণ, কোন দিক দিয়ে কখন শত্রুর আবির্ভাব হবে, কিছুই বলা যায় না। কুমার, আমাদের মেসিন-গান দুটো তুমি বাইরে এনে বসিয়ে রাখো।"

এইসব আয়োজন দেখে সুন্দরবাবুর উদ্বেগ ও অশান্তি ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু বিমল, কুমার, মানিক ও জয়ন্তর কাছ থেকে তিনি কোন সান্ত্বনাই খুঁজে পেলেন না। তাদের কাছে গেলেই তিনি পান শুধু ভীষণ সব সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

শেষটা রীতিমত মুষড়ে পড়ে তিনি ঢুকলেন গিয়ে রামহরির তাঁবুর ভেতরে। রামহরি রান্নায় ব্যস্ত ছিল। তার রন্ধনের বিচিত্র আয়োজন দেখে সুন্দরবাবুর অশান্ত মনটা অনেকটা প্রশান্ত হয়ে উঠল। আর একটি প্রাণীও সেই তাঁবু-রান্নাঘরের আশেপাশে উঁকিঝুঁকি মারছিল। সে হচ্ছে বাঘা। তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেছে মাংসের সুগন্ধ!

সেই রাত্রে।

চন্দ্রহীন অন্ধকার রাত যেন কান পেতে শ্রবণ করছে বিশাল সাগরের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-কোলাহল!

আচম্বিতে মানুষের আর্তনাদের পর আর্তনাদে চারিদিক হয়ে উঠল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত! সঙ্গে সঙ্গে বার বার শোনা গেল রিভলবারের শব্দ! তারপরেই জাগলো কুকুরের ক্রুদ্ধ চিৎকার!

বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মানিক সকলেই ব্যস্তভাবে তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

কুমার উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললে, "এ যে সুন্দরবাবুর গলা! বাঘাও চ্যাঁচাচ্ছে। সুন্দরবাবু ক্রমাগত রিভলবার ছুঁড়ছেন! ব্যাপার কি?"

সকলে দ্রুতপদে সুন্দরবাবুর তাঁবুর ভেতরে ঢুকে টর্চের আলো ফেলে দেখলে, তাঁবুর এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছেন সুন্দরবাবু। তাঁর মুখ-চোখ আতঙ্কগ্রস্ত।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে সুন্দরবাবু, আপনার এমন অবস্থা কেন?"

প্রথমটা সুন্দরবাবু কোন কথাই উচ্চারণ করতে পারলেন না। তারপর কেবলমাত্র বললেন, "হুনুমান-বিছে!"

—"হুনুমান-বিছে?"

—হ্যাঁ "হ্যাঁ, হুনুমান-বিছেই বল আর বিছে-হুনুমানই বল, আমি দেখেছি একটা অসম্ভব জীবকে।"

মানিক বললে, "জয়ন্ত, ভয়ে সুন্দরবাবুর মাথার কল বিগড়ে গেছে, যা বলছেন তার মানেই হয় না।"

ভয়ার্ত সুন্দরবাবু এইবারে হলেন রীতিমত ক্রুদ্ধ। চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ হে বাপু, আমার তো মাথার কল বিগড়ে গেছে, কিন্তু এখানে আজ থাকলে তোমার দেহের ওপরে মাথাটাই বজায় থাকত কিনা সন্দেহ! আমি যা দেখেছি, কেউ কোন দিন দুঃস্বপ্নেও তা দেখে নি। বাস রে বাস, আমার বুকটা এখনও শিউরে শিউরে উঠছে। ভাগ্যে রিভলবারটা ছিল, নইলে আজ কী যে হত কিছুই বলা যায় না।"

বিমল বললে, "শান্ত হন সুন্দরবাবু। ভালো করে বুঝিয়ে বলুন আপনি কি দেখেছেন।"

সুন্দরবাবু ধপাস করে বিছানার ওপরে বসে পড়ে আগে খুব খানিকক্ষণ হাঁপিয়ে নিলেন। তারপর কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, "সব কথাই বলবো বটে, কিন্তু সকলের কাছে আগেই একটি অনুরোধ করে রাখছি। আমি স্বচক্ষে সত্যই যা দেখেছি তা ছাড়া আর কিছুই বলব না। আমি ভুলও দেখিনি, অত্যুক্তিও করব না। কিন্তু আপনারা দয়া করে আমার কথায় বিশ্বাস করবেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর সকলকার সঙ্গে খানিক গল্প-গুজব করে নিজের তাঁবুতে এসে আমি তো শুয়ে পড়লুম। খানিক পরেই ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে এল চোখের পাতা। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না, কিন্তু হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠেই মনে হল তাঁবুর ভেতরে আমি আর একলা নেই। প্রথমেই নাকে এল কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ। তারপরেই শুনলুম মাটির ওপরে খসখস করে শব্দ হচ্ছে।

আস্তে আস্তে বিছানার ওপরে উঠে বসলুম। ঘুমোবার সময় আলো নিবিয়ে দিইনি, তাঁবুর এক কোণে জ্বলছিলো হারিকেন লণ্ঠনটা। সেই আলোতে দেখলুম, বেশ একটা মোটা সাপের মত জীব আমার খাটের তলায় গিয়ে ঢুকছে, বাইরে বেরিয়ে আছে কেবল তার ল্যাজের দিকটা। ভালো করে দেখে বুঝলুম সেটা সাপ নয়, তার গায়ের রঙ তেঁতুলে বিছের মত, আর দেহের গড়নও প্রায় সেই রকমই।

লম্বায় তার দেহটা কতখানি তা বুঝতে পারলুম বটে, কিন্তু চওড়ায় তার দেহটা সাত-আট ইঞ্চির কম হবে না। এত বড় বিছের কথা জীবনে কোনদিন শুনি নি। এ যদি কামড়ায় তাহলে আমার অবস্থাটা হবে কি রকম, তা অনুমান করেই তাড়াতাড়ি বালিশের তলা থেকে রিভলবারটা বার করে নিলুম।

বিছেটা বোধহয় টের পেয়েছিল যে আমি জেগে উঠেছি। সাঁত করে তার দেহের সবটাই ঢুকে গেল খাটের তলায়। আমি মহা ফাঁপরে পড়ে বিছানায় উবু হয়ে বসে ভীষণ ভয়ে ঘেমে উঠতে লাগলুম।

তারপর অত্যন্ত আচমকা একটা ভয়ানক উদ্ভট জীব খাটের তলা

থেকে বাইরে এসে পড়ল। সেটাকে দেখে তো আমার চক্ষুস্থির!

বিমলবাবু, আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, প্রায় ছয় ফুট লম্বা ও সাত-আট ইঞ্চি চওড়া বৃশ্চিকের দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে একখানা মস্ত হনুমানের মুখ? কল্পনা তো করতে পারবেনই না, হয়তো আমার কথা বিশ্বাসও করবেন না; কিন্তু আমি কিছুমাত্র ভুল দেখিনি, বলেন তো ঈশ্বরের নামে শপথ করতে পারি।

গোখরো সাপেরা ফণা তুলে যেমন মাটির উপর থেকে খানিকটা উঁচু হয়ে উঠে, এই কিম্ভূতকিমাকার আশ্চর্য জীবটা ঠিক সেইভাবে উঁচু হয়ে আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সে গর্জন করে উঠতেই আমি রিভলবারের ঘোড়া টিপে দিলুম। পর-মুহূর্তেই জীবটা মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল আর তার ল্যাজের ঘা লেগে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা ভেঙে একেবারে নিভে গেল!

তাঁবুর ভেতর ঘোর অন্ধকার! হঠাৎ আমার খাটের ওপরে সশব্দে কি একটা এসে পড়ল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে খাট থেকে লাফিয়ে পড়ে উপর্যুপরি রিভলবার ছুঁড়তে লাগলুম। তারপর আপনাদের আবির্ভাব। এখন তো দেখছি সে আশ্চর্য জীবটা আর তাঁবুর ভেতরে নেই; কিন্তু বলুন আপনারা, যেটাকে এইমাত্র আমি দেখেছি, সেটা কি জীব হতে পারে? আপনারা হয়তো বলবেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে আমি জেগে উঠেছি। কিন্তু স্বপ্ন নয় মশাই, স্বপ্ন নয়। আমার রিভলবারের গুলি খেয়ে জীবটা আহত হয়েছিল। মাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন, এখনও তার রক্তের দাগ ওখানে রয়েছে!"

জয়ন্ত হেঁট হয়ে রক্তের দাগগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললে, "হ্যাঁ সুন্দরবাবু, আপনার কথায় আমি বিশ্বাস করছি। একটা কোন জীব যে আপনার রিভলবারের গুলিতে আহত হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই; কিন্তু আপনি যেরকম বললেন, জীবটাকে কি ঠিক সেই রকমই দেখতে?"

সুন্দরবাবু বললেন, "একেবারে অবিকল! এখনও আমার চোখের

সামনে তার মূর্তিটা যেন জ্বলজ্বল করছে! যতদিন বাঁচবো তার চেহারা কোনদিন ভুলবো না, হুম্!"

কুমার বললে, "জীবতত্ত্বে হনুমানের মতো মুখ আর বৃশ্চিকের মতো দেহধারী প্রাণীর কথা কোনদিন পাওয়া যায় নি। কোন জীবতত্ত্ববিদই এরকম উদ্ভট জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করবেন না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "জীবতত্ত্বের পণ্ডিতরা আমার কথা শুনে কি বলবেন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। আমার বিশ্বাস, আজ যাকে দেখেছি, জীব রাজ্যের কেউ সে নয়। বলেছি তো এটা হবে ভূতুড়ে দ্বীপ, ভূতেরা কত রকম দেহ ধারণ করতে পারে তা কি কেউ জানে?"

বিমল ধীরে ধীরে বললে, "ডাঃ মোরোর দ্বীপে যে এ-রকম জীব পাওয়া যায়, এইচ. জি. ওয়েলস তার উল্লেখ করেন নি; কিন্তু তাঁর কেতাবে এ সম্বন্ধে দু একটা ইঙ্গিত আছে বটে।"

জয়ন্ত বললে, "কি রকম ইঙ্গিত?"

—"পরে তা বলব। আপাতত আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, এই দ্বীপটা ভাল করে পরিদর্শন করা। এখানকার জঙ্গলের ভেতরে গেলে আর পাহাড়ের উপরে উঠলে নিশ্চয়ই বহু রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। কাল সকালেই আমরা এখানকার জঙ্গলের দিকে যাত্রা করব।"

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, "আমরা মানে? আমি কোনদিনই ওই জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে ভূতের হাতে প্রাণ খোয়াতে রাজী নই। এখানকার একটিমাত্র জীবের যে নমুনা দেখলুম আমার পক্ষে তা যথেষ্টরও বেশি। জঙ্গলের ভেতরে নানা রূপ ধারণ করে আরও যাঁরা বিরাজ করছেন, আমি দূর থেকেই তাঁদের পায়ে প্রণাম করছি।"

ছয়

সকাল বেলায় চায়ের আসরে বিমলের কাছে গিয়ে রামহরি মিনতি করে বললে, "খোকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি। ও জঙ্গলের ভেতরে তোমাদের আর গিয়ে কাজ নেই।"

বিমল মুখ টিপে হেসে বললে, "ছিঃ রামহরি, তুমি যত বুড়ো হচ্ছ, ততই ভীরু হয়ে উঠছ।"

রামহরি বললে, "হ্যাঁ খোকাবাবু, আমি ভয় পাচ্ছি বটে। কিন্তু তুমি কি জান না আমার ভয় হয় কেবল তোমার জন্যেই? ওই জঙ্গলটার লক্ষণ ভালো নয়। ওদিকে তাকালেই আমার বুক চমকে উঠে, মনে হয় যত রাজ্যের যত বিপদ ওখানে যেন ওত পেতে বসে আছে! তুমি কি লক্ষ্য কর নি খোকাবাবু, এখানে একটা পাখিরও গান শোনা যায় না?"

বিমল বললে, "এখানে চারদিকে কেবল জল আর জল! এই বিশাল সমুদ্র পার হয়ে কোন গানের পাখিই এত দূর উড়ে আসতে পারে না। কিন্তু ওই পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দেখ। ওখানে বসে রয়েছে কত সামুদ্রিক পাখি! ওরা গান গায় না বটে, কিন্তু চিৎকার করে যথেষ্ট!"

রামহরি বললে, "যে সব পাখি গান গাইতে পারে না, তারা হচ্ছে অলক্ষুণে। যেমন পেঁচা আর বাদুড়। তাদের দেখলেই মনে উঠে বিপদ-আপদের কথা। তা পাখি থাক আর নাই থাক, তুমি ওই জঙ্গলের ভেতরে যেও না।"

বিমল মাথা নেড়ে বললে, "তা হয় না রামহরি! আমরা যে রহস্যের খোঁজে এতদূর এসেছি, তাকে পাওয়া যাবে হয়তো ওই জঙ্গলের মধ্যেই। এ দ্বীপটা খুবই ছোট। ঘুরে আসতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না। সুন্দরবাবুকে নিয়ে তুমি এখানেই থাকো, ফিরে এসে তোমার হাতের রান্না খাবো। ছজন গুর্খা এখানে পাহারা রইল, বাকী ছজন যাবে

আমাদের সঙ্গে! কীরে বাঘা, তুইও এখানে থাকবি, না আমাদের সঙ্গে যাবি?"

কিন্তু বাঘা তাদের সঙ্গে যাবার জন্যেই প্রস্তুত। সে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বিমলের পায়ের কাছে ছুটে এসে বললে, "ঘেউ, ঘেউ!" তারপর বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মানিক যখন পথে বেরিয়ে পড়ল তখন বাঘা ছুটতে লাগল সকলের আগে আগেই।

ছোট্ট একটি নদী নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে, দুই তট কল-সংগীতে পূর্ণ করে। মাঝে মাঝে তার জলরেখা হারিয়ে গিয়েছে বড় বড় ঝোপের তলায়। তারপর আরম্ভ হল চড়াই, লতাপাতা ও তৃণগুল্মে অলংকৃত ভূমি ক্রমেই উঠে গিয়েছে উপর দিকে। এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট শৈলখণ্ড, এক জায়গায় রয়েছে উষ্ণ প্রস্রবণ, তার জল বেরিয়ে আসছে আগ্নেয়-পাহাড়ের তপ্ত বুকের ভেতর থেকে। চড়াই যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখা গেল, দ্বীপের অনেকটা অংশ চোখের সামনে পড়ে রয়েছে রিলিফ-ম্যাপের মতো।

নদী, পাহাড়, উপত্যকা, মাঠ ও অরণ্য এবং শ্যামলতার পরেই দেখা যাচ্ছে সীমাহীন মহাসাগরের নির্মল নীলিমা। এ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না, এখানে যে জীব-জন্তু বাস করে কোথাও এমন চিহ্নই নেই।

বিমল বললে, "সূর্যের আলোয় চারদিক ঝকঝক করছে বটে, কিন্তু সামনের ওই অরণ্যটাকে দেখে মনে হচ্ছে, সূর্যকরও ওর ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে, এই দ্বীপের বাসিন্দারা সূর্যকে ভয় করে। ওই অরণ্যের অন্ধকারের ভেতরে গেলে হয়তো আমরা তাদের আবিষ্কার করতে পারব। কিন্তু সাবধান, বন্দুককে প্রস্তুত রেখে আমাদের ওই বনের ভেতর গিয়ে ঢুকতে হবে।"

চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সকলে আবার অগ্রসর হল ধীরে ধীরে।

নিচের দিকে ছোট-বড় পাথর, ঝোপ-ঝাপ ও আগাছার জঙ্গল এবং মাথার উপরে লতার ঘন জালে বাঁধা মস্ত মস্ত গাছের শ্যামল পত্রছত্র।

বাতাসের হিল্লোলে শোনা যাচ্ছে অশ্রান্ত তরু-মর্মরের ভাষা। দেখতে দেখতে দিনের আলো যেন ঝিমিয়ে পড়ল! বনের ভেতরে চারদিকে নেমে এলো সন্ধ্যার আবছায়া। সেই আলো-আঁধারি মাখা অরণ্যের অন্তঃপুর তখন হয়ে উঠল রীতিমত রহস্যময়।

তারা বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু এ হচ্ছে পার্বত্য প্রদেশের অরণ্য। এখানে বনের এক-একটা অংশ হঠাৎ নেমে গিয়েছে নিচের দিকে। সেই রকম একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বিমল সচমকে বলে উঠল, "চুপ!"

নিচের দিক থেকে শোনা যাচ্ছে কাদের কণ্ঠস্বর! সেগুলো যে মানুষের কণ্ঠস্বর তাতেও সন্দেহ নেই, কিন্তু পৃথিবীর সাধারণ মানুষ সে-রকম স্বরে কথা কয় না। তারও চেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে আর একটা ব্যাপার। এই অদ্ভুত দ্বীপের গভীর জঙ্গলে বসে কারা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কইছে ইংরেজী ভাষায়! যে কথাগুলো শোনা গেল, বাংলা ভাষায় তরজমা করলে তা দাঁড়ায় এই রকম। একজন বললে, "চার পায়ে চলবো না; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই?"

কয়েকটা কণ্ঠ সমস্বরে বললে, "আমরা মানুষ!"

প্রথম কণ্ঠ বললে, "মাছ-মাংস খাবো না; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই?"

উত্তরে সমস্বরে শোনা গেল, "আমরা মানুষ।"

আবার প্রথম কণ্ঠ বললে, "মানুষদের দেখলে তাড়া করবে না; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই?"

সমস্বরে শোনা গেল, "আমরা মানুষ!'

তারা ইংরেজী ভাষায় কথা কইছে বটে, কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বরে একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিকতা এবং উচ্চারণে ছিল অদ্ভুত এক জড়তা। কৌতূহলী বিমল মাটির ওপরে শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে পাহাড়ের ধারে গিয়ে নিচের দিকে মুখ বাড়িয়ে সাবধানে দেখতে লাগল। অন্য সকলেও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে।

নিচের দিকে রয়েছে একটা খাদের মতো অপরিসর জায়গা ; দুই দিকে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় নিয়ে সংকীর্ণ একটা উপত্যকার মতো সেই খাদটা খানিক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। এধার থেকে ওধারের পাহাড় পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে উপর দিকে রয়েছে এমন লতা-পাতার জাল যে, নিচের খাদের ভেতরে সূর্যরশ্মির একটা টুকরো পর্যন্ত প্রবেশ করছে না। ছায়ামাখা ময়লা আলোয় খানিক স্পষ্ট ও খানিক অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা মানুষের মূর্তি। খানিকক্ষণ ভালো করে লক্ষ্য করবার পর বোঝা গেল, সেগুলো মানুষের মূর্তি হলেও তাদের দেহগুলোকে অমানুষিক বললেও অন্যায় হবে না। প্রত্যেক মূর্তিরই দেহের উপর-অংশ যেমন বড়, পায়ের দিক তার তুলনায় তেমনি ছোট। তাদের মধ্যে যে মূর্তিটা সবচেয়ে বৃহৎ, তাকে দেখলে বনমানুষ বা গরিলা ছাড়া আর কোন জীবকেই মনে পড়ে না। অথচ তাকে গরিলা বলাও চলে না, কারণ তার দেহ খুব বেশি রোমশ নয় এবং তার মুখেও মাখানো রয়েছে প্রায় মানুষের মতো ভাব।

অন্যান্য মূর্তিগুলো তেমনি উদ্ভট। প্রত্যেকটাকে দেখলেই কোন না কোন জন্তুর কথা স্মরণ হয়। একটা মূর্তিকে দেখতে তো প্রায় প্রকাণ্ড একটা শূকরের মতোই, তার নাকের তলায় চিবুক ও ওষ্ঠাধরের কোনও চিহ্ন নেই বললেও চলে। অথচ সে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের মতো দুই পায়ে ভর দিয়ে এবং তার দেহের সাধারণ গঠনের মধ্যে শূকরের চেয়ে মানুষের সাদৃশ্যই বেশি। তাদের দেহের অন্যান্য বিশেষত্বগুলো আধ-অন্ধকারে ভালো করে বোঝা গেল না।

একটা বড় গাছের ডালের উপর থেকে নেমে এসেছিল কাছির মতো মোটা খুব লম্বা দুটো ঝুরি। গরিলার মতো দেখতে মানুষটা হঠাৎ দুই হাতে সেই দুটো ঝুরি ধরে ফেলে অনায়াসে মাটির উপর থেকে খানিকটা উপরে উঠে বারংবার দোল খেতে লাগল মনের আনন্দে। তারপর সেই ভাবেই শূন্যে দুলতে দুলতে ভাঙা হেঁড়ে গলায় বললে, "আবার জাহাজ এসেছে, আবার প্রভুরা এসেছে, আবার আমাদের শাস্তি পেতে হবে।"

নিচে থেকে অন্য মূর্তিগুলো সমস্বরে বলে উঠল, "আবার আমাদের শান্তি পেতে হবে।"

কুমার হঠাৎ বিমলের গায়ে একটা ঠেলা মারলে। বিমল সচমকে মুখ ফেরাতেই কুমার ইঙ্গিতে সামনের দিকটা দেখিয়ে দিলে।

যা দেখা গেল, ভয়াবহ!

খাদের ওপাশে পাহাড়ের উপরে ছিল নানাজাতীয় গাছের তলায় একটানা ঝোপের সার। একটা ঝোপের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আছে প্রকাণ্ড ও বীভৎস একখানা মুখ! সেটা যে কোন্ জীবের মুখ, কিছুই বোঝবার উপায় নেই। সেই ভয়ংকর মুখের গড়ন খানিকটা সিংহের, খানিকটা ভল্লুকের এবং খানিকটা গণ্ডারের মুখের মতো! এই দ্বীপের বাইরে পৃথিবীর দৃষ্টি নিশ্চয়ই কোনদিন এমন অভাবিত ও অপার্থিব জীবকে দর্শন করবার সুযোগ পায় নি! পণ্ডিতরা বলেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম পৃথিবীতে আশ্চর্যরূপে বীভৎস ও বিপুলবপু জীবরা নাকি বিচরণ করত। মাটি খুঁড়ে তাদের অনেকের কঙ্কাল আবিষ্কার করা হয়েছে এবং পণ্ডিতরা সেই সব কঙ্কাল দেখে তাদের চেহারা কতকটা অনুমান করে নিয়েছেন! এই দ্বীপে কি তাদেরই কোন কোন বংশধর আজও বিদ্যমান আছে?

জন্তুটার দেহের অন্য কোন অংশ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু তার বিস্ফারিত দুই চক্ষুর ভেতর দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল যেন ক্ষুধিত হিংসার আগুন।

মানিক বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে সেই মুখখানার উপরে গুলিবৃষ্টি করবার উপক্রম করলে।

জয়ন্ত টপ করে তার হাত চেপে ধরে অস্ফুট স্বরে তিরস্কার করে বললে, 'ক্ষান্ত হও মানিক, কর কি। বন্দুকের শব্দ শুনে এখানকার সব জীব যদি আমাদের কাছে ছুটে আসে, তাহলে আর কি আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব?"

হঠাৎ ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গেল সেই বেয়াড়া মুখখানা।

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "জীবটা যে ভয়ানক হিংস্র তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। মাঝখানে এই খাদটা আছে বলেই এতক্ষণ ও আমাদের আক্রমণ করতে পারে নি। এখন বোধহয় অন্য দিক দিয়ে এদিকে আসবার জন্যে চেষ্টা করবে। এখানে ওরকম আরও কত জীব আছে কে জানে! আপাতত বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়াই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ।"

জয়ন্ত সায় দিয়ে বললে, "আমারও ওই মত। এই অন্ধকার জঙ্গলের ভেতরে আমরা অত্যন্ত অসহায়। আমরা কারুকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু আড়াল থেকে শত্রুরা নিশ্চয়ই আমাদের উপরে নজর রেখেছে। এখানকার প্রত্যেক ঝোপ-ঝোপেই বিপজ্জনক। আসুন, আবার আমরা বেরিয়ে যাই।"

সাত

দ্বীপের অরণ্য থেকে সকলে যখন আবার নিজেদের তাঁবুর ভেতরে ফিরে এল, তখন সর্বাগ্রে তাদের সম্ভাষণ করলেন সুন্দরবাবু। শুধোলেন, "জঙ্গলের ভেতরে আরও কতগুলো হুনুমান-বিছে দেখে এলে?"

মানিক বললে, "আরে রেখে দিন আপনার হুনুমান-বিছে! আমরা যাদের দেখেছি তাদের দেখলেই আপনি 'হুঁম্' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।"

বিস্ময়ে দুই চোখ পাকিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "বল কি হে? হুনুমান-বিছের চেয়েও ভয়ানক কিছু থাকতে পারে নাকি? উঁহু! একথা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না!"

—"আমার কথায় যদি বিশ্বাস না করেন তবে নিজেই একবার জঙ্গলে গিয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে আসুন না!"

সুন্দরবাবু তাচ্ছিল্য ভরে বললেন, যে জঙ্গলে হুনুমান-বিছে পাওয়া

যায় সেখানে কোন ভদ্রলোকেরই যাওয়া উচিত নয়।"

—"আরে বার বার কি হনুমান-বিছের কথা বলছেন? আমরা একটা কি জানোয়ার দেখেছি জানেন? তাও তার সমস্ত দেহটা দেখতে পাই নি, দেখেছি কেবল তার মুখখানা! আপনি ছবির নৃসিংহ-মূর্তি দেখেছেন তো? এই মূর্তি দেখলে নৃসিংহও ভয়ে পিঠটান না দিয়ে পারবে না।"

—"হুম্, তুমি বড্ড বাজে কথা বল মানিক। নৃসিংহই হচ্ছে রূপকথার একটা অসম্ভব আর আজগুবি মূর্তি। তারও চেয়ে অপার্থিব কোন জানোয়ার পৃথিবীতে থাকতে পারে নাকি?"

—"সুন্দরবাবু, কল্পনা করুন এমন একখানা মস্ত বড় মুখ যার খানিকটা দেখতে সিংহের মতো খানিকটা ভালুকের মতো আর খানিকটা গণ্ডারের মতো। অর্থাৎ তাকে সিংহও বলা যায় না, ভালুকও বলা যায় না, গণ্ডারও বলা যায় না।"

সুন্দরবাবু আতঙ্কে এতটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন যে, তাঁর মুখের ভেতর থেকে একটি টুঁ শব্দও নির্গত হল না।

মানিক বললে, "আমরা আরও কী সব আশ্চর্য মূর্তি দেখেছি শুনবেন। গরিলার মতো দেখতে মানুষ, শুওরের মতো দেখতে মানুষ, ষাঁড়ের মতো দেখতে মানুষ, বাঘের মতো দেখতে মানুষ, শেয়ালের মতো দেখতে—"

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি মানিককে বাধা দিয়ে হাত নেড়ে বলে উঠলেন, "থামো বাপু, থামো! তুমি কি বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাতে চাও? তুমি কি আমাকে ডাহা হাঁদা-গঙ্গারাম পেয়েছ? আরে গেল রে!"

বিমল বললে, "না সুন্দরবাবু, মানিকবাবু সত্য কথাই বলছেন।"

তবু সুন্দরবাবু বিশ্বাস করতে চাইলেন না। জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেখ জয়ন্ত, আমি বরাবরই দেখে আসছি, তুমি আমাকে কোন দিনই মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা কর নি। মানিক যা বলছে তা কি সত্যি?"

জয়ন্ত বললে, "মানিক একটুও অত্যুক্তি করে নি। এ-রকম সব সৃষ্টিছাড়া জীবকে আমরা সকলেই স্বচক্ষে দেখেছি।"

অত্যন্ত দমে গিয়ে সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "জয়ন্ত, এসব দেখবার পরও তোমরা এখনও কি এই দ্বীপের ওপরে থাকতে চাও? আমি কি আগেই তোমাদের সাবধান করে দিই নি যে এটা হচ্ছে ভূতড়ে দ্বীপ? দেশে আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে, মাস-দুই পরে পেনসন নিয়ে পায়ের উপরে পা দিয়ে বসে হাঁপ ছাড়ব মনে করছি, আর তোমরা কিনা আমাকে ধাপ্পা দিয়ে অপঘাতে মারবার জন্যে এই ভয়ংকর স্থানে টেনে নিয়ে এলে? তোমাদের মনে কি একটুও দয়ামায়া নেই ভাই?" বলতে বলতে সুন্দরবাবুর মুখখানি কাঁদো কাঁদো হয়ে এলো।

বিমল তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে শান্ত কণ্ঠে বললে, "ভাববেন না সুন্দরবাবু, আমরা বেঁচে থাকতে আপনার কোনই অনিষ্ট হবে না।"

সুন্দরবাবু আশ্বস্ত হলেন না, মুখ ভার করে বললেন, "আপনি ভারী কথাই তো বললেন! আপনারা বেঁচে থাকলে আমার অনিষ্ট হবে না, কিন্তু এই সাংঘাতিক দ্বীপে এসেও আপনারা যে বেঁচে থাকবেন এমন আশা কেউ করতে পারে কি?"

—"নানা বিপদের মুখে গিয়েও যখন আমরা মরি নি, তখন এই ছোট্ট দ্বীপ থেকে নিশ্চয়ই জ্যান্ত দেহ নিয়ে ফিরে যাব, এমন বিশ্বাস আমাদের আছে। কিন্তু এখন সে সব কথা থাক। আপাতত আমাদের দেহও হয়েছে শ্রান্ত আর উদরের ক্ষুধাও হয়েছে অশান্ত, এখন আমাদের একমাত্র বন্ধু হচ্ছে রন্ধনশালার রামহরি। চলুন সুন্দরবাবু, সেই দিকেই ধাবমান হওয়া যাক। বৈকালে চায়ের আসরে আপনাকে এই দ্বীপের রহস্য বুঝিয়ে বলব।"

সারাদিন সুন্দরবাবু তাঁবুর বাইরে একটিবারমাত্র পা বাড়ান নি। বৈকালে বিমলদের চায়ের আসর বসল বাইরে খোলা জমির উপরে।

সেখান থেকে বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতি বারংবার ডাকবার পরে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও চায়ের আসরে যোগ দিলেন বটে, কিন্তু চা পান করতে করতে ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত চক্ষে ক্রমাগত দূরের পাহাড় ও অরণ্যের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

কিন্তু দূরের আলোছায়া-মাখা অরণ্য ও পাহাড়কে দেখাচ্ছিল তখন ছবির মতো সুন্দর। এদিকের ছোট নদীটিও যেন রুপোলী আলোক-লতার মতো পড়ে রয়েছে পৃথিবীর শ্যামল শয্যার উপর। চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে পরম শান্তির মধুর ইঙ্গিত, কোথাও কোন বিভীষিকার এতটুকু আঁচ পর্যন্ত নেই।

চা-পান করতে করতে বিমল বললে, "সুন্দরবাবু, অনেকদিন আগে ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে পেনড্রিক নামে এক সাহেব এই দ্বীপে এসে পড়েছিলেন। এখানে এসে তিনি যা দেখেছিলেন সে সমস্তই কাগজে-কলমে লিখে রেখে গেছেন। সেই লেখাটি বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক এইচ. জি. ওয়েলস "দি আইল্যাণ্ড অব ডক্টর মোরো" নামে একখানি পুস্তকে প্রকাশ করেছেন।

আমি বরাবরই ওয়েলস সাহেবের রচনার ভক্ত। তাঁর ওই বইখানি পড়েই আমি সর্বপ্রথমে এই দ্বীপের কথা জানতে পারি। ডাঃ মোরো ছিলেন একজন বিচক্ষণ জীবতত্ত্ববিদ। কেবল তাই নয়, Surgery বা শল্যবিদ্যায় তাঁর হাত ছিল অসাধারণ। অনেক গবেষণার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হন যে, বিভিন্ন জন্তুর জীবন্ত দেহের উপরে অস্ত্রোপচার করে তাদের দেহগুলোকে মানুষের দেহের মতো করে তোলা যায়।"

সুন্দরবাবু বললেন, "বেশ বোঝা যাচ্ছে, ওই ডাঃ মোরো ছিলেন দস্তুরমত উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি। আরে অপারেশন করে গাধাকে যদি মানুষ করে তোলা যেত তাহলে তো ভাবনাই ছিল না!"

বিমল বললে, "ব্যস্ত হবেন না সুন্দরবাবু, আগে আমার কথা শুনুন। ডাঃ মোরো কেন যে এরকম অভাবিত সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়ে-

ছিলেন, ওয়েলস সাহেবের কেতাবখানা পড়ে দেখলে আপনিও তা উপলব্ধি করতে পারবেন। ডাঃ মোরোর সিদ্ধান্ত নিয়ে এখানে আমি আর কোন বাক্যব্যয় করতে চাই না। তবে তিনি যে সত্যসত্যই গরিলা, বৃষ, চিতাবাঘ, নেকড়ে, হায়না, ভালুক, শুওর, কুকুর প্রভৃতির দেহের উপরে অস্ত্রচালনা করে তাদের আকার করে তুলেছিলেন যথাসম্ভব মানুষের মতই, পেনড্রিক সাহেব স্বচক্ষে তা দেখে লিখে রেখে গিয়েছেন। আর তাঁর কথা যে কাল্পনিক নয়, আমরাও আজ এই দ্বীপে এসে তার যথেষ্ট প্রমাণই পেয়েছি। দ্বীপে আমরা আজ যে সব মনুষ্য-রূপধারী জন্তুগুলোকে দেখেছি, সেগুলো হয় ডাঃ মোরোর স্বহস্তের কীর্তি, নয় তারা হচ্ছে তাঁরই সৃষ্ট জীবদের বংশধর। তাদের দেহই কেবল মানুষের মতো দেখতে নয়, তারা কথাও কয় মানুষের ভাষায়—ইংরেজীতে।”

সুন্দরবাবু বললেন, “নাঃ, ডাঃ মোরো পাগল না হলেও শেষটা আমাকেই দেখছি পাগল হতে হবে। আপনি কি বলতে চান বিমলবাবু, অস্ত্রোপচার করে জন্তুকেও শেখানো যায় মানুষের ভাষা?”

বিমল বললে, “না, আমি সে কথা বলতে চাই না। ডাঃ মোরো নিজেই পেনড্রিক সাহেবকে বলেছিলেন, এইসব জন্তুকে মানুষের আকার দিয়ে মানুষের ভাষা শিখিয়েছিলেন তিনি নিজেই। কেবল মানুষের ভাষা নয়, তিনি তাদের মানুষের আচার-ব্যবহারও শেখাতে ভোলেন নি। ওয়েলস সাহেবের কেতাবে এমন ইঙ্গিতও আছে, ডাঃ মোরো হিপনোটিজম বা সম্মোহন-বিদ্যাও জানতেন খুব সম্ভব সেই সম্মোহন-বিদ্যার প্রভাবই ওই মানুষ-জন্তুগুলোর উপরে কাজ করেছিল সবচেয়ে বেশি। মানুষ-জন্তুগুলো ডাঃ মোরোকে ভয় করত যমের মতো, তাঁকে তারা প্রভু বলে মনে করত। ডাঃ মোরো তাঁদের বুঝিয়েছিলেন—তোমরা হচ্ছ মানুষ; তোমরা চতুষ্পদ জন্তুর মতো চলাফেরা কোরো না; তোমরা কখনও মৎস্য-মাংস ভক্ষণ কোরো না; মানুষ দেখলে তোমরা তাদের পেছনে তাড়া করে যেয়ো না প্রভৃতি। এই সব নীতি-বাক্য তিনি তাদের সর্বক্ষণ মুখস্থ করতে বলতেন। আজ আমরাও তাদের মুখস্থ-করা নীতিবাক্য

কতক কতক শুনে এসেছি।”

সুন্দরবাবুর বিস্ময় এমন মাত্রা ছাড়িয়ে উঠল যে মুখব্যাদান করে তিনি নির্বাক ভাবে বসে রইলেন মূর্তির মতো।

বিমল বললে, “কিন্তু ডাঃ মোরো খোদার উপরে খোদাকারি করতে গিয়েছিলেন, তাই পরে প্রকৃতি নিতে চেয়েছে প্রতিশোধ। ওইসব গরিলা-মানুষ, বাঘ-মানুষ আর অন্যান্য জন্তু-মানুষ দেখতে মানুষের মতো হলেও মানুষের প্রকৃতি তাদের উপরে সমানভাবে কাজ করতে পারলে না। তাদের ভেতরে ক্রমেই বেশি করে আবার ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে উঠতে লাগল জানোয়ারের প্রকৃতি। তারপর জন্তু-মানুষদের যেসব সন্তান হল, তাদের দেহও হয়ে উঠল অনেকটা জন্তুর মতো দেখতেই। শিশু-বয়সে তারা বাপ-মায়ের কাছ থেকে মানুষের ভাষা ও নীতি শিক্ষা করেছিল বটে, কিন্তু তাদের কাছে প্রকাশ পায় বিশেষ বিশেষ জন্তুর বিশেষ বিশেষ স্বভাব। আজ তাদের মাংস খেতে আপত্তি নেই। মানুষ দেখলে হিংস্র জন্তুর মতোই তাড়া করবে আর মাঝে মাঝে দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেও এখন তারা বিচরণ করবে চতুষ্পদ জন্তুর মতো। তাদের বংশধররা হয়তো জন্মাবধি অবিকল জন্তুর দেহ নিয়েই জন্মগ্রহণ করবে, হয়তো মানুষের ভাষায় কথা কইবার শক্তি পর্যন্তও তাদের থাকবে না।”

সুন্দরবাবু বললেন, “ধরলুম, এই দ্বীপে বাস করে কতকগুলো আজব জন্তু-মানুষ ; কিন্তু আমি যে হনুমান-বিছেটাকে দেখেছি, তার সঙ্গে তো কোন মানুষের কি কোন বিশেষ জন্তুর চেহারার কিছুই মেলে না! সেটা এই দ্বীপে এলো কেমন করে? তারপর ধরুন, আপনারা আজ যে কিম্ভূতকিমাকার সিংহ-ভল্লুক-গণ্ডারটাকে দেখেছেন, তাকেও তো তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে পারি না।”

বিমল বললে, “পেনড্রিক সাহেবের কাছে ডাঃ মোরো বলেছিলেন, জন্তু-মানুষের পর জন্তু-মানুষ গড়তে গড়তে তাঁর যখন একঘেয়ে লাগত, তখন তিনি বৈচিত্র্যের জন্যে একাধিক জন্তুর চেহারা মিলিয়ে মাঝে মাঝে সৃষ্টিছাড়া সব জানোয়ার তৈরি করতেন। ওই হনুমান-বিছে প্রভৃতি

সেই সব জানোয়ারেরই নমুনা।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! আপনার ওই পেনড্রিক সাহেব আর ডাঃ মোরো জাহান্নমে গেলেও আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু উপস্থিত নিজেদের কথাও ভেবে দেখতে হবে তো? ওই নরদেহধারী জন্তুগুলো আর জন্তুদেহধারী উলঙ্গ বিভীষিকাগুলো যদি আমাদের আক্রমণ করে?"

—"এর মধ্যে যদি-টদির কিছু নেই, ওরা আমাদের আক্রমণ করবেই।"

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, "বলেন কি মশাই!"

—"হ্যাঁ। খুব সম্ভব ওরা আজ রাত্রেই আমাদের আক্রমণ করবে।"

—"কি করে জানলেন আপনি?"

—"ওরা আমাদের দেখেছে। ওদের মধ্যে যারা বেশি হিংস্র তারা নিশ্চয়ই আজ রাত্রে শান্তভাবে চুপ করে বাসায় বসে থাকবে না।"

—"কিন্তু আপনি কেবল রাত্রের কথাই তুলছেন কেন? আমাদের আক্রমণ করবার ইচ্ছে থাকলে ওরা দিনের বেলাতেও আসতে পারে তো?"

—"আপনি কি হিংস্র জন্তুদের স্বভাব জানেন না? দিনের বেলায় তাদের হিংস্র মন আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। দিনের আলো নেববার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা জাগ্রত হয়ে উঠে ধীরে ধীরে। রাত্রি যত বাড়ে তাদের হিংস্র ভাবও তত বেশি হয়ে উঠে। সেই সময় তারা বেরিয়ে পড়ে দলে দলে জীব-শিকারে। আমার অনুমান সত্যি কিনা আজ রাত্রেই পাওয়া যাবে তার প্রমাণ।"

সুন্দরবাবু ভয়ার্ত স্বরে বললেন, "মাপ করবেন মশাই, আমি প্রমাণ-ট্রমাণ কিছুই পেতে চাইনে। এই মুহূর্তেই আমি জাহাজে গিয়ে উঠতে চাই।

বিমল সে কথা কানে না তুলে বললে, "এই দ্বীপের সব জীবই যে হিংস্র আর হত্যাকারী, আমি সে কথা মনে করি না। আমরা আজ স্বকর্ণে শুনেছি, কতকগুলো জীব এখনও নিজেদের মানুষ বলে গর্ব করে

আর মনুষ্য-ধর্ম পালন করবার জন্যে নীতি-বাক্যও মুখস্থ করে থাকে। এও শুনে এসেছি, এখানে আমাদের আবির্ভাবে তারা ভয় পেয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের মতো আসল মানুষকে তারা মনে করে প্রভুর মতোই। খুব সম্ভব তারা আমাদের আক্রমণকারীদের দলে যোগ দিতে রাজী হবে না।

সুন্দরবাবু বললেন, "যে জীবগুলো তাদের মতো বৈষ্ণব নয় আপনি সেই হতভাগাদের কথা ভাবছেন না কেন? হনুমান-বিছে আর ঐ ওর-নাম-কি সিংহ-ভল্লুক-গণ্ডারের দল যদি আমাদের এখানে এসে হানা দেয়?"

বিমল হাসতে হাসতে বললে, "আমরা যে সঙ্গে এতগুলো সেপাই, মেসিন-গান আর বন্দুক-রিভলবার এনেছি, সে সব কি খালি লোক দেখাবার জন্যে?—কুমার, আর খানিক পরেই সন্ধ্যা নামবে। তুমি এখন থেকেই সেপাইদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলে এস। সকলেই যেন এক একটা ঝোপঝাপ বেছে নিয়ে ওই বন আর নদীর দিখে রাখে সতর্ক দৃষ্টি। মেসিন-গানগুলো বাইরে যথাস্থানে এনে রাখবার ব্যবস্থা কর। আজকে আমরা রাত্রি যাপন করব কবির মতো চন্দ্রকরোজ্জ্বল মুক্ত আকাশের তলায়। তফাত খালি এই, কবিরা ব্যবহার করেন মসী, আর আমরা হব অসির ভক্ত।"

কিন্তু এই অসাময়িক কবিত্বের জন্যে সুন্দরবাবুর গা যেন জ্বলে গেল। একে তো যুদ্ধের আয়োজনের কথা শুনেই তাঁর বুকের ভেতরে জেগেছে টিপটিপ শব্দ, তার উপরে আবার এই কবিত্বের অত্যাচার! এতটা তাঁর আর সহ্য হল না, তিনি তাড়াতাড়ি দোদুল্যমান ভুঁড়ি নিয়ে ছুটলেন সকলের নামে নালিশ করতে রামহরির কাছে।

আট

সুন্দরবাবুকে 'উদর-পিশাচ' উপাধি দিয়ে মানিক যখন-তখন জ্বালাতন করত; কিন্তু এই দ্বীপের মাটিতে পা দিয়েই তাঁর সেই সুবিখ্যাত জঠরাগ্নি ঘুমিয়ে পড়েছিলো যেন একে-বারেই! তার উপরে আজ আবার কতকগুলো দানব বা রাক্ষসের মতো জীবের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ হতে পারে এই সম্ভাবনাটা তাঁকে এতটা কাহিল করে ফেললে যে, মুখ-বিবরে তিনি একখণ্ড খাদ্যও নিক্ষেপ করতে পারলেন না।

অভুক্ত অবস্থাতেই কেবল এক পেয়ালা কফি পান করেই বিমলদের সঙ্গে তিনি গাত্রোত্থান করলেন। তাঁবুর বাইরে পদার্পণ করবার ইচ্ছা তাঁর একটুও ছিল না। নিতান্ত চক্ষু-লজ্জার খাতিরেই সকলের পেছনে পেছনে তিনি সুড়সুড় করে এগুতে লাগলেন ঠিক যেন বলির পাঁঠার মতো।

বিমল ভুল বলে নি, সত্যিই সেদিনকার রাত্রিটি ছিল কবিত্বময়। দূরে মহাসাগরের ভৈরব রাগের সঙ্গে কাছের নটিনী তটিনী জলবীণার তারে তারে বাজছিল অতি মৃদু একটি রাগিণীর গুঞ্জন। আকাশের তারা-সভায় জেগে ছিল সভাপতি চাঁদ। তালজাতীয় গাছগুলি দুলে দুলে উঠছিল বাতাসের তালে তালে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাথার পাতায় পাতায় জ্যোৎস্না পরিয়ে দিচ্ছিল ঝকমকে বিজলী-হার। আরও দূরে স্তব্ধ পাহাড় ও নিথর বনভূমিকে দেখাচ্ছিল স্বপ্ন-জগতের পরীপুরীর মতো।

কিন্তু এই শান্তি-সুষমা সুন্দরবাবুকে অভিভূত করতে পারলে না। তাঁর মতে, ঝড়ের আগে প্রকৃতিও এমনি শান্ত-ভাব ধারণ করে। যে কোন মুহূর্তে এখানে কি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধবার সম্ভাবনা, তাই ভেবে ভেবেই তিনি হয়ে পড়লেন যারপরনাই কাতর! কিন্তু সেই কাতরতার

ভেতরেও তিনি পৈতৃক প্রাণটি রক্ষা করবার সঠিক উপায় খোঁজবার জন্যে এদিকে ওদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে ভুললেন না।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল পরস্পরের দিকে হেলে পড়ে তিনটি তাল-জাতীয় গাছ। তারই তলায় রয়েছে একটি নাতিবৃহৎ ঝোপ এবং ঝোপের ভেতর থেকে মাথা চাগাড় দিয়ে উঠেছে মস্ত একখানা পাথর। সুন্দরবাবু বুঝলেন ও-জায়গাটা তাঁর পক্ষে হবে অনেকটা নিরাপদ।

বিমলের দিকে ফিরে তিনি বললেন, "বিমলবাবু, ওই তিনটে গাছের তলায় বসে আমি যদি পাহারা দি, তাহলে আপনাদের কিছু আপত্তি আছে কি?"

বিমল জায়গাটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুন্দরবাবুর মনোভাব বুঝে মুখ টিপে হেসে বললে, "আপত্তি? কিছুমাত্র না।"

মানিক বললে, "কিন্তু সুন্দরবাবু, একটু হুঁশিয়ার হয়ে ওখানে যাবেন।"

সুন্দরবাবু অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিন্তু মানিকের কথা শুনে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "হুঁশিয়ার হয়ে যাবো! কেন বল দেখি?"

—"কে বলতে পারে ওই ঝোপের তলায় আপনার হনুমান-বিছের মতো কোন বিদকুটে জন্তু-টন্তু লুকিয়ে নেই?"

সুন্দরবাবু মানিকের কথা নিতান্ত অসংগত মনে করতে পারলেন না। অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ভাবে ঝোপটার দিকে একবার তাকিয়ে জয়ন্তের দিকে ফিরে বললেন, "হ্যাঁ ভাই জয়ন্ত, তুমি একবার আমার সঙ্গে ওই ঝোপ পর্যন্ত এগিয়ে যাবে?"

—"কেন সুন্দরবাবু?"

—"ভায়া হে, একজোড়া চোখের চেয়ে দু-জোড়া চোখের দাম বেশি। দুজনে মিলে ঝোপটা একবার পরীক্ষা করে দেখব, ওখানে যাচ্ছেতাই কিছু ঘুপটি মেরে আছে কিনা!"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে সুন্দরবাবুর সঙ্গে অগ্রসর হয়ে সেই ঝোপ পর্যন্ত গেল। না, সেখানে সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কৃত হল না। সুন্দরবাবু তখন একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চার হাতে-পায়ে গুড়ি মেরে ঝোপের

ভেতরে ঢুকে বললেন, "হুম্! কপালে আজ কি লেখা আছে কে, জানে?"

রাত্রির মৌনব্রত ভাঙবার চেষ্টা করছিল অশান্ত মহাসাগরের অশান্ত জল-কল্লোল। আকাশ-সায়রে সাঁতার কেটে চাঁদ এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। চারদিকে পুলক ছড়িয়ে দিয়েছে স্বচ্ছ আলোক। এখানে-ওখানে ছায়ার সঙ্গে লুকোচুরি-খেলা খেলছে জ্যোৎস্না। মাঝে মাঝে ছোট নদীর ক্ষীণ রেখাটি দেখা যাচ্ছে গলানো হীরার মতো!

কেটে গেল প্রথম রাত্রি।

প্রকৃতির ভেতরে আলোকোৎসব হচ্ছে বটে, কিন্তু জ্যোৎস্নাকেও হার মানিয়ে দেয় এমন একটা সুতীব্র ও সুদীর্ঘ আলোক আজ এখানে ঘোরাফেরা করছে এই ক্ষুদ্র দ্বীপের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। সেটা হচ্ছে জাহাজের শক্তিশালী সার্চলাইট। অন্ধকারকে নির্বাসিত করবার জন্যে কুমারই আজ আলোর ব্যবস্থা করে এসেছে।

আচম্বিতে এই চলন্ত আলোক-রেখাটা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সকলে সচকিত দৃষ্টিতে দেখলে, একটা ঢালু পাহাড়ে-জমির উপরে আবির্ভূত হল অনেকগুলি মূর্তি। দল বেঁধে তারা নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল।

চোখে দূরবীন লাগিয়ে বিমল বললে, "ওদের মানুষ বলেই মনে হচ্ছে; কিন্তু ওরা হাঁটছে চতুষ্পদ জন্তুর মতোই!"

জয়ন্ত বললে, "ওরা আসছে আমাদেরই দিকে।"

বিমল বললে, "হুঁ, তা আসবেই তো। রাত্রি হয়েছে গভীর, জেগেছে ওদের নকল-মানুষ-দেহের মধ্যে বুভুক্ষু পশু-আত্মা! জয়ন্তবাবু, ডাঃ মোরোর থিয়োরির ভেতর, গোড়াতেই ছিল গলদ। অস্ত্রোপচারের সাহায্যে কোন পশুর বাইরেকার আকার বদলালেই তার ভেতরকার স্বভাব বদলায় না। পশুরা হচ্ছে—"

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল।

সার্চ-লাইটের সীমার মধ্যে এসে দাঁড়াল আরও একদল মূর্তি। তারা দেখতেই কেবল মানুষের মতো নয়, হাঁটছেও মানুষের মতো দুই পায়ে।

দূর থেকে একটা অস্পষ্ট, কিন্তু গম্ভীর স্বর বললে, "চার পায়ে চলব না ; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই ?"

অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে বললে, "আমরা মানুষ !"

গম্ভীর কণ্ঠ আবার বললে, "মাছ-মাংস খাব না ; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই ?"

অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে বললে, "আমরা মানুষ !"

গম্ভীর কণ্ঠে আবার বললে, "মানুষদের দেখলে তাড়া করব না ; এই হচ্ছে আইন। আমরা কি মানুষ নই ?"

অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে বললে, "আমরা মানুষ !"

বিমল বললে, শুনছেন জয়ন্তবাবু ? এই দ্বীপের সব নরপশু এখনও ডাঃ মোরোর শিক্ষা ভোলে নি ? এর একটা কারণও অনুমান করতে পারি। খুব সম্ভব, যারা আমাদের আক্রমণ করতে চায় তারা হচ্ছে, ডাঃ মোরোর দ্বারা সৃষ্ট নরপশুদের বংশধর। তারা ডাঃ মোরোকে দেখেও নি, তাই তাঁর সম্মোহন-শক্তি তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি !

সুন্দরবাবুও নিজের ঝোপে বসে সব দেখছিলেন এবং শুনছিলেন, এবং ক্ষণে ক্ষণে উঠছিলেন চমকে চমকে ! মাঝে মাঝে এটাও ভাবছিলেন যে, এমন ভয়ানক জায়গায় এই ভাবে একলা একটা ঝোপের ভেতরে বসে থাকা মোটেই নিরাপদ নয় ! বিমলদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে তাঁর ইচ্ছা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছিল। বিখ্যাত প্রবাদ-বচনটি একটু বদলে নিয়ে মনে মনে তিনি বলছিলেন—'দশে মিলি করি কাজ, হারি-মরি নাহি লাজ।' শেষটায় সত্যসত্যই তিনি যখন নিজের ঝোপটি ত্যাগ করে বহির্গত হবার উপক্রম করছেন, তখন ঘটে গেল একটা অকল্পিত এবং ভয়ংকর ঘটনা।

হঠাৎ একদিক থেকে আকাশ-ফাটানো চিৎকার জাগল—"ওরে বাবা রে, ভূতে ধরলে রে।"

সুন্দরবাবু ভূতকে মানতেন অত্যন্ত বেশিরকম। ভূতের নাম শ্রবণ

করলেই তাঁর সর্বাঙ্গ হয়ে উঠত রোমাঞ্চিত—বিশেষত রাত্রিবেলায়। তদুপরি তিনি এখন যেখানে অবস্থান করছেন, তাঁর মতে সেটা হচ্ছে দস্তুরমতো ভূতুড়ে দ্বীপ! সুতরাং সেই মুহূর্তেই তিনি ফিরে না তাকিয়ে পারলেন না! এবং সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় স্তম্ভিত চক্ষে যে অসম্ভব দৃশ্য অবলোকন করলেন তা হচ্ছে এই ঃ

রামহরি ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে এবং তার পেছনে পেছনে তাড়া করে আসছে মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো সে বিভীষণ জীবটা? উঃ, সুন্দরবাবু প্রায় মূর্ছিত হয়ে ধরাশায়ী হন আর কি!

দেখা যাচ্ছে হাতির মতো প্রকাণ্ড একখানা আশ্চর্য মুখ! হাতির মতো প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু সেটা মোটেই হাতির মুখ নয়! সে যেন খানিক সিংহ, খানিক ভল্লুক, খানিক গণ্ডারের মুখ নিয়ে ভেঙে-চুরে অথচ মিলিয়ে মিশয়ে গড়া! তার দুটি ক্ষুধিত চক্ষে দপদপ করে জ্বলছে দারুণ হিংসার অগ্নি!

সুন্দরবাবু প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলেন, "হুম্, হুম্, হুম্।"

পরমুহূর্তেই দেখা গেল বাঘাকে, এবং শোনা গেল তার ক্রুদ্ধ চিৎকার! মস্ত একটা লাফ মেরে বাঘা সেই মুখখানার পেছনে এসে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল! তারপর সে কী কান-ফাটানো প্রাণ-দমানো তর্জন-গর্জন এবং কী ঝটাপটি, লাফালাফি ও হানাহানি!

সুন্দরবাবু আর পারলেন না, দুই নেত্রে সরষেফুল দেখে 'বাবা রে' বলে চেঁচিয়ে উঠেই অজ্ঞান হয়ে ধড়াস করে পড়ে গেলেন মাটির উপরে!

অন্যান্য সকলেই সেই দৃশ্য দেখেছিল। বিমল তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে, "কুমার, আমার সঙ্গে এস। জয়ন্তবাবু!" মানিকবাবু! আপনারা এইখানেই বসে ওইদিকে দৃষ্টি রাখুন!"

বিমল ও কুমার বেগে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে দেখলে, সেই কিম্ভূত-কিমাকার, সিংহ-ভল্লুক-গণ্ডারের মতো দেখতে মস্ত মুখখানার পেছনে কণ্ঠদেশ কামড়ে রয়েছে বাঘা! সেই অদ্ভুত জন্তুটা বাঘার কবল থেকে মুক্ত হবার জন্যে বাঘাকে নিয়েই বারংবার মাটির ওপর থেকে লাফ মেরে

শূন্যে উঠে আবার মাটির ওপরে এসে পড়ে ছটফট করছে এবং গড়াগড়ি দিচ্ছে ; কিন্তু বাঘা যেন ছিনে জোঁক—দাঁতের কামড় একটুও আলগা করতে রাজী নয় !

গুড়ুম ! গুড়ুম ! গর্জে উঠল বিমল ও কুমারের বন্দুক ।

সিংহ-ভল্লুক-গণ্ডারের মুখ আর একবার বাঘাকে নিয়ে শূন্যে লম্ফত্যাগ করে আবার ধরাশায়ী হয়ে দুই-একবার ছটফট করে স্থির হয়ে গেল !

কুমার বন্দুকের অগ্রভাগ দিয়ে সেই জীবটার দেহকে পরীক্ষা করে বললে, "আয় রে আমার বাঘা—আয় রে আমার মহাবীর ! ওটা একেবারে পাথরের মতো মরে গিয়েছে, সাঙ্গ হয়েছে ওর লীলাখেলা !"

বিমল বিস্ফারিত নেত্রে বললে, "ভাই কুমার ! ডাঃ মোরোর বিচিত্র খেয়াল এ কী জন্তু সৃষ্টি করেছে ! দেখ, এত বড় হাতির মতো মুখ, কিন্তু এই মুখের তলায় রয়েছে মাত্র হাত দেড়েক লম্বা আর হাতখানেক চওড়া একটা থলের মতো দেহ ! আর সেই দেহের তলায় রয়েছে কুমিরের পায়ের মতো চারখানা ছোট ছোট পা ! এ যেন পর্বতের মূষিক প্রসব !"

ঠিক সেই সময়ে ওদিক থেকে জয়ন্ত চিৎকার করে বললে, "বিমলবাবু ! কুমারবাবু !"

বিমল ও কুমার আবার দ্রুতবেগে হাজির হল গিয়ে যথাস্থানে ।

জয়ন্ত বললে, "বিমলবাবু, ওদিকে তাকিয়ে দেখুন, চারপায়েহাঁটা জীবগুলোর সঙ্গে দুইপায়ে হাঁটা জীবগুলোর লড়াই বেধে গিয়েছে !"

বিমল খানিকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে বললে, "তাই তো দেখছি ! ওদের মধ্যে যারা নিজেদের মানুষ বলে গর্ব করে, নিশ্চয়ই তারা হিংস্রুক জীবগুলোকে বাধা দিতে চায় ।"

মানিক বললে, "অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা ! এই অজানা দ্বীপেও আছে আমাদের না-জানা বন্ধু ।'

কুমার বললে, "বিমল, অন্য অন্য জীবরা মারামারি নিয়ে ব্যস্ত বটে, কিন্তু সেই ফাঁকে তিনটে মূর্তি চুপি চুপি আমাদের দিকে আসছে দেখতে পাচ্ছ ?"

বিমল আবার দূরবীনের সাহায্য গ্রহণ করে বললে, "কুমার, কুমার। দুটো মূর্তির গায়ের রং, চিতাবাঘের মতো! চাটগাঁয়ে গিয়ে তুমি এমনি মূর্তিই দেখেছিলে না?"

নরপশু তিনটে ঝোপঝাপ ও গাছপালার আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করতে করতে অনেকটা এগিয়ে এল।

বিমল বললে, "ওদের আর কাছে আসতে দেওয়া নয়। ছোঁড়ো সবাই বন্দুক। এক, দুই, তিন।"

একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক গর্জন করে উঠল। একটা মূর্তি লাফ মেরে উঠেই মাটির উপরে আছড়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল। আর একটা মূর্তি ধরাশায়ী হয়ে আর একটুও নড়ল না। তৃতীয় মূর্তিটা বেগে পলায়ন করলে।

বন্দুকের ভীষণ গর্জন শুনেই নরপশুরা মারামারি থামিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চিত্রার্পিতের মতো। তারপরেই কতকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠল, "আবার আমাদের প্রভুরা এসেছেন! এইবারে আমাদের শাস্তি পেতে হবে!"

অতঃপর সুন্দরবাবুর অবস্থাটা দেখা দরকার।

সিংহ-ভল্লুক-গণ্ডারের গর্জন শ্রবণ করে সুন্দরবাবু অচেতন হয়ে পড়েছিলেন, এখন তাঁর মূর্ছা ভেঙে গেল বন্দুকের শব্দে। তিনি বলে উঠলেন, "হুম্! ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ হচ্ছে যে! তাহলে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেছে? কিন্তু এখানে যে দুটো ভুতুড়ে জানোয়ারের নমুনা দেখেছি বাবা, তাদের সঙ্গে লড়াই করে কখনো পেরে উঠা যায়? যাদের চেহারা দেখলেই পেটের পিলে যায় চমকে, তাদের সঙ্গে লড়ব কেমন করে? এখান থেকে লম্বা দেবারও কোন উপায় নেই, মহাসমুদ্রের মাঝখানে পুঁচকে একটা দ্বীপ, তারই মধ্যে হয়েছি বন্দী! ঝোপের বাইরেও পা বাড়াতে ভরসা হয় না, কে জানে বাবা কোথায় ঘুপটি মেরে বসে আছে বদমেজাজী কিম্ভূতকিমাকারের দল! হুম্! কী যে করি! ওরে বাপ রে! এ আবার কি?"

বিপুল বিস্ময়ে এবং বিষম আতঙ্কে সুন্দরবাবুর বিস্ফারিত চক্ষু দুটো গোল হয়ে উঠল চাকতির মতো।

থরথর করে কাঁপতে লাগল পায়ের তলাকার মাটি, তারপরেই শোনা গেল যেন অসম্ভবরূপে বিরাট এক মহাদানবের বিশ্ব-ফাটানো ভৈরব হুংকারের পর হুংকার! তারপরেই দেখা গেল, পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে পুঞ্জীভূত ধূম্ররাশি এবং থেকে থেকে ঠিকরে উঠছে মেঘচুম্বী প্রচণ্ড অগ্নিশিখা।

দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল বহু জীবের ভীত কণ্ঠস্বরের একটানা আর্তনাদ। এও দেখা গেল, অনেক তফাতে দলে দলে জীব কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ের মতো ছুটোছুটি করছে দিকে দিকে, কিন্তু সেগুলো মানুষ কি জানোয়ার কিছুই বোঝা যায় না।

দুই হাত দিয়ে চেপে বুকের কাঁপুনি থামাবার চেষ্টা করে সুন্দরবাবু মনে মনেই বললেন, "এ আবার কি কাণ্ড বাবা? পৃথিবীর প্রলয়কাল এল নাকি?"

ঝোপের বাইরে অনেকগুলো দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে সুন্দরবাবুর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। তিনি আবার বুঝি অজ্ঞান হয়ে যান!

তারপরে শোনা গেল বিমল চিৎকার করে বলছে, "আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে! পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছে তপ্ত লাভার স্রোত! দ্বীপের সমস্ত প্রাণী মারা যাবে। নৌকো ভাসাও, নৌকো ভাসাও—জাহাজে চল!"

মানিকের গলায় শোনা গেল—"জয়ন্ত, জয়ন্ত! সুন্দরবাবু কোথায় গেলেন? সুন্দরবাবু?"

—"এই যে আমি, এই যে আমি" বলতে বলতে সুন্দরবাবু হাঁসফাঁস করতে করতে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

মানিক তাঁর হাত ধরে ছুটতে ছুটতে বললে, "আর নয়, এই অভিশপ্ত দ্বীপে আর নয়! প্রাণে বাঁচতে চান তো প্রাণপণে দৌড়ে চলুন!"

জাহাজ ছুটছে। তার আর দ্বীপের মাঝখানে এখন অনেকখানি ব্যবধান।

কিন্তু দ্বীপের দিকে তাকালে এখন কেবল দেখা যায় বিপুল ধূম্রপুঞ্জের সঙ্গে বিরাট অগ্নিকাণ্ড! আগুনের শিখায় লালচে হয়ে উঠছে ওখানকার আকাশ পর্যন্ত।

বিমল দুঃখিতভাবে বললে, "বিদায় ডাঃ মোরোর দ্বীপ! মনে এই আক্ষেপ রয়ে গেল তোমার সমস্ত রহস্য জানা গেল না।"

সুন্দরবাবু রেগে তিনটে হয়ে বললেন, "আবার আপনি রহস্যের নাম মুখে আনছেন? রহস্য! যতদিন বাঁচব আর কখনো কোন রহস্যেরই ধার মাড়াব না—হুম্!"

●

বর্গী এল দেশে

বর্গী এল দেশে

'খোকা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো,
বর্গী এল দেশে'—

আমাদের ছেলেভুলানো ছড়ার একটি পংক্তি।

মনে করুন, বাংলাদেশের শান্ত স্নিগ্ধ পল্লীগ্রাম! দুপুরবেলা, চারিদিক নিরালা। শ্যামসুন্দর পল্লীপ্রকৃতি রৌদ্রপীত আলো মেখে করছে ঝলমল ঝলমল। বাতাসে কোথা থেকে ভেসে আসছে বনকপোতের অলস কণ্ঠস্বর।

চুকে গিয়েছে গৃহস্থালীর কাজকর্ম। মাটিতে শীতলপাটি বিছিয়ে খোকাকে নিয়ে বিশ্রাম করতে এসেছেন ঘুম ঘুম চোখে খোকার মা। কিন্তু ঘুমোবার ইচ্ছা নেই খোকাবাবুর। বিদ্রোহী হয়ে তারস্বরে তিনি জুড়ে দিলেন এমন জোর কান্না যে, ঘুম ছুটে যায় পল্লীর এ-বাড়ির ও-বাড়ির সকলের চোখে, ছিঁড়ে যায় বনকপোতের শান্তিগান, তরুলতার কলতান, সচকিত হয়ে উঠে নির্জন পথের তন্দ্রাস্তব্ধতা।

ঘুমপাড়ানি সঙ্গীতের তালে তালে খোকার মাথা আর গা চাপড়ে চলেন খোকার মা। সেই আদর-মাখা নরম হাতের ছোঁয়ায় খানিক পরে খোকাবাবুর চোখের পাতা জড়িয়ে এল ঘুমের ঘোরে, ধীরে ধীরে। অবশেষে মৌন হল ক্রন্দনভরা কণ্ঠস্বর।

পাড়া গেল জুড়িয়ে।

আচম্বিতে অগাধ স্তব্ধতার নিদ্রাভঙ্গ করে দিকে দিকে জেগে উঠল অত্যন্ত আতঙ্কিত জনতার গগনভেদী আর্ত চিৎকার!

পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় ভীত উচ্চরব শোনা গেল—'পালাও, পালাও! এল রে ঐ বর্গী এল! সবাই পালাও, বর্গী এল!'

ধুলিপটলে দিগবিদিক অন্ধকার। উল্কাবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ধেয়ে আসে হাজার অশ্বারোহী—উর্ধ্বোত্থিত হস্তে তাদের শাণিত কৃপাণ, বিস্ফারিত চক্ষে নিষ্ঠুর হিংসা, কর্কশ কণ্ঠে ভৈরব হুংকার!

বর্গী এল দেশে—ঘরে ঘরে হানা দিতে, গৃহস্থের সর্বস্ব লুঠতে, গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালাতে, পথে পথে রক্তস্রোত ছোটাতে, আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ হরণ করতে!

পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে ধড়মড় করে উঠে বসল আবার ঘুমভাঙা খোকাখুকিরা। কিন্তু আর শোনা গেল না তাদের কান্না, বনকপোতের ঘুমপাড়ানি সুর এবং তরুলতার মর্মররাগিণী।

এমনি ব্যাপার হয়েছে বারংবার। তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল। বাংলার মাটিতে ইংরেজরা শিকড় গাড়বার চেষ্টা করছে ছলে বলে কৌশলে।

দুই

'বর্গী' বলতে কি বোঝায়?

আভিধানিক অর্থানুসারে যার 'বর্গ' আছে সে-ই হল 'বর্গী'। 'বর্গে'র একটি অর্থ 'দল'। যারা দল বেঁধে আক্রমণ করত তাদেরই বর্গী বলে ডাকা হত।

ইতিহাসেও 'বর্গী' বলতে ঠিক ঐ কথাই বুঝায় না। 'বর্গী' নাকি 'বার্গীর' শব্দের অপভ্রংশ। মহারাষ্ট্রীয় ফৌজে যে-সব উচ্চ-শ্রেণীর সওয়ার ছিল নিজেদের ঘোড়ার ও সাজপোশাকের অধিকারী, তাদের নাম 'সিলাদার'। কিন্তু 'বারগীর' বলতে বোঝায় সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর সওয়ারদের। তারা অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব লাভ করত রাজ-সরকার থেকেই।

প্রাচীনকালে অনার্য হুনজাতীয় ঘোড়সওয়াররা দলে দলে পূর্ব-

ইউরোপে এবং উত্তর-ভারতে প্রবেশ করে দিকে দিকে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ইতিহাসে ভয়াল নাম অর্জন করেছিল। বর্গীরাও সেই জাতীয় হানাদার; তবে তাদের অত্যাচার অতটা ব্যাপক হয় নি, 'বর্গীর হাঙ্গামা' হচ্ছে বিশেষভাবে বাংলাদেশেরই ব্যাপার।

সত্য কথা বললে বলতে হয়, পরবর্তীকালের বর্গীর হাঙ্গামার জন্যে এক হিসাবে দায়ী হচ্ছেন ভারতগৌরব ছত্রপতি শিবাজীই। প্রধানত লুণ্ঠনের দ্বারাই তিনি নিজের সৈন্যদল পোষণ করতেন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে সদলবলে লুণ্ঠনকার্য চালিয়েছেন দক্ষিণ-ভারতের নানা স্থানেই; তার ফলে কেবল মুসলমান নয়, কত সাধারণ নিরীহ হিন্দুও যে নির্যাতিত হয়েছিল, ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে। তখনকার মারাঠীরাও জানত, লুণ্ঠনই হচ্ছে সৈনিকের অন্যতম কর্তব্য।

আরম্ভেই যেখানে নৈতিক আদর্শ এমন ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়, পরবর্তীকালে তা উন্নত না হয়ে অধিকতর অবনমিত হয়ে পড়বারই কথা। এক্ষেত্রেও হয়েছিল ঠিক তাই। শিবাজীর কালের মারাঠী সৈনিকদের চেয়ে বর্গীরা হয়ে উঠেছিল আরো বেশি নিষ্ঠুর, হিংস্র ও দুরাচার।

কম-বেশি এক শতাব্দীর মধ্যে মোগলদের শাসনকালে হতভাগ্য বাংলাদেশকে দু-দুবার ভোগ করতে হয়েছিল ভয়াবহ নির্যাতন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফিরিঙ্গি ও মগ বোম্বেটেদের ধারাবাহিক অত্যাচারের ফলে নদীবহুল দক্ষিণ ও পূর্ব-বাংলার কতক অংশ জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। সুন্দরবন অঞ্চলে আগে ছিল সমৃদ্ধিশালী জনপদ, পরে তা পরিণত হয়েছিল হিংস্র জন্তুর জঙ্গলাকীর্ণ বিচরণ-ভূমিতে এবং পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে নাকি আকাশ দিয়ে পাখি পর্যন্ত উড়তে ভরসা করত না।

এমনি সব অরাজকতার জন্যে দায়ী কোন কোন লোককে ইতিহাস মনে করে রেখেছে। যেমন পর্তুগিজদের গঞ্জেলেস ও কার্ভালহো এবং মারাঠীদের ভাস্কর পণ্ডিত। শক্তির অপব্যবহার না করলে এঁদেরও স্মৃতি আজ গরীয়ান হয়ে থাকত।

পর্তুগিজ বোম্বেটেরা বিজাতীয় বিদেশী। তারা মানবতার ধর্ম ক্ষুণ্ণ করেছিল বটে, কিন্তু স্বজাতির উপরে অত্যাচার করে নি। আর মারাঠী হানাদার বা বর্গীরা ভারতের বাসিন্দা হয়েও ভারতবাসীকে অব্যাহতি দেয় নি, তাই তাদের অপরাধ হয়ে উঠেছে অধিকতর নিন্দনীয়।

তিন

তখন মারাঠীদের সর্বময় কর্তা ছিলেন ছত্রপতি শিবাজীর পৌত্র ও উত্তরাধিকারী মহারাজা সাহু। কেবল নিজ-মহারাষ্ট্রে নয়, মধ্য-ভারতেও ছিল তাঁর রাজ্যের এক অংশ। তাঁর অধীনে ছিলেন তুইজন নায়ক—পেশোয়া (বা প্রধান মন্ত্রী) বালাজী বাজীরাও এবং নাগপুরের রাজা বা সামন্ত রঘুজী ভোঁসলে। তাঁরা পরস্পরকে দেখতেন চোখের বালির মতো। তুজনেই তুজনকে বাধা দেবার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন।

শিবাজীর সময়ে এমন ব্যাপার সম্ভবপর হত না; কারণ সর্বময় কর্তা বলতে ঠিক যা বোঝায়, শিবাজী ছিলেন তাই। অধীনস্থ নায়কদের চলতে-ফিরতে হত একমাত্র তাঁরই অঙ্গুলিনির্দেশে। সে-রকম ব্যক্তিত্ব বা শক্তি ছিল না মহারাজা সাহুর। অধীনস্থ নায়কদের স্বেচ্ছাচারিতা তিনি ইচ্ছা করলেও সব সময়ে দমন করতে পারতেন না। এই কথা মনে রাখলে পরবর্তী ঘটনাগুলির কারণ বোঝা কঠিন হবে না।

কবিবর ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন—'স্বপ্ন দেখি বর্গীরাজ হইল ক্রোধিত।'

তাঁর আর-একটি উক্তি শুনলে সন্দেহ থাকে না যে, কাকে তিনি 'বর্গীরাজ' বলে বর্ণনা করেছেন। ভারতচন্দ্র বর্গীর হাঙ্গামার সমসাময়িক ব্যক্তি। তিনি বলেছেন—

'আছিল বর্গীর রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥'

'সেতারা' বা সাতারার রাজা বলতে সাহুকেই বোঝায়। যদিও বর্গীরা 'চৌথ' আদায়ের নামে যে টাকা আদায় করত তার মধ্যে তাঁরও অংশ থাকত, তবু বর্গীর হাঙ্গামার সঙ্গে সাহুর যোগ ছিল প্রত্যক্ষ ভাবে নয়, পরোক্ষ ভাবে।

'চৌথ' হচ্ছে সাধারণত রাজস্বের চারভাগের এক ভাগ। মারাঠীদের দ্বারা ভয় দেখিয়ে বা হানা দিয়ে চৌথ বলে টাকা আদায়ের প্রথা শিবাজীর আগেও প্রচলিত ছিল। তবে শিবাজীর সময়েই এর প্রচলন হয় বেশি। কিন্তু তখনো তার মধ্যে যে যুক্তি ছিল, সাহুর সময়ে তা আর খাটত না, তখন তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যথেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র বা নিছক দস্যুতার সামিল।

চৌথের নিয়মানুসারে টাকা আদায় করবার কথা বৎসরে একবার মাত্র। কিন্তু বর্গীরা টাকা আদায় করতে আসত যখন-তখন। হয়ত একদল বর্গীকে টাকা দিয়ে খুশি করে প্রজাদের মান ও প্রাণ বাঁচানো হল। কিন্তু অনতিবিলম্বে এসে হাজির নতুন আর-একদল বর্গী। তারা আবার টাকা দাবি করে। সে দাবি মেটাতে না পারলেই সর্বনাশ। অমনি শুরু হয়ে যায় লুঠতরাজ ও খুনখারাপি—সে এক বিষম ডামা-ডোলের ব্যাপার।

সময়ে এবং অসময়ে অর্থাৎ প্রায় সব সময়েই বর্গীদের এই যুক্তিহীন ও অসম্ভব দাবি মেটাতে মেটাতে অবশেষে বাংলাদেশের নাভিশ্বাস ওঠবার উপক্রম। কি রাজার এবং কি প্রজার হাল ছাড়বার অবস্থা আর কি!

এই সব নচ্ছার ও পাষণ্ড হানাদারদের কবল থেকে বাঙালীরা মুক্তি পেলে কী উপায়ে, এইবারে আমরা সেই কাহিনীই বর্ণনা করব।

কিন্তু তার আগে আর-একটা কথা বলে রাখা দরকার। আগেই বলা হয়েছে বর্গীর হাঙ্গামা বিশেষ করে বাংলাদেশেরই ব্যাপার। বাদশাহী আমলে এক একটি 'সুবা'র অন্তর্গত ছিল এক একজন সুবাদার বা শাসন-কর্তার অধীনস্থ এক একটি প্রদেশ। বাংলার সঙ্গে তখন যুক্ত ছিল বিহার ও উড়িষ্যা দেশও এবং বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে এদের সুবাদার ছিলেন নবাব

আলিবর্দী খাঁ। ইংরেজদের আমলেও প্রায় শেষ পর্যন্ত বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার শাসকর্তা ছিলেন একজন রাজপুরুষই!

প্রাচীনকালে—অর্থাৎ ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের আগেও দেখি, বাংলার সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যার কতকাংশ একই রাজ্য বলে গণ্য হয়েছে। বাঙালী মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক প্রভৃতি এমনি রাজ্যই শাসন করতেন। বাঙালীর সঙ্গে বিহারী ও ওড়িয়ারা তখন নিজেদের একই রাজ্যের বাসিন্দা বলে আত্মপরিচয় দিত,—'বিহার কেবল বিহারীদের জন্যে' বা 'উড়িষ্যা কেবল ওড়িয়াদের জন্যে',—এ-সব জিগির আওড়াবার চেষ্টা করত না। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রেই এ দেশে এই শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ জাতি-বিদ্বেষের জন্ম হয়েছে।

বর্গী হানাদাররা পদার্পণ করেছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার যুক্ত রঙ্গ-মঞ্চেই! তবে এ-কথা বলা চলে বটে, প্রধানত নিচু বাংলার উপরেই তাদের আক্রমণ হয়ে উঠেছিল অধিকতর জোরালো!

শিবাজীর আমল থেকেই মারাঠী সৈনিকরা লুণ্ঠনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, আগেই বলা হয়েছে ও কথা।

তখনকার কালে ভারতীয় হিন্দুদের পক্ষে এ-সব হামলা ছিল তবু কতকটা সহনীয়। কারণ ধর্মদ্বেষী মুসলমানদের বহুযুগব্যাপী অত্যাচারের ফলে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত সমগ্র হিন্দুজাতি অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শিবাজীর অতুলনীয় প্রতিভাই সর্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত করলে এমন এক বৃহৎ ও পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য, যার বিরুদ্ধে মহামোগল ও হিন্দু-বিদ্বেষী সম্রাট ঔরংজেবেরও প্রাণপণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। প্রধানত মুসলমানদের কাহিল করার জন্যেই শিবাজী লুঠতরাজ চালিয়ে

যেতেন মোগল সাম্রাজ্যের দিকে দিকে ; সেই সূত্রে মোগল সম্রাটের হিন্দু প্রজারাও হানাদারদের কবলে পড়ে অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হত বটে, তবে সে ব্যাপারটা সবাই খুব বড় করে দেখত বলে মনে হয় না।

কিন্তু যখন ভারতে মুসলমানরা ক্রমেই হীনবল হয়ে পড়েছে এবং প্রায় সর্বত্রই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে মারাঠীদের প্রভুত্ব, তখনো বর্গী হানাদাররা তাদের স্বধর্মাবলম্বী নাগরিক ও গ্রামীণদের উপরে চালিয়ে যেতে লাগল অসহনীয় ও অবর্ণনীয় অত্যাচার এবং তার মধ্যে কিছুমাত্র উচ্চাদর্শের পরিবর্তে ছিল কেবল নির্বিচারে যেন তেন প্রকারে নিছক দস্যুতার দ্বারা লাভবান হবার দুশ্চেষ্টা। যেখান দিয়ে বর্গী হানাদাররা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়, সেখানেই পিছনে পড়ে থাকে কেবল সর্ববিষয়ে রিক্ত, ধূ-ধূ-করা হাহাকার-ভরা মহাশ্মশান। এতটা বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠল এবং বাংলার সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যাও পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল।

এক হিসেবে হুন আটিলা ও গ্রীক আলেকজাণ্ডার উভয়কেই দস্যু বলে মনে করা চলে। কারণ তাঁরা দুজনেই স্বদেশ ছেড়ে বেরিয়ে পরের দেশে গিয়ে হানা দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে আলেকজাণ্ডার বরেণ্য ও আটিলা ঘৃণ্য হয়ে আছেন। তার কারণ একজনের সামনে ছিল মহান আদর্শ, আর একজন করতে চেয়েছিলেন শুধু নরহত্যা ও পরস্বাপহরণ। বর্গীদের দলপতিরা ছিল শেষোক্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব।

সেটা হচ্ছে ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। পাঠানদের দমন করবার জন্যে নবাব আলিবর্দী খাঁ গিয়েছিলেন উড়িষ্যায়। জয়ী হয়ে ফেরবার মুখে মেদিনীপুরের কাছে এসে তিনি খবর পেলেন, মারাঠী সৈন্যেরা অসৎ উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে বাংলার দিকে।

তার কিছুদিন পরে শোনা গেল, মারাঠীরা দেখা দিয়েছে বাংলার ভিতরে, বর্ধমান জেলায়। চারিদিকে তারা লুঠপাট, অত্যাচার ও রক্তপাত করে বেড়াচ্ছে।

দুঃসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আলিবর্দী বর্ধমানের দিকে রওনা

হতে বিলম্ব করলেন না। কিন্তু তিনি বোধহয় মারাঠীদের সংখ্যা আন্দাজ করতে কিংবা তাড়াতাড়ির জন্যে উচিতমত সৈন্য সঙ্গে আনতে পারেন নি—কারণ তাঁর ফৌজে ছিল মাত্র তিন হাজার অশ্বারোহী ও এক হাজার পদাতিক।

তাঁকে রীতিমত বিপদে পড়তে হল। সংখ্যায় মারাঠীরা ছিল অগণ্য। তারা পিল-পিল করে চারদিক থেকে এসে তাঁকে একেবারে ঘিরে ফেললে। সম্মুখ-যুদ্ধে তাদের পরাস্ত করা অসম্ভব দেখে আলিবর্দী বর্ধমানেই ছাউনি ফেলতে বাধ্য হলেন।

মারাঠীদের নায়কের নাম ছিল ভাস্কর পণ্ডিত। নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলের সেনাপতি। নিজের ফৌজকে তিনি দুই অংশে বিভক্ত করলেন। এক অংশ আলিবর্দীকে বেষ্টন করে পাহারা দিতে লাগল। আর একদল ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে এবং চল্লিশ মাইলব্যাপী জায়গা জুড়ে আরম্ভ করলে লুঠতরাজ, হত্যাকাণ্ড ও অকথ্য অত্যাচার।

ভাস্কর পণ্ডিতের দলবল এমনভাবে আটঘাট বেঁধে বসে রইল যে, কোনদিক থেকেই নবাবী ফৌজের ছাউনির ভিতরে আর রসদ আমদানি করবার উপায় রইল না। শিবিরের মধ্যে কেবল সেপাইরা নয়, সেই সঙ্গে হাজার হাজার অনুচর এবং নবাবের পরিবারবর্গও বন্দী হয়েছিল, আহার্যের অভাবে সকলের অবস্থাই হয়ে উঠল দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত।

অবশেষে আলিবর্দী মরিয়া হয়ে মারাঠীদের সেই চক্রব্যূহ ভেদ করে সদলবলে কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁকে বেশিদূর যেতে হল না, আশপাশ থেকে আচম্বিতে মারাঠীরা হুড়মুড় করে এসে পড়ে চিলের মত ছোঁ মেরে নবাবী ফৌজের মোট-ঘাট ও তাঁবু-গুলো কেড়ে নিয়ে কোথায় সরে পড়ল। আলিবর্দী তাঁর পক্ষের সকলকে নিয়ে খোলা আকাশের তলায় অনাহারে কর্দমাক্ত ধানক্ষেতের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে রইলেন; সে এক বিষম ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা—তিনি না পারেন এগুতে না পারেন পেছুতে।

কেটে গেল এক দিন ও দুই রাত্রি দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে।

উদরে নেই অন্ন, মাথার উপরে নেই আচ্ছাদন। হয় মৃত্যু, নয় মুক্তি! দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করে আলিবর্দীর সাহসী আফগান অশ্বারোহীর দল সবেগে ও সতেজে ঝাঁপিয়ে পড়ল মারাঠীদের উপরে এবং সে প্রবল আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে শত্রুরা পিছু হঠে যেতে বাধ্য হল।

নবাবী ফৌজ অগ্রসর হল কিছুদূর পর্যন্ত। তারপর শত্রুরা ফিরে-ফিরতি প্রতি-আক্রমণ শুরু করলে কাটোয়ার অনতিদূরে। সেখানে একটা লড়াই হল, কিন্তু শত্রুরা নবাবের গতিরোধ করতে পারলে না, নিজের অনশনক্লিষ্ট সৈন্যদল নিয়ে তিনি কাটোয়ার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

নবাবী শিকার হাতছাড়া হল বটে, কিন্তু মারাঠীরা বাংলার মাটি ছাড়বার নাম মুখে আনলে না। রক্তের স্বাদ পেলে বাঘের হিংসা যেমন বেড়ে ওঠে, অতি সহজে অতিরিক্ত ঐশ্বর্যলাভের আশায় ভাস্কর পণ্ডিতের লোভও আরো মাত্রা ছাড়িয়ে উঠল, অবাধে লুঠপাট করার জন্যে লেলিয়ে দিলেন নিজের পাপসঙ্গীদের।

পাঁচ

আলিবর্দী তখনো পর্যন্ত রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করতে পারেন নি!

সেই সুযোগের সদ্ব্যহার করলেন সুচতুর ভাস্কর পণ্ডিত। সাতশত বাছা বাছা অশ্বারোহী নিয়ে চল্লিশ মাইল পথ পার হয়ে তিনি অরক্ষিত মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে এসে পড়লেন।

চারিদিকে হুলুস্থুল! বাড়িতে নয়, গ্রামে নয়, নিজ রাজধানীর উপরে ডাকাতের হানা! কে কবে শুনেছে এমন আজব কথা? যারা পারলে, জোরে পা চালিয়ে গেল পালিয়ে। যারা পারলে না, ভয়ে মুখ শুকিয়ে

জপতে লাগল ইষ্টনাম।

শহরতলি থেকে শহরের ভিতরে—এ আর আসতে কতক্ষণ! বর্গীরা হৈ-হৈ করে মুর্শিদাবাদের মধ্যে এসে পড়ল—ঘরে ঘরে চলল লুঠতরাজের ধুম, বিশেষত ধনীদের প্রাসাদে হিন্দু এবং মুসলমান কেউ পেলে না নিস্তার।

এক জগৎশেঠকেই গুণে গুণে দিতে হল নগদ তিন লক্ষ টাকা! সে যুগের তিন লাখ টাকার দাম ছিল এ-যুগের চেয়ে অনেকগুণ বেশি।

বর্গীদের বাধা দেয় শহরে ছিল না এমন রক্ষী। তারা মনের সাধে অবাধে গোটা দিন ধরে নিজেদের ট্যাঁক ভারী করতে লাগল—সকলে ভেবে নিলে, আর রক্ষা নেই, এইবার বুঝি সর্বনাশ হয়।

এমন সময়ে কাটোয়ার পথ থেকে দলবল নিয়ে স্বয়ং আলিবর্দী এসে পড়লেন হন্তদন্তের মত।

বর্গীরাও যথাসময়ে সরে পড়তে দেরি করলে না, সোজা গিয়ে হাজির হল কাটোয়ায় এবং আশ মিটিয়ে নিঃশেষে মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করতে পারলে না বলে আক্রোশে যাবার পথে দুই পাশের গ্রামের পর গ্রামে আগুন লাগিয়ে যেতে লাগল। চিহ্নিত হয়ে রইল তাদের সমগ্র যাত্রাপথ উত্তপ্ত ভস্মস্তূপে।

কাটোয়া হল বর্গীদের প্রধান আস্তানা। সেখান থেকে হুগলী এবং তারপর তারা দখল করলে আরো গ্রাম ও নগর। রাজমহল থেকে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি তারা অধিকার করে বসল। গঙ্গার পশ্চিম দিক থেকে বিলুপ্ত হল নবাবের প্রভুত্ব—এমনকি জমিদাররা পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তাদের রাজস্ব দিতে লাগল এবং তাদের বশ্যতা স্বীকার করলে ফিরিঙ্গি বণিকরাও।

গঙ্গার পূর্বদিকের ভূভাগ আলিবর্দীর হস্তচ্যুত হল না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে সে অঞ্চলেও বর্গীরা হানা দিতে ছাড়লে না। তাদের উৎপাতের ভয়ে ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা গঙ্গার পশ্চিম দিক ছেড়ে পালিয়ে এল।

বাংলা দেশ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল বললেই চলে। ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হবার উপক্রম; বাজারে শস্যের অভাব, জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য; শ্রমিকদের মজুরি বেড়ে উঠল; যারা তুঁতের আবাদ করে তারা পালিয়ে গেল—কারণ বর্গীরা তুঁতগাছের পাতা ঘোড়াদের খোরাকে পরিণত করলে, যা ছিল গুটিপোকাদের প্রধান খাদ্য। ফলে আর রেশম প্রস্তুত হত না—এমনকি যারা রেশমী কাপড় বুনত তারাও হল দেশছাড়া এবং রেশমের কারবারও হল স্থায়িভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে কিছু কিছু তুলে দিলে আসল অবস্থা উপলব্ধি করা সহজ হবে।

একজন বলছেন, 'আপন আপন সম্পত্তি নিয়ে সকলেই পলায়ন করতে লাগল। আচম্বিতে বর্গীরা এসে তাদের চারিধার থেকে ঘিরে ফেললে। আর সব কিছু ছেড়ে তারা কেড়ে নিতে লাগল কেবল সোনা আর রূপা। আর অনেকের হাত, অনেকের নাক ও কান কেটে নিলে এবং অনেককে মেরে ফেললে একেবারেই। স্ত্রীলোকদেরও উপরে অত্যাচার করতে বাকি রাখলে না। আগে বাইরের লুঠপাট সেরে তারা গ্রামের ভিতরে ঢুকে পড়ত এবং আগুন লাগিয়ে দিত ঘরে ঘরে। দিকে দিকে হানা দিয়ে তারা অশ্রান্ত স্বরে চিৎকার করত—আমাদের টাকা দাও, আমাদের টাকা দাও, আমাদের টাকা দাও! যারা টাকা দিতে পারত না, তাদের নাকের ভিতর তারা সুড়সুড় করে জল ঢেলে দিত কিংবা পুকুরে ডুবিয়ে মেরে ফেলত। লোকে নিরাপদ হতে পারত কেবল ভাগীরথীর পরপারে গিয়ে।

প্রাচীন কবি গঙ্গারাম তাঁর রচিত 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' কাব্যে বর্গীর হাঙ্গামার চিত্র দিয়েছেন :

এই মতে সব লোক পলাইয়া যাইতে।
আচম্বিতে বরগী ঘেরিলা আইসে সাথে॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা, রূপা লুঠে নেয় আর সব ছাড়া॥

কারু হাত কাটে কারু কাটে কান।
একই চোটে কারু বধয়ে পরাণ॥'

বর্ধমানের মহাসভার সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বলেছেন : সাহু রাজার সেপাইরা নৃশংস ; গর্ভবতী-নারী, শিশু, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রের হত্যাকারী, বন্যপ্রকৃতি। তাবৎ লোকের উপরে দস্যুতা করিতে দক্ষ এবং যে-কোন পাপ কাজ করতে সক্ষম। তাদের প্রধান শক্তির কারণ, আশ্চর্যরূপে দ্রুতগতি অশ্ব। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখলেই তারা ঘোড়ায় চড়ে অন্য কোথাও চম্পট দেয়।

বর্গীদের চারিত্রিক বিশেষত্ব বোঝা গেল। তারা দস্যু, তারা নির্মম, তারা কাপুরুষ। মহারাষ্ট্রের বিশেষ গৌরবের যুগেও একাধিকবার মারাঠী চরিত্রের এইসব লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। দিল্লীর মুসলমানরাও এইজন্যে তাদের দারুণ ঘৃণা করত।

বর্ষা এল বাংলায়, ঘাট-মাঠ-বাট জলে জলে জলময়, অচল পথ-চলাচল। বর্গীদেরও দায়ে পড়ে অলস হয়ে থাকতে হল।

আলিবর্দী রাজধানীর বাইরে এসে প্রচুর সৈন্যবল সংগ্রহ করে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

ভাস্কর পণ্ডিতও তলে তলে তৈরি হবার চেষ্টা করলেন। আরো বেশি ফৌজ পাঠাবার জন্যে আবেদন জানালেন নাগপুরের রাজা রঘুজীর কাছে। কিন্তু তাঁর আবেদন মঞ্জুর হল না। কারণ হয়ত সৈন্যাভাব।

আলিবর্দী ছিলেন অভিজ্ঞ সেনাপতি। তিনি বেশ বুঝলেন, নদী নালায় জল শুকিয়ে গেলে বর্গীদের বেগবান ঘোড়াগুলো আবার কর্মক্ষম হয়ে উঠবে। এই হচ্ছে তাদের কাবু করবার মাহেন্দ্রক্ষণ!

দুর্জন হলে কী হয়, ভাস্করের ভক্তির অভাব নেই। জমিদারদের কাছ থেকে জোর করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আদায় করে তিনি মহাসমারোহে দুর্গাপূজার আয়োজন করলেন কাটোয়া শহরে।

নবমীর রাত্রি। পূজা ও আমোদ-প্রমোদের পরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আনন্দশ্রান্ত মারাঠীরা অচেতন হয়ে পড়ল গভীর নিদ্রায়।

কিন্তু আলিবর্দী ও তাঁর বাছা-বাছা সৈনিকের চোখে নেই নিদ্রা। গোপনে গঙ্গা ও অজয় নদী পার হয়ে আলিবর্দী সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঘুমন্ত দস্যুদের উপরে।

বেশি কিছু করতে হল না এবং লোকক্ষয়ও হল না বেশি। সবদিক দিয়েই সফল হল এই অভাবিত আক্রমণ।

প্রায় বিনা যুদ্ধেই বিষম আতঙ্কে পাগলের মত বর্গীরা বেগে পলায়ন করলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। তাদের সমস্ত রসদ, তাঁবু ও মোটঘাট হল আক্রমণকারীদের হস্তগত।

ফৌজ নিয়ে বাংলা ছেড়ে পালাতে পালাতে ও লুঠপাট করতে করতে ভাস্কর পণ্ডিত কটক শহরে গিয়ে আবার এক আড্ডা গাড়বার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু আলিবর্দী তাঁর পিছনে লেগে রইলেন ছিনে জোঁকের মত— তাঁকে আর হাঁপ ছাড়বার বা নতুন শক্তিসঞ্চয় করবার অবসর দিলেন না। ভাস্করকে কটক থেকেও তাড়িয়ে একেবারে চিল্কা পার করে দিয়ে অবশেষে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন নবাব আলিবর্দী খাঁ। তারপর বিজয়ী বীরের মত ফিরে এলেন নিজের রাজধানীতে। এ হল ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

ছয়

ভাস্কর পণ্ডিত তখনকার মতো বিতাড়িত হলেও বাংলাদেশ থেকে বর্গীদের আড্ডা উঠে যায় নি।

কারণ কিছু দিন যেতে-না-যেতেই দেখি, তাঁর মুরুব্বি রঘুজী ভোঁসলেকে নিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত আবার হাজির হয়েছেন কাটোয়া শহরে, তাঁরা নাকি সাহু রাজার হুকুমে বাংলার চৌথ আদায় করতে এসেছেন।

রাজা রঘুজীর মস্ত শত্রু মারাঠীদের প্রথম পেশোয়া বালাজী রাও। তিনিও দলে দলে সৈন্য নিয়ে বিহারে এসে উপস্থিত হলেন। দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের অনুরোধে রঘুজীকে তিনি বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিতে এসেছেন।

কিন্তু সব শিয়ালের এক রা! বালাজীও লক্ষ্মীছেলে নন, কারণ তিনিও এলেন দিকে দিকে হাহাকার তুলে লুঠপাট করতে করতে। সাঁওতাল পরগণার বনজঙ্গল ভেদ করে তিনি এসে পড়লেন বীরভূমে, তারপর ধরলেন মুর্শিদাবাদের পথ।

বহরমপুরের কাছে গিয়ে আলিবর্দী দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। পরামর্শের পরে স্থির হল, নবাবের কাছ থেকে বালাজী বাইশ লক্ষ টাকা চৌথ পাবেন এবং তার বিনিময়ে তিনি করবেন বাংলা থেকে রঘুজীকে তাড়াবার ব্যবস্থা।

সেই খবর পেয়েই রঘুজী কাটোয়া থেকে চম্পট দিলেন চটপট। বালাজীও তাঁর পিছনে পিছনে ছুটতে কসুর করলেন না। এক জায়গায় দুই দলে বেধে গেল মারামারি। সেই ঘরোয়া লড়াইয়ে হেরে এবং অনেক লোক ও মালপত্র খুইয়ে রঘুজী ও ভাস্কর পণ্ডিত লম্বা দিলেন উড়িষ্যার দিকে। কর্তব্যপালনের জন্যে যথেষ্ট ছুটোছুটি করা হয়েছে ভেবে বালাজীও ফিরে গেলেন পুণার দিকে।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ করলে প্রায় নয়মাসব্যাপী শান্তিভোগ। কিন্তু বাংলা ও বিহারের বাসিন্দারা নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল না,—বর্গীদের বিশ্বাস কি? কলকাতাবাসী ব্যবসায়ীরা পঁচিশ হাজার টাকা তুলে শহরের অরক্ষিত অংশে এক খাল খুঁড়ে ফেললে, সেই খালই 'মার্হাট্টা ডিচ' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। বিহারীরাও পাঁচিল তুলে দিলে পাটনা শহরের চারিদিকে।

ইতিপূর্বে বর্গীরা দুই-দুইবার বাংলা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেও শেষপর্যন্ত লুঠের মাল নিয়ে সরে পড়তে পারে নি। সেইজন্যে ভাস্কর পণ্ডিতের আফসোসের অন্ত ছিল না। এখন বালাজীর অন্তর্ধানের পর পথ সাফ

দেখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সংহার-মূর্তি ধারণ করে উড়িষ্যা থেকে আবার ধেয়ে এলেন বাংলার দিকে। চতুর্দিকে আবার উঠল সর্বহারাদের গগনভেদী হাহাকার, গ্রামে গ্রামে দেখা গেল দাউ দাউ দাউ লেলিহান অগ্নিশিখা, পথে পথে ছড়িয়ে রইল অসহায়দের খণ্ড-বিখণ্ড মৃতদেহ। বর্গী এল—আবার বর্গী এল দেশে!

আলিবর্দী দস্তুরমতো কিংকর্তব্যবিমূঢ়! বালাজীকে রঘুজীর পিছনে লাগিয়ে তিনি অবলম্বন করেছিলেন সেই বহু পরীক্ষিত পুরাতন কৌশল—অর্থাৎ যাকে বলে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। কিন্তু ব্যর্থ হল সে কৌশল—আবার বর্গী এল দেশে!

এখন উপায়? হতভম্ব রাবণ নাকি বলেছিলেন, 'মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী!' আজ আলিবর্দীরও সেই অবস্থা—বর্গীরা যেন রক্তবীজের ঝাড়! এই অমঙ্গলে ঝাড়কে উৎপাটন করতে হলে ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান ভুলে অন্য উপায় আবিষ্কার না করলে চলবে না। রাজকোষ অর্থশূন্য; বারংবার যুদ্ধযাত্রায় সৈন্যেরা পরিশ্রান্ত; বৃদ্ধ আলিবর্দীরও শরীর অপটু। এই সব বুঝে বর্গীদের জন্যে মোক্ষম দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করবার জন্যে তিনি এক গুপ্ত পরামর্শ-সভার আয়োজন করলেন।

ভাস্কর পণ্ডিতের কাছে গেল আলিবর্দীর সাদর আমন্ত্রণ; নবাব আর যুদ্ধ করতে নারাজ এবং অক্ষম। তিনি এখন আপোসে মিটমাট করে শান্তি স্থাপন করতে ইচ্ছুক। ভাস্কর পণ্ডিত যদি অনুগ্রহ করে নবাব শিবিরে পদার্পণ করেন, তাহলে সমস্ত গোলযোগ খুব সহজেই বন্ধুভাবে চুকে যেতে পারে।

ভাস্কর নিশ্চয়ই মনে করেছিলেন, বালাজীর মত তিনিও আলিবর্দীর কাছে নির্বিবাদে বহু লক্ষ টাকা হাতিয়ে বাজিমাৎ করতে পারবেন। কাজেই কিছুমাত্র সন্দেহ না করেই মাত্র একুশজন সঙ্গী সেনানী নিয়ে হাসতে হাসতে তিনি পদার্পণ করলেন নবাবের শিবিরে। সেদিনের তারিখ হচ্ছে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ।

ভাস্কর পণ্ডিত এবং বিশজন সেনানী আর বর্গীদের আস্তানায়

প্রত্যাগমন করতে পারেন নি। শিবিরের আনাচে কানাচে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিল দলে দলে হত্যাকারী। সহসা আবির্ভূত হয়ে তারা বর্গীদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললে। মাত্র একজন সেনানী সেই মারাত্মক খবর নিয়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল ভগ্নদূতের মত।

ব্যস্, এক কিস্তিতেই বাজিমাৎ। সেনাপতি ও অন্যান্য দলপতিদের নিধনসংবাদ শুনেই বর্গী পঙ্গপালরা মহাভয়ে সমগ্র বঙ্গ ও উড়িষ্যা দেশ ত্যাগ করে পলায়ন করলে।

সাত

কিন্তু বর্গী এল, আবার বর্গী এল দেশে। এই নিয়ে চারবার এবং শেষবার।

সেনাধ্যক্ষ ভাস্করের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে এবার সসৈন্যে আসছেন স্বয়ং নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলে। গত পনরো মাস ধরে তোড়জোড় ও সাজসজ্জা করে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে তিনি কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

বর্গীদের কাছে বাংলা দেশ হয়ে উঠেছিল যেন কামধেনুর মত। দোহন করলেই দুগ্ধ!

রঘুজী আগে উড়িষ্যা হস্তগত করে বাংলার নানা জেলায় নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

আলিবর্দী বুঝলেন, এবার আর মুখের কথায় চিড়ে ভিজবে না। অতঃপর লড়াই ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু পনরো মাস সময় পেয়ে তিনিও যুদ্ধের জন্যে রীতিমত প্রস্তুত হয়ে উঠেছিলেন।

প্রথমে দুই পক্ষে হল একটা ছোটখাট ঠোকাঠুকি। রঘুজী পিছিয়ে

গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর বিষদাঁত ভাঙল না। তারপর তিনি দশ হাজার বর্গী ঘোড়সওয়ার ও চার হাজার আফগান সৈনিক নিয়ে মুর্শিদাবাদের কাছে এসে পড়লেন। সেখানে নবাবী সৈন্যদের প্রস্তুত দেখে পশ্চাদপদ হয়ে ছাউনি ফেললেন কাটোয়া নগরে গিয়ে।

কাটোয়ার পশ্চিমে রানীদীঘির কাছে আলিবর্দীর সঙ্গে রঘুজীর চরম শক্তিপরীক্ষা হয়। এক তুমুল যুদ্ধের পর বর্গীরা যুদ্ধক্ষেত্রে বহু হতাহতকে ফেলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। ইহা ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

শেষপর্যন্ত আলিবর্দী বর্গীদের বাংলা দেশের সীমান্তের বাইরে তাড়িয়ে না দিয়ে নিশ্চিন্ত হন নি।

বর্গীরা শিকড় গেড়ে বসে উড়িষ্যায়। তারপরেও কয়েক বৎসর ধরে নবাবী ফৌজের সঙ্গে তাদের ঘাত-প্রতিঘাত হয় বটে, কিন্তু খাস বাংলার উপরে আর তারা চড়াও হয়ে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসে নি।

না আসবার কারণও ছিল। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীদের সঙ্গে আলিবর্দীর যে শেষ সন্ধি হয় তার একটা শর্ত এই :

'বাংলার নবাব রাজা রঘুজীকে বাৎসরিক বারো লক্ষ টাকা চৌথ প্রদান করবেন'।

●

'বর্গী এল দেশে' লিখতে একাধিক লেখকের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। কিন্তু সমধিক সাহায্য পেয়েছি স্বর্গীয় স্যর যদুনাথ সরকারের মূল্যবান রচনা থেকে।

—লেখক